স্বদেশ ও শিল্প

সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঝকমারি বুক হাউস
৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড় : কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
চিন্ময় মিত্র
রকমারি বুক হাউস
৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৫৮

মুদ্রক :
নিরঞ্জন দাস
দাস প্রিণ্টার্স
১৭, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

নিজের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখতে বসা যে কোন লেখকের পক্ষে আনন্দের ব্যাপার। কাজেই "স্বদেশ ও শিল্প" যে উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়েছিল তা কিছুটা নিশ্চয় সফল হয়েছে। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পাঠকের কাছে।

প্রথম সংস্করণে যে সামান্য ভুল বা ত্রুটি ছিল তা সংশোধন করে সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি শিল্পের বিষদ ব্যাখ্যা সহ আরও কিছু নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তাই আশা করছি পাঠকবর্গ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে আরও বেশী উপকৃত হবেন।

লেখক

উৎসর্গ—

মাতৃ দেবীর শ্রীচরণে

এই লেখকের

(শিল্প বিষয়ে)

শিল্পের সন্ধানে

সাবান শিল্প

ঔষধ শিল্প (যন্ত্রস্থ)

(উপন্যাস)

শ্রীমতী যে ডাকে

(শিশু সাহিত্য)

অমর কাহিনী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁরা মহৎ, যাঁরা উদার, অপরকে কিছু দিতে পেরে তাঁরা পরম তৃপ্তি পান। নিজেদের সহসা ঘটা করে তাঁরা প্রচার করতে চান না। কিন্তু সেই দান যে গ্রহণ করে তার ঋণের বোঝা বেড়েই যায়। ঠিক এই দলের লোক আমি। তাই আর পাঁচ জনের ম'ত ওনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নিজেকে কিছুটা হাল্কা করার চেষ্টা করলাম।

শ্রীবি, কে, দত্ত—কাস্টোডিয়্যান্, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া।

শ্রীএম, সেন শর্মা—চেয়ারম্যান " " " " "

শ্রী সি, টি, দাস—ডেপুটি " " " " " "

শ্রী পি, কে, সেন " " " " " " "

শ্রীসত্যরঞ্জন সরকার

শ্রী বি, ভট্টাচার্য্য

শ্রীসুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—অবসর প্রাপ্ত রসায়নবিদ্, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটরী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

শ্রীদিলীপকুমার মিত্র

শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীউমাকান্ত গুপ্ত—সহ গ্রন্থাগারিক, ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী। হুগলী।

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

আজকে যে সমস্যা বাংলা দেশে ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে তা হ'ল বেকার সমস্যা। ঠিক কত লক্ষ হতভাগ্য বেকার সামান্য একটা কাজের আশায় দিন গুণছেন তা হিসেব করে বলা কঠিন। তাই সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলো ছোট, বড় ও মাঝারি ব্যবসায় সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। এতে অবশ্য লাভ হবে দু-ভাবে। যিনি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলবেন, তিনি যেমন কিছু রোজগার করতে পারবেন সেই সঙ্গে যাঁরা প্রতিষ্ঠানটি চালাতে সাহায্য করছেন তাঁদেরও বেকারত্ব ঘুচবে। আবার অন্য দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প।

তবে ছোটই হোক বা বড়োই হোক শ্রমশিল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনার আগে একেবারে গোড়ার দিকে কতকগুলি বিষয়ে কিছু রেখাপাত করা দরকার। কারণ ভবিষ্যতে হয়তো দরকার হতে পারে। যে কোন রকমের শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে যে জিনিষগুলি প্রথমেই দরকার হয় তা হ'ল—(ক) কাঁচামাল, (খ) মূলধন, (গ) বিক্রয় বাজার, (ঘ) শিল্প গড়ে তোলার জমি, (ঙ) শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান।

(ক) **কাঁচামাল**—সাধারণভাবে কলকাতার চিনাবাজারে বা বাগরী মার্কেটে একটু খোঁজ-খবর করলেই কাঁচামাল যোগাড় করা মোটেই অসম্ভব নয়। অবশ্য এখানে রসায়ন শিল্পের জন্ত যে কাঁচামাল প্রয়োজন তার কথাই বলা হচ্ছে। তবে অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল যদি এখানে একান্তভাবে না পাওয়া যায় এখানকার বিক্রেতারই সঠিক খবরাখবর দিয়ে থাকেন। তাতে আরও সুবিধা হয়। কারণ সেই কাঁচামালটির প্রকৃত উৎপাদানকারি জানতে পারলে খরচটা অনেক কমে হয়।

(খ) **মূলধন**—সবথেকে আসল সমস্যা হ'ল এটি। কিন্তু ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ হওয়াতে তা এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। কলকাতা হলে তো কথাই নেই। কলকাতার বাইরে হলে যে-কোন একটি রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্মে ঋণের জন্ত আবেদন করতে হবে। এই আবেদন পত্র

রকমের হয় (১) সিকিউরিটি স্কীম (২) গ্যারান্টি স্কীম। প্রথমটিতে সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয় আর সেটা প্রযোজ্য নন-টেকনিক্যাল লোকেদের জন্য। আর দ্বিতীয়টিতে কোন সম্পত্তি বন্ধক দিতে হয় না। এক্ষেত্রে কোন সম্পত্তির মালিককে জামিনদার হিসাবে দাঁড়াতে হয়। এ-নিয়ম কেবলমাত্র টেকনিক্যাল লোকদের জন্য। এখন টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল লোক কাদের বলা হয়? যাঁরা বি-এস-সি অথবা এম-এস্-সি পাস করেছেন ও কয়েকটি সংস্থায় হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, এছাড়া যাঁরা কোন সরকারী শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁরা টেকনিক্যাল পর্যায়ে পড়েন। অন্যেরা হলেন নন-টেকনিক্যাল দলের।

এখানে আরও একটা কথা বলার আছে। পশ্চিম বাংলা সহ তামাম ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক ও সরকার সম্বন্ধে একটা দারুণ ভীতি আছে। সেখানে নাকি অস্বাভাবিক দেরী হয়। এক বছরের আগে কোন কাজই হয় না। আমার মতে এ ধারণাটা একেবারে ভুল। জনসাধারণের না জানার ফলেই অনেক সময়ে একই কাজের জন্য বার বার ঘুরতে হয়। সব জেনেশুনে প্রয়োজন মত কাগজপত্র ঠিকঠাক করে যদি যাওয়া যায় তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ হয়ে যায়।

তাই প্রথমে ব্যাঙ্কে যাওয়ার আগে নিম্নলিখিত সরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে যাওয়া ভাল। যে বিষয়ে শিল্পগুলি হবে তার একটা স্কীম চাইলেই বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। সবার সুবিধার জন্য নাম ও ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, দরকার মনে করলে পাঠক যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে কোন স্কীম চাইলেই পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই। তাঁদের কাছে যত রকমের আছে তার মধ্যে যে কোন একটি স্কীম তাঁরা বিনা পয়সায় দেবেন। (১) ক্ষুদ্রশিল্প সার্ভিস ইনষ্টিটিউট, ১১১, ১১২, বি, টি, রোড, কলিকাতা-৩৫। (২) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটরী, ক্যানেল সাউথ রোড়, পাগলাডাঙ্গা, কলিকাতা। (৩) আবার প্রতি জেলায় একটি করে ডিষ্ট্রিক্ট ইনডাষ্ট্রিয়াল অফিস আছে। সেখানেও এই সব সুবিধা পাওয়া যায়। এছাড়াও ভারতবর্ষে বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপকের নিকট গিয়ে যে কোন একটি ভাল রসায়ন শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন। আশা-করি কিছু জানা থাকলে তাঁরা নিরাশ করবেন না।

(গ) **বিক্রয় বাজার**—শিল্প স্থাপনা করার আগে এটি একটি প্রধান বিষয়। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু তৈরী করা যদিও বা সম্ভব হয়েছে কিন্তু তার বিক্রয় বাজার ঠিক ম'ত পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সে ব্যবসা যায় খেতে বাধ্য। তাই অন্য কোন শিল্প স্থাপনা করার আগে বিশেষ করে সেই সমস্ত শিল্পগুলি করা উচিত যা আজও ভারতবর্ষে আমদানি করতে হচ্ছে।

(ঘ) **জমি**—মোটামুটি ভাবে এই সমস্ত কারখানায় দুই থেকে তিন কাঠার বেশী জমি লাগে না। কলকাতার বাইরে যাঁদের নিজের বাড়ী আছে, অনেক সময় দেখা যায় বাড়ীর পেছন দিকে সামান্য কিছু জায়গা খালি পড়ে থাকেই। তবে একান্ত যদি জায়গা না পাওয়া যায় তবে জমি লিজ নিয়েও শেড করা যেতে পারে। আজকাল অনেকেই কারখানার ব্যাপারে জমি লিজ দিচ্ছেন।

(ঙ) **শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান**—ব্যাঙ্কের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের কথা, কিছু কিছু বলা হয়ে গেছে। তবুও যদি কেউ নতুন করে শিখতে চান তবে প্রতি বছরে দু-বার করে ছ'মাসের জন্য যে কোন একটি বিষয়ে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটরীতে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে সামান্য বেতনের বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আরও জানার থাকলে নিউ-সেক্রেটারিয়েটে দশ তলায় ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে গেলেই সব কিছু জানতে পারা যাবে।

এস, আই, এস, আই এর কাজ

ভারতবর্ষে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ চলাকালিন বৃহৎ, মধ্যম ও ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পগুলির উপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে প্রত্যেকটি রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য এই রকম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় প্রত্যেকটি প্রদেশে এস, আই, এস, আইএর অফিস খেলা হয়। এই অফিসটির নাম **Small Industries Service Institute** বা সংক্ষেপে এস, আই, এস, আই বলা হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের শ্রমশিল্পের ও রসায়ন শিল্পের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্য ঠিকানাটাও দিয়ে দিচ্ছি। ১১১ ও ১১২ বি, টি রোড, কলিকাতা—৩৫। ফোন নং—৫৬-৩৭৭৭।

এবার দেখা যাক Small Industries Service Institute কি কাজ করেন ও শিল্পের সঙ্গে এই সংস্থার সম্বন্ধ কি? ধরা যাক, আপনি অর্থাৎ (রামবাবু) কোন নতুন ধরনের শিল্প করতে চান ও তার জন্য ঋণ দরকার। আপনি প্রথমে তিন কপি স্কীম, মেসিন পত্রের কোটেশান (বিভিন্ন জায়গা থেকে নিতে হবে) ও Directorকে উদ্দেশ্যে করে একটি চিঠি দিয়ে আবেদন করবেন। এখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনার স্কীম পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি দেখা যায় যে স্কীমটি ভাল আর তার থেকে যথেষ্ট লাভ হবে তবেই তারা আপনার স্কীম পাশ করে দেবেন। তখন আপনি ঐ স্কীম রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ঋণের জন্য আবেদন করলে নিশ্চয় ঋণ পাবেন। অবশ্য তারজন্য ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি দিতে হবে। তবে এস, আই, এস, আই-এর নিজস্ব একটি ফর্ম আছে সেটি স্কীমের সঙ্গে জমা দিতে হয়। আমি সেই ফর্মের নকল ও কি ভাবে ফর্ম ভর্তি করতে হবে লিখে দিচ্ছি। দরকার মনে করলে বাড়ীতে এই ফর্ম সাদা কাগজে টাইপ করে কাজ চালাতে পারা যায়। এইগুলি হ'ল একটি দিক।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কারখানা চালাতে গিয়ে নানা রকম অসুবিধা হচ্ছে। সেই রকম ক্ষেত্রে এস, আই, এস, আইকে জানালে, সুবিধা ম'ত লোক পাঠিয়ে তারা আপনার অসুবিধাগুলি দূর করার চেষ্টা করে থাকেন। যাঁরা বড় বা মাঝারি শিল্প করবেন তাঁরা এস, আই, এস, আইয়ে যাবেন। কিন্তু যদি কোন স্কীম দশ হাজার টাকার কমে হয় তবে এখানে না আসাই ভাল। সেক্ষেত্রে জেলার ডিষ্ট্রিক ইনডাষ্ট্রিয়াল অফিসারের কাছে ঐ ভাবেই আবেদন করা যায়। ইনডাষ্ট্রিয়াল অফিসার যদি আপনার স্কীম পাশ করে দেন সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাঙ্ক ঋণের আবেদন পত্র বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখেন। এবার এস, আই, এস, আইএর ফর্ম ও চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। প্রয়োজন অনুসারে বা নিজের সুবিধা ম'ত সামান্য অদল বদল করে নিতে পারা যাবে।

১নং—চিঠি

Chatterjee Chemicals
Burdwan

January 7th 1974

The Director,
Small Industries Service Institute
111 & 112, B. T. Road
Calcutta—19

Re : Scheme on the manufacture of Solid, Liquid and white Scented phenyle 2,500 M.L/P.M.

Sir,

I am enclosing herewith a Scheme on the above for the favour of your kind approval. I have my own land and shed at Burdwan, and the technical know-how is fully available with me.

Thanking You

Yours faithfully
....

Enclo : As in above

২নং—এস্, আই, এস্, আইএর ফর্ম

SCHEME : NEW/EXPANSION
Information to be furnished while sponsering

Scheme (New of expansion)

1. **Name of the unit**
   (Indicate proposed of existing)
2. (*a*) Items of manufacture
   (*b*) Volume of proposed Production (in Rupees or in quantity per month on 8 hours Shift basis).
   (*c*) No. of shift proposed to be run : I Shift/day.
3. **Details of Accommodation :**
   (*a*) Whether private accommodation (own/rental) already arranged

(*b*) Whether proposed to de set up in Industrial Estate. If so, indicate in details where arrangement has been made.

(*c*) Covered and uncovered area required.

4. Power

(*a*) Requirement in kw/H.P. :

(*b*) If arrangement for power already made.

5. Machinery

(*a*) Value of indigenous machinery and equipment.

(*b*) Value of imported machinery and equipment.

(*c*) Whether to be purchased fully or partly out of own investment,

(*d*) Whether to be financed from outside (HP/Bank/State Aid to Industries Scheme). if so, indicate the machines and amounts.

6. Requirement of Raw Materials with categories and specifications in details

(*a*) Imported (i) Value (ii) Category and specification (*b*) Indigenous : (i) Value (ii) Category and specification

(*c*) Anticipated source of procurement : (From open market or import licence required)

7. Any other financial assistance that would be required later, in implementing the scheme. (indicate the sources).

8. (*a*) If Technical know—how already available or to be procured (in case of complicated items).

(*b*) Present Occupation of the entrepreneur :

Signature of the Entrepreneur
Partner/Proprietor

FOR OFFICIAL USE

9. Comments of the officer sponsoring or recommending the scheme (S.I.S.I) from the technical side :

10. Comments of the Reviewing Committee (Action Committee) :

For Director
Small Industries Service Institute
Calcutta

For Director of Industries
Govt. of West Bengal

৩নং—মেসিনের কোটেশান।

৪নং— স্কীম

কিভাবে আবেদন করতে হবে? আমি দরকারী জিনিষগুলি (১নং, ২নং) এইভাবে নং দিয়ে দিয়েছি। এবার নং অনুসারে কোনটি কত কপি লাগবে তা জানিয়ে দিচ্ছি। ১নং—এক কপি, ২নং—এক কপি, ৩নং—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দু-কপি থেকে তিন-কপি, ৪নং—তিন কপি। যদি এই সমস্ত কাগজপত্র গুলি সব একসঙ্গে জমা দেওয়া হয় তবে অযোথা ঘুরতে হয় না।

লিকুইড্ ফিনাইল

আগের আলোচনায় একেবারে গোড়ার দিকে মানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে সর্বপ্রথম যে জিনিষগুলো দরকার তা নিয়ে মোটামুটিভাবে লেখা হয়ে গেছে। এবার ধারাবাহিকভাকে এক একটি শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। ফলে সব কিছু জেনে শুনে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে সহসা লোকসান খাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

এখন দেখা যাক লিকুইড্ ফিনাইল কি? তা এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, তেল আর জলের মিশ্রণ। কিন্তু তেল-জল মিশবে কি করে, তাই এই দুয়ের মাঝখানে একজন কে দাঁড়াতে হয়। তা'হল সাবান। এবার আমরা বুঝতে পারলাম তেল, জল আর সাবানের সংমিশ্রণে ফিনাইল তৈরী হয়। এটা বেশ লাভজনক ব্যবসা। প্রায় ধরতে গেলে সারাভারতবর্ষে গ্রাম থেকে শহরে এর ব্যাপক চাহিদা। এখন এই শিল্পটি গড়তে গেলে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। (ক) কাঁচামাল (খ) মূলধন (গ) বিক্রয় বাজার (ঘ) জমি (ঙ) শিল্প বিষয়ে জ্ঞান।

(ক) কাঁচামাল—মোটামুটিভাবে সাবান তৈরী করতে গেলে যা কাঁচামাল লাগে, আর সেই সঙ্গে ক্রিয়োজোট অয়েল। তাহলে এবার যা কাঁচামাল দরকার তাহচ্ছে—রোজিন, লিন্সীড্—অয়েল, কাস্টর অয়েল, কষ্টিক সোডা আর জল। সাধারণভাবে বাজারে যে ফিনাইল পাওয়া যায় সেই রকম করতে গেলে এই সব কাঁচামাল হলেই চলবে। যদি এর থেকে আরও ভাল জিনিষ করতে চান, তবে, এর সঙ্গে সামান্য বাদাম তেল মেশাতে হবে। একই কাঁচামাল দিয়ে তিন রকমের ফিনাইল করা চলবে। যথা (১) লিকুয়িড্, (২) সলিড্, (৩) হোয়াইট্ সেন্টেড্ ফিনাইল। কেবল হোয়াইট্ সেন্টেড্ ফিনাইল করার সময় ক্রিয়োজোট অয়েলের বদলে পাইন অয়েল ব্যবহার করতে হবে। এই হোয়াইট্ ফিনাইল করতে খরচ একটু বেড়ে যায় বটে, তবে, বাজারে ভাল দামও পাওয়া যায়। আর এই সমস্ত জিনিষ কলকাতার চিনা-বাজারে অথবা বাগরী মার্কেটে পাওয়া যাবে।

(খ) মূলধন—মাসে গড়পড়তা তিনশো টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে গেলে মাত্র হাজার তিনেক টাকার ম'ত দরকার লাগবে। অবশ্য আরও কম

টাকা নিয়ে এই কারবার আরম্ভ করতে পারা যায়। তবে হাজার টাকার নিচে হবে না। এই কারখানা করতে বিশেষ কিছু কিনতে হয় না। অবশ্য আমি এখানে "ব্লক্ ক্যাপিটেলের" কথা বলছি। দুটি বড় লোহার কড়াই ও দুটি খুন্তি হলেই চলে যাবে। আর এই দুটি কিনতে ১৫০ টাকা থেকে ১৭০ টাকার মধ্যে পড়বে। এবার নিজের ক্ষমতা বুঝে যতটা মাল কেনা যাবে সেই পরিমাণ ফিনাইল উৎপাদন করা চলবে। পরে যে রকম কাজের পরিমাণ বাড়বে, অর্থাৎ অর্ডার বাড়বে, তার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে আস্তে আস্তে জিনিষ পত্র করে নিতে পারা যাবে। সব থেকে বড় কথা এর জন্য কোন বিদ্যুৎ শক্তির দরকার হয় না। সেই জন্য বাংলাদেশে গ্রামের মধ্যে এই শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আগেই বলেছি মেসিনপত্রের কোন প্রয়োজন নেই। এই শিল্প ক্ষুদ্রকুটীর শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে। তাই রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাঙ্কের থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। অবশ্য প্রথমে নিজেদের কিছু করে ব্যাঙ্ককে দেখাতে হবে।

(গ) **বিক্রয় বাজার**—প্রথমেই বলেছি এর বিক্রয় বাজার সর্বত্র। সাধারণ মুদিখানার দোকান থেকে কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ার বড় দোকানেও ফিনাইল বিক্রী হয়। এ ছাড়াও সব হাসপাতালে, কর্পোরেশনে, মিউনিসিপ্যালিটিতে ও রেলওয়েতে প্রচুর চাহিদা আছে। বিশেষ করে শহরের ও গ্রামের হাঁসপাতালে একটু যোগাযোগ রাখলে এ ব্যবসায় লোকসান খাবার ভয় নেই। তাছাড়া কিরণশঙ্কর রায় রোডে (কলিকাতা-১), সেণ্ট্রাল বুক ডিপো থেকে প্রতি সপ্তাহে "ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্নাল" নামে একটি বই বার হয়। তার মধ্যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যা মাল দরকার তার খবর পাওয়া যায়। এই বইটিও সময় সময় কাজে লাগতে পারে।

(ঘ) **জমি**—সাধারণভাবে এক কাঠারও কম জমিতে এই কারখানা করা যেতে পারে। তবে একটু চালামত করে নিতে পারলে ভাল হয়। কারণ বর্ষার সময় বা গ্রীষ্ম কালে রৌদ্রে অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু কোন মতেই শেড্ খড়ের যেন না হয়। টিনের হলেই ভাল হয়। না হলে টালির শেড্ও চলে যাবে। লোক লাগবে মাত্র দু-জন। অবশ্য একজন লোক বাদ দিলেও চলে, তবে সে ক্ষেত্রে নিজেকে খাটতে হবে।

(ঙ) **শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান**—বিশেষ করে এটির ওপর নির্ভর করছে কারখানার সব কিছু, এমন কি উচ্চ মানের উৎপাদন ও ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য।

গোড়ায় কথায় এ নিয়ে লেখা হয় গেছে তবুও পাঠকের সুবিধার জন্য আবার জানাচ্ছি, সরকারী সংস্থার মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটরী, ক্যানেল সাউথ রোড, পাগলাডাঙ্গা, কলিকাতা। এখানে গেলে বিনা মূল্যে সব তথ্য পাওয়া যাবে। তবে দু-চারবার যেতে হবে। কারণ তাঁদেরও সুবিধা-অসুবিধা আছে। তবে মোটামুটি ভাবে আমি একটা ধারণা পাঠককে দিচ্ছি।

ফরমূলা—১

রজন	৫০০ গ্রাম
কষ্টিক সোডা	৬২ গ্রাম
ক্রিয়োজোট অয়েল	৭৫০ সি. সি.
জল (কলের)	৪৫০০ সি. সি.

এটি খুব সাধারণ ধরণের ফিনাইল। বেশী দিন রাখা চলে না। তবে বছর খানেক রাখলে কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। ২৫০ সি সি. জলেতে চায়ের চামচের চার চামচ দিলেই যথেষ্ট।

ফরমূলা—২

রজন	৩৭৫ গ্রাম
লিন্‌সীড অয়েল	৭৫ গ্রাম
কাস্টর অয়েল	৫০ গ্রাম
কষ্টিক সোডা	৮০ গ্রাম
ক্রিয়োজেট অয়েল	১,৫০০ সি. সি.
জল	৪,৫০০ সি.সি.

সাধারণ ভাবে বাজারে যে সমস্ত ফিনাইল চলে সেই ধরণের জিনিষ তৈরী হবে। তাছাড়া বহুদিন পর্যন্ত টিনের মধ্যে ভালভাবে প্যাক করে রাখা চলবে।

ফরমূলা—৩

কাস্টর অয়েল	২৫০ গ্রাম
লিন্‌সীড অয়েল	১৭৫ গ্রাম
রোজিন	৭৫ গ্রাম
কষ্টিক সোডা	৮০ গ্রাম
ক্রিয়োজোট অয়েল	৪,৫০০ সি.সি
জল	৩,০০০ সি.সি

সব থেকে ভাল গ্রেডের ফিনাইল এই তিন নং ফরমূলায় তৈরী হবে। তবে বাজারে চলে না। কারণ তৈরী করার খরচ বেশী পড়ে যায়। যেখানে এক চামচ অন্য ফিনাইল লাগে এই ফিনাইল মাত্র চার ফোঁটা দিলে সমান কাজ হবে। ফরমূলা দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল, যদি সরকারের কোন টেণ্ডার পাওয়া যায় তবে ভাল জিনিষটার আলাদা দর দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারা যাবে।

কিভাবে তৈরী করতে হবে?

যে তিনটি ফরমূলা এখানে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবগুলোতে জল ও ক্রিয়োজোট অয়েল থাকছে। আর বাকী সমস্ত জিনিষ দিয়ে সাবান তৈরী হচ্ছে। এই সাবান তৈরী করার কাজটি আগে করে নিতে হবে। যদি ঠিক ম'ত সাবান তৈরী করতে না পারা যায় তবে ফিনাইল নষ্ট হবে যাবে। (এই লেখকের একই প্রকাশকের কাছে **"সাবান শিল্প"** বইটি একবার দেখে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন)। ফরমূলায় যে জল দেওয়া আছে তার থেকে কিছু জল নেওয়া চলবে না। আলাদা ভাবে জল নিয়ে সমস্ত কষ্টিক একটা পলেথিনের গামলায় অথবা কলাই করা পাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর একটা লোহার কড়ায়ে রজন সহ যত তেল জাতীয় পদার্থ রয়েছে একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যেই গলে যাবে, কড়াই আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়ে অথবা উনানের উত্তাপ কমিয়ে আগে থাকতে করে রাখা কষ্টিক সলুশন ঢেলে দিয়ে সাবান করে নিতে হবে। সাবান হবে যাবার পর কড়ায়ে প্রথমে ক্রিয়োজোট অয়েল মিশিয়ে খুন্তি দিয়ে নেড়ে ভালভাবে দুটি জিনিষ মিশিয়ে নিতে হবে। সর্বশেষ মেশাতে হবে জল। তবে কোন মতেই এক সঙ্গে জল মেশান চলবে না। ধীরে ধীরে জল মেশানোর সময় ক্রমাগত নাড়তে হবে। বাজারের চাহিদা ম'ত কাচের বোতলে অথবা টিনের প্যাকিংয়ে প্যাক করা উচিত।

সলিড ফিনাইল

এই ফিনাইল দেখতে অনেকটা ডিপ ব্রাউন। অথবা বলতে পারা যায় ঠিক আমসত্বের ম'ত। লিকুয়িড ফিনাইল তৈরী করতে যা লাগে এটির ক্ষেত্রেও সেই সব কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। কেবল জলটা লাগে না। তবে সবথেকে সুবিধে হ'ল বাথরুমে অথবা পাইখানায় একটুকরো ফেলে দিলে একটু জল পেলেই আপনা থেকে সাদা দুধের ম'ত গলতে আরম্ভ করবে।

সেইসঙ্গে ফিনাইলের গন্ধও বার হবে। তাছাড়া প্যাকিং করার জন্যে আলাদা যে একটা খরচ পড়ে তাও বেঁচে যাবে। সাধারণ ভাবে কলকাতার বাজারে তো চলেই, তাছাড়া কয়লাখনি ও চা বাগান অঞ্চলে এর ব্যবহার বেশী।

ফরমুলা

রেড়ীর তেল............	১০০ গ্রাম
কষ্টিক সোডা............	২২ গ্রাম
ক্রিয়োজোট অয়েল......	১ লিটার
পাইন অয়েল..........	৭½ সি.সি

তৈরী করার নিয়ম

ঠিক আগের ম'ত সাবান তৈরী করে নিতে হবে। সাবানের থক্থকে ভাব আসার আগেই কড়ায়ে ক্রিয়োজোট অয়েল দিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে। যখন দেখা যাবে নাড়া বন্ধ করলেই ওপরে সর জমে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় কড়াই আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়ে পাইন অয়েল মিশিয়ে আবার নাড়া দরকার। এরপর কলাই করা কানা উঁচু ট্রেতে প্রথমে খবরের কাগজ বিছিয়ে তারপর ফিনাইল ঢেলে দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টা বা পুরো একদিন ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেই সলিড ফিনাইল তৈরী হয়ে যাবে। তবে পুরো বর্ষার সময় এই ফিনাইলের চার্জ না দেওয়াই উচিত। সব থেকে ভাল সময় শীত ও গ্রীষ্মের সময়টা। সেই সময় জমে ভাল। শেষে কেকের ম'ত কেটে নিয়ে অয়েল পেপার মুড়ে দিলেই বাজারে বিক্রী করা চলবে।

সাদা ফিনাইল

আগে যে ফিনাইল নিয়ে আলোচনা করা হ'ল তা দেখতে অনেকটা ডিপ ব্রাউন রং এর। তবে জল মেশালে দুধের ম'ত সাদা দেখাবে। কিন্তু সাদা ফিনাইল বরাবর দেখতে সাদা। এটাও জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। গুণা গুণের দিক থেকে বিচার করতে গেলে একটু অন্য ধরনের। শোবার বা বসবার ঘরে ব্যবহার করলে একদিকে যেমন সুন্দর গন্ধ বার হবে তেমনি অপর দিকে ঐ ফিনাইল বা তার জল আসবাব পত্রে লেগে গেলে কোন ক্ষতি হবার ভয় থাকবে না। আজকাল বহু অফিসে, হাসপাতালে

রেলওয়েতে ও গৃহস্থ বাড়ীতে ব্যবহার হচ্ছে। কাজেই একটু ধৈর্য্য ধরে বড় বড় হাসপাতালে ও রেলের টেণ্ডার ধরতে পারলে অল্প মূলধনের মধ্যে মাসে একটা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চয় করতে পারা যাবে।

ফরমূলা

রেড়ীর তেল	১০০ গ্রাম
কষ্টিক সোডা	১৩ গ্রাম
পাইন অয়েল	৩০০ সি.সি
জল (কলের)	৩০০০ সি.সি
স্পাইক ল্যাভেণ্ডার	৫ সি সি

কিভাবে তৈরী করতে হবে

সেই একই কথা। তেল, জল ও সাবান মিশিয়ে এই ফিনাইল তৈরী করা হয়। প্রথমে কষ্টিক সোডাকে একটি কলায়ের পাত্রে ২০০ সি.সি. জলেতে গুলে নিতে হবে। এরপর একটি লোহার কড়ায়ে রেড়ীর তেল গরম করে তাতে কষ্টিক সোডার সলুশন ঢেলে দিয়ে সাবান তৈরী করে নিতে হবে। সাবান যখন থকথকে কাদার ম'ত দেখাবে সেই সময় কড়াই আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়ে গরম অবস্থাতেই পাইন অয়েল মিশিয়ে খুব ভালভাবে নাড়া দরকার। এবার ফরমূলায় যে পরিমাণ জল দেওয়া আছে তা ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিলেই সাদা ফিনাইল তৈরী হয়ে যাবে। সর্বশেষ মেশাতে হবে স্পাইক ল্যাভেণ্ডার। এটি অবশ্য না মেশালেও চলে। তবে নমুনা দেবার সময় ভাল জিনিষ দিলে অর্ডার পাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ল্যাভেণ্ডার মেশালে গন্ধটা আরও তীব্র হয় ও থাকে অনেকক্ষণ।

বর্তমানে সাদা কাচের বোতলে ৬৫০ মি.লি. মাপে বিক্রী হচ্ছে। দাম পড়ে ১-৭৫পঃ। কারখানায় সাদা ফিনাইল তৈরী হয়ে যাবার পরে সাদা বোতলে প্যাক করে ফেলতে হবে। যদি বোতল না থাকে, তবে পলেথিনের জারে রেখে দেওয়া দরকার। যে সমস্ত কাচের কারখানায় শিশি বোতল তৈরী হচ্ছে সেখান থেকে কিনতে গেলে হয়তো বাজার থেকে সামান্য কম দামে পাওয়া যেতে পারে। তবে একটা অসুবিধে রয়েছে। কোন কোম্পানি একশো বা দু'শো বোতলের অর্ডার নেবে না। কাজেই খুব কম করে এক হাজার বোতলের দাম অগ্রিম দিলে তবেই অর্ডার দেওয়া যাবে।

যাদের মূলধন কম, এই ভাবে ব্যবসা চালাতে গেলে বিশেষ সুবিধে হবে না। কাজেই এর একমাত্র বিকল্প রাস্তা হচ্ছে কলকাতার ফুটপাতে যারা পুরাতন কাচের শিশি বোতল বিক্রী করে সেখান থেকে কিনতে পারলে অনেক সুবিধে হবে। এই ভাবে দেখে শুনে সাদা বিয়ারের বোতল নিলে সব সময় এক মাপের মাল বাজারে ছাড়া যাবে। তাছাড়া দামের দিক থেকে প্রতি বোতলে খুব কম করে ১৫-২০ পয়সা সুবিধে পাওয়া যাবে। ঢালাই লোহার কড়ায়ে সাবান তৈরী করার কাজ হোলেও বাকী জিনিষ, হয় পলেথিনের গামলায় অথবা স্টেনলেস ষ্টিলের কড়ায়ে করা একান্ত প্রয়োজন। সাদা ফিনাইল সব সময় সাদা কাচের বোতলে ভরে বিক্রী করতে হবে। অন্য কোন রং এর বোতল চলে না, তার কারণ যদি ফিনাইল কেটে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারা যাবে।

যাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেতে চান তাঁদের সুবিধার জন্য একটা স্কীম্ দিয়ে দিচ্ছি। কারণ ব্যাঙ্কের সাহায্য পেতে গেলে এই স্কীম্ একান্ত দরকার। আমি সাধারণ ভাবে স্কীম্টি দিচ্ছি। পাঠক প্রয়োজন বোধ করলে একটু পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। তবে প্রথম দিকে যাঁরা এই ফিনাইল শিল্পটি করতে চলেছেন তাঁদের খুব বড় করে না করাই ভাল।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF SOLID, LIQUID WHITE SCENTED PHENYLE 2,500 M. L,/P. M.

A. Non-recurring Expenditure Rs. 2,500/-

1.	*Land*	2, Cottah own/Rental		
2.	*Covered Area*	1 ,, ,, ,,		
3.	*Machinery and Equipments*			Rs. 2,500/
(*a*)	S. S. Pan	1	Rs. 1,000/-	
(*b*)	Iron Pan	1	Rs. 100/-	
(*c*)	Stirrer	2	Rs. 50/-	
(*d*)	Weighing Scale	(1)	Rs. 350/-	
(*e*)	Chemical Lab.		Rs. 800/-	
(*f*)	Tubs, Mugs, Storage tanks etc.		Rs. 200/-	
			Rs. 2,500/-	

Recurring Expenditure/P. M. **Rs. 2,300/-**

(a) *Raw Materials.* Rs. 1,500/-

Creosote oil	Rs. 600/-
Rosin	Rs. 400/-
Castor oil	Rs. 300/-
Caustic Soda	Rs. 150/-
Misc. Chemicals.	Rs. 50/-
	Rs. 1,500/-

(b) *Salaries and wages* *Rs. 730/-*

Workers	(2)	Rs. 180/-
Salesman	(1)	Rs. 150/-
Rents and Taxes		Rs. 100/-
Packing		Rs. 300/-
		Rs. 730/-

Total Rs. 1500/-+Rs. 730/-
=Rs. 2,230/-
Say—Rs. 2,300/-

(c) Capital out lay

Non recurring Expenditure+Recurring Expenditure for 3 months

Rs. 2,500/-+6,900/-
=Rs. 9,400/- Say Rs. 9,500/-

(d) Tentative Profit and Loss A/c. P. A.

By sale of 30,000 M. L. of phenyle @ Rs. 1·25/M L.	Recurring expenditure Rs. 27, 600/-
	Depreciation on Machinery @ Rs. 15% P.A. (on Rs. 2,500/-) Rs. 375/-
	Interest on capital out lay @ 10% P.A. (on Rs. 9,500/-) Rs. 950/-
	Profit (un-Taxed) Rs. 8575/-
Rs. 37,500/-	Rs. 37,500/-

সার্জিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ

একদিন বাঙ্গালীর গোলা ভরা ছিল সোনার ধান, পুকুর ভর্তি ছিল মাছ, আর গোয়াল ভরা গরু। গ্রাম বাংলার সে রূপ পালটে গেছে অনেকদিন আগেই। আজ যাঁরা বয়সে তরুণ ওসব কথা তাদের কাছে গল্প, না হয় রূপকথা, আর বৃদ্ধের কাছে অতীত স্মৃতি। বাংলার সে এক দিন গেছে। বর্তমানে কেউ যদি একবার অতীতের সাথে মিল খুঁজতে যান তবে, সেদিনের বাংলা দেশের চেহারার সাথে কোন মিলই খুঁজে পাবেন না। তার বদলে যা দেখতে পাওয়া যাবে আপনার আমার এমন কি সবার জানা আছে, কেবল শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত, লাখ লাখ ঘরভর্তি বেকার। যুব শক্তির এমন নিদারুণ অপচয় আমাদের এই ভারতবর্ষ ছাড়া বোধকরি আর কোন স্বাধীন দেশে নেই। দেশে যখন নতুন কাজের সংস্থান নেই, আর হঠাৎ যখন কিছু ঘটারও সম্ভাবনা কম তখন এই যুব সম্প্রদায়কে নিজেকে কিছু করে তাকে বাঁচার পথ দেখতে হবে বৈকি।

বাংলা দেশের একটি জায়গার নাম করতে পারা যায় যেখানে এই সার্জিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ সমেত আর তিন চারটি শিল্প খুব ভাল ভাবে চালাতে পারা যায়। জায়গাটির নাম নবদ্বীপ। আমি ব্যক্তিগত ভাবে নবদ্বীপ গিয়েছিলাম। আমার মতে মোট চারটি শিল্প ওখানে গড়ে উঠতে পারে। (১) সার্জিক্যাল গজ বা ব্যাণ্ডেজ, (২) মোটা সুতো কল, (৩) রংকল, (৪) ঘি ও মাখনের কারখানা। এখন আলোচনা করা হচ্ছে সার্জিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজের কারখানা নিয়ে। যদি কোন সময় সুযোগ বা সুবিধা ঘটে তবে আর বাকী তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

খুব ছোট্ট করে এই শিল্প গড়তে গেলে মোট দেড় কাঠার ম'ত জমি দরকার হয়। খালি জমি যদি একান্ত নাই পাওয়া যায় তবে, মাঝারি ধরণের দু'খানা ঘর পেলেও কাজ চলে যাবে। মোট দু'জন শ্রমিক ও একজন সুপারভাইজার লাগে এটিকে চালু রাখতে। অবশ্য সুপারভাইজার না রেখেও কারখানা যিনি করেছেন তিনি নিজেও কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। তাতে কাজও হবে ভাল। আবার মাইনে বাবদ একটা মোটা টাকা খরচ প্রতি মাসে বেঁচে যাবে। এই শিল্পে প্রথমে খরচ পড়ে প্রায় বাইশ হাজার টাকার ম'ত। সব কিছু খরচ খরচা বাদ দিয়ে প্রতি মাসে লাভ দাঁড়াবে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকার ম'ত।

এবার উৎপাদনের হিসেবটা দিয়ে দিচ্ছি। বাজারে চলতি যে গজ বা ব্যাণ্ডেজের প্যাকেট বিক্রী হয় তাতে এক মিটার করে থাকে। ঐ রকম প্যাকেট ৯০০ গ্রোস উৎপাদন করা যাবে প্রতি মাসে। বিশেষ করে, কলকাতার বাজারে বিক্রয় হয় ঐ রকম এক ডজন প্যাকেট পাঁচ টাকার কাছাকাছি। আরও একটু ছোট করে করা চলতে পারে, তাতে মোট খরচ পড়বে প্রায় পনের হাজার টাকা বা অল্প কিছু বেশী।

সাধারণ ভাবে দেখা যায় জিনিষ তৈরী করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। সমস্যা দেখা দেয় বিক্রয় বাজার নিয়ে। ঠিক ম'ত বিক্রয় বাজার না জানার ফলে অনেক শিল্পের ঘটে অকাল মৃত্যু। কিন্তু সার্জিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে এ ব্যবসায় সহসা লোকসান খাবার সম্ভাবনা নেই। কারণ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে এর বাজার। বিশেষ করে আসামে, বিহারে, রাজস্থানে ও বাংলা দেশে। দক্ষিণ ভারতেও এর ভাল বাজার রয়েছে। কিন্তু নাম উল্লেখ করলাম না, তার কারণ তামিলনাড়ুতে দু তিনটি ছোট ছোট ইউনিট হয়ে গেছে। ঐ ইউনিটগুলি ওখানকার চাহিদা মিটিয়ে পশ্চিমবাংলায় অল্প অল্প মাল পাঠাচ্ছে, তাহলেও এখানে আরও দু-তিনটি ইউনিট চলবে। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের এত জায়গায় যেতে হবে না। স্থানীয় দু'টি কি তিনটি হাসপাতালে, রেলওয়েতে ও প্রতিটি ঔষধের দোকানে একটু যোগাযোগ রাখলেই কাজ হয়ে যাবে। কেবল নবদ্বীপ নয়, ভারতের মধ্যে যে জায়গাগুলোর নাম করা হলো সেখানেও এই শিল্প গড়া চলতে পারে। অবশ্য নবদ্বীপে এই শিল্প গড়তে বলার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক তাঁতের কাপড় বা ঐ সংক্রান্ত ব্যবসায় জড়িত। এই গজ বা ব্যাণ্ডেজের প্রধান যে কাঁচামাল তা পাতলা তাঁতের কাপড়। সেই কারণে নবদ্বীপে বা তার আসেপাশে এই শিল্প গড়ে তোলা বিশেষ সুবিধাজনক।

মাঝারি বা ছোট যে কোন রকমের কারখানা হোক না কেন, মোটামুটি-ভাবে এই কয়টি মেসিনের দরকার হবেই। (ক) একটি স্বয়ংক্রিয় রোলিং মেসিন, (খ) স্বয়ংক্রিয় কাটিং মেসিন একটি, (গ) কাঠের বড় ভ্যাট চারটি, (ঘ) ও একটি স্টেরিলাইজার। একথাও অবশ্য মনে রাখতে হবে বিদ্যুৎশক্তি এ শিল্পে বিশেষ প্রয়োজন। আর কাঁচামালের মধ্যে পাতলা তাঁতের কাপড় প্যাকিং করার কাগজ, কষ্টিক সোডা, টার্কি রেড অয়েল ও ও ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি। এগুলি খুব বেশী দরকার হয় না। খানিকটা

ধারণার জন্ত মোটামুটি একটা আভাষ দেবার চেষ্টা করছি। যদি প্রতি মাসে ৯০০ গ্রোস গজ ব্যাণ্ডেজ তৈরী হয় তবে মাত্র হাজার তিনেক টাকার মত এই সব জিনিষ কিনতে লাগবে। যদি কোন পাঠকের এই শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহ থাকে তকে তাঁরা স্থানীয় এলাকার যে কোন ঔষধের দোকানে গিয়ে এর বিক্রয় দরটা জেনে নিতে পারেন। আর কি পরিমাণ এর চাহিদা তা একদিন একটি হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ খবর নিলেই একটা পরিষ্কার ধারণাও হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নবদ্বীপ শাখা অফিসের বর্তমান এজেন্ট্ শ্রীদিলীপ কুমার মিত্রের সঙ্গে কথা হলো। আমার প্রশ্ন ছিল জাতীয়করণ ব্যাঙ্ক হিসেবে এই ব্যবসায় কতটুকু সাহায্য পাওয়া যাবে? তিনি জানালেন যদি কেউ এই শিল্পের স্কীম (অবশ্যই S.I S.I কর্তৃক মনোনিত) নিয়ে আসেন তবে নিশ্চয় সাহায্য পাওয়া যাবে। তবে নিজস্ব শেড থাকা চাই।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF SURGICAL GAUGE, BANDAGE

150 Gross/p.m,

A.	**Non-Recurring Expenditure**			Rs	20500/-
(a)	Land	4 cottahs—Own/Rental			
(b)	Covered Area	1200 sft ,, ,,			
(c)	*Machinery & Equipment*			Rs	18000/-
(i)	Automatic Bandage cutting machine	(1)	Rs. 6000/-		
(ii)	Automatic Bandage Rolling machine	(1)	Rs. 6000/-		
(iii)	Steriliser	(1)	Rs. 3000/-		
(iv)	Wooden Vats	(4)	Rs. 2000/-		
(v)	Aluminium Pans	(10)	Rs. 1000/-		
			Rs. 18000/-		
(1)	Other Expenses			R	2500/-
(a)	Installation charges		Rs. 1000/-		
(b)	Tools Equipments		Rs. 500/-		
(c)	Water & Powerline Connections		Rs. 1000/-		
			Rs. 2500/-		
	Total Non-Recurring Expenditure			Rs.	20500/-

B. Recurring Expenditure Rs. 7500/-

(1) *Raw Materials* Rs. 6000/-

(i)	Bandage & Gauge Fabrics	Rs. 3000/-
(ii)	Packing Paper	Rs. 1000/-
(iii)	Misc Chemicals	Rs. 2000/-
		Rs. 6000/-

(2) *Salaries & Wages* Rs. 1500/-

(i)	Manager	(1)	250/-
(ii)	Workers	(2)	Rs. 300/-
(iii)	Office Assistants	(2)	Rs. 450/-
			Rs. 1000/-
(iv)	Power, Rent & Taxes		Rs 500/-
			Rs. 1500/-

Total Recuring Expenditure Rs. 7500/-

C. Capital Outlay Recurring Expenditure & Non Recurring Expenditure.

=Rs. 20500/-+22500/-
=Rs. 43000/-

D. Tentative Profit & Loss A/C P. A.

By sale of 1800 Gross of Gauges and Bandages @ Rs. 40/-per gross.	Recurring Expenditure Rs. 22500/-
	Depriciation on Machi-nery @ 15% P.A. (on Rs. 18000/-) Rs. 2700/-
	Depriciation on other heads @ 10% P.A. (on Rs. 2500/-) Rs. 250/-
	Interest on Capital outlay @ 10% P.A. (on Rs. 43000/-) Rs. 4300/-
	Profit (Un-Taxed) Rs. 42250/-
Rs. 72000/-	Rs. 72000/-

ব্লীচিং পাউডার

ব্লীচিং পাউডার এরূপ একটি শিল্প যা বড় করে করলে মাঝারি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে আবার ছোট করে তৈরী করলে ক্ষুদ্র শিল্পের আকারে পড়ে। পশ্চিমবাংলায় একটি নামকরা কোম্পানি সমেত দু-চারটি ছোট কোম্পানি ব্লীচিং পাউডার তৈরী করেন। দেখা যায় যে ছোট আকারেই হোক বা বেশ বড় আকারেই হোক, যদি এই শিল্প গড়ে তোলা যায় তবে প্রতি কেজি ৬০ পঃ কাছাকাছি খরচ পড়ে। আর বাজারে বিক্রী হয় প্রতি কেজি ১-২৫ পঃ থেকে ১-৫০ পঃ মধ্যে। হাতে-কলমে কাজ করার সময় যদি দেখা যায় যে উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৬০ পঃ বেশী নয়, তাহলে এইটিকে আমরা লাভজনক রসায়ন শিল্প বলতে পারি।

এখন দেখা যাক ব্লীচিং পাউডার কি? খুব সহজ ভাষায় উত্তর দিতে গেলে বলা যায় চুণ আর ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণ। একটি সলিড্ আর অপরটি গ্যাস। এই দু'টি কিভাবে মিশবে? সেই কারণে এই দুটির মাঝখানে একজনকে দাঁড় করাতে হয়। সেই জিনিষটি হ'ল জল। এবার আমরা জানতে পারলাম চুণ, জল আর ক্লোরিন গ্যাসের সংমিশ্রণে ব্লীচিং পাউডার তৈরী করা হয়। আরও দু-তিন ভাবে তৈরী করা যায়। তবে তার জন্য দামী মেসিনপত্রের দরকার। যে পদ্ধতি এখানে বলা হ'ল তা সব থেকে সহজ পদ্ধতি ও সামান্য মূলধনে তৈরী করা যায়। বাজারে যে ব্লীচিং পাউডার বিক্রী হয় তাতে শতকরা হিসাবে ৩১ থেকে ৩৫ ভাগ পর্য্যন্ত ক্লোরিন থাকে। এই ভাগটাই ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানে স্বীকৃত। এর থেকে যদি ক্লোরিন কম থাকে তবে তাকে নিম্ন মানের পর্যায়ে ধরা হয়।

এবারে ভাগটা দিয়ে দিচ্ছি। এতে বুঝতে আরও সুবিধা হবে।

চুণ ও জল	—	৪০+৩৪= ৭৪ ভাগ
ক্লোরিন গ্যাস	—	৭০ ,,
মোট মাল তৈরী হবে	—	১২৬ ,,

তৈরী করার সময় ভাগের বদলে গ্রাম বা কেজিতে নেওয়া চলতে পারে। আগেই বলা হয়েছে মোট তিনটি কাঁচামাল লাগে। তার মধ্যে চুণ ও জল কোথায় আর কত দামে কিনতে পাওয়া যাবে, আশাকরি এ নিয়ে আলোচনা

করার দরকার নেই। এখন বাকী থাকে একটিমাত্র কাঁচামাল, ক্লোরিন গ্যাস। লোহার সিলিণ্ডারে বাজারে পাওয়া যায়। আই, সি, আই সমেত অনেক কোম্পানি তৈরী করেন। আসল কথা, যাঁদের কষ্টিক সোডার কারখানা আছে তাঁরাই ক্লোরিন গ্যাস তৈরী করেন।

প্রতিদিন যদি ৩০ থেকে ৩৫ কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে মাসে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করতে পারা যায়। এই হারে যদি উৎপাদন বজায় রাখা যায় তবে কাঁচামাল কেনার জন্য ৮০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা লাগতে পারে। এর থেকে কম উৎপাদন করে লাভ করা যাবে না। যদি ক্ষুদ্র শিল্পের আকারে এটি তৈরী করা যায় তবে প্রথম দিকে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ পড়ে যাবে। অবশ্য "ব্লক্ ক্যাপিটেলের" মধ্যে ধরতে হবে একটি লোহার চেম্বার, চার পাঁচটি বড় কাঠের হাতা ও ১৫ থেকে ২০টি কাঠের ট্রে। লোহার চেম্বারটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে ট্রেগুলি বসানোর পর দুটি ট্রের মধ্যে ফাঁক একটু বেশী থাকে। কারণ চুণেতে যখন জল দেওয়া হবে তখন ফুলে উঠবে। যদি জায়গা না পায় তবে চেম্বারের চারদিকে ছড়িয়ে যাবে ও ক্লোরিন গ্যাস ঠিকমত অ্যাব্‌জরব্‌ করতে পারবে না। ব্লীচিং পাউডার তৈরী করার প্রধান কাজ হ'ল চুণকে ঠিকমত ক্লোরিন গ্যাস অ্যাব্‌জরব্‌ করান। আরও একটা কথা, ব্লীচিং পাউডার তৈরী করতে গেলে ডেলা পাথুরে চুণের দরকার। এতে জল মেশান হলে চুণ ফেঁপে ওঠে ও গরম হয়ে যায়। ক্লোরিন গ্যাস যখন pass করান হবে তখন উত্তাপ ৪০°C উপরে না হয়। এই জিনিষটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

যদি কাঠা তিনেক জায়গা পাওয়া যায় তবে এই কারখানা করা যেতে পারে। সমস্ত জায়গায় শেড দেওয়া দরকার। তা না হলে চুণে যদি আগে থাকতে বৃষ্টির জল পেয়ে যায় তবে ঐ চুণ আর কাজে লাগাতে পারা যাবে না। এ ছাড়াও তৈরী মাল লোহার ড্রামে, শেডের মধ্যে রাখতে হবে। তাই সমস্ত জমিতে শেডের দরকার হয়। ব্লীচিং পাউডারের কারখানা শহরের মধ্যে অর্থাৎ যেখানে লোকজন বসবাস করে সেই রকম জায়গায় করা চলবে না। কারণ ক্লোরিন গ্যাসের গন্ধ অনেকে সহ্য করতে পারেন না। তাই ভবিষ্যতে যাতে অসুবিধা না হয় সেই কারণে প্রথম দিকেই সাবধান

হওয়া ভাল। যেখানে লোকজন বসবাস করে না অথচ ফাঁকা জায়গা রয়েছে সেই রকম জায়গায় তৈরী করা সব থেকে ভাল ও নিরাপদ।

এখন দেখা যাক ব্লীচিং পাউডার কোথায় ব্যবহার হয়? এক কথায় বলতে গেলে এর বিক্রয় বাজার সর্বত্র। যেখানে ফিনাইল দরকার হয়, এই জিনিষটির প্রয়োজন সেইখানে। তবে ব্লীচিং পাউডারে আরও একটি বেশী কাজ হয়, কোরা কাপড় বা শাড়ি কাচতে এই রসায়নটি একান্ত দরকার। এ ছাড়াও সব হাসপাতালে, কর্পোরেশনে, মিউনিসিপ্যালিটিতে ও রেলওয়েতে বার মাস প্রচুর চাহিদা রয়েছে। যদি ৫০০ গ্রামের পলিথিনের প্যাকেটে করে দোকানে বিক্রী করা যায় তাতেও মাল বিক্রী হয়ে যায়। তবে পরিশ্রম একটু বেশী পড়ে। সাধারণ লোক নালাতে বা ল্যাট্রিনেতে ব্যবহার করার জন্তে অনেক সময় দোকান থেকে ৫০০ গ্রামের প্যাকেট কিনে নিয়ে যান। বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী অফিসেও ব্যবহার করা হয়।

এমন কতকগুলি রসায়ন আছে যে গুলির নাম চলতি কথায় যদি বলা হয় তবে অনেকে হয়তো ঠিক ধরতে পারেন না। হীরাকস নামটা অনেকে শুনে থাকতে পারেন, কিন্তু জিনিষটি যে কি তা বোধ হয় জানেন না। রসায়ন শাস্ত্রের ভাষায় একে বলা হয় ফেরাস সালফেট। খুব অল্প মূলধনে এই জিনিষটি তৈরী করা যায়। আর তৈরী করাও খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। মাত্র দু-রকমের কাঁচা মালের দরকার হয়। বৃহৎ শিল্পে এটি উৎপাদন করার থেকে ক্ষুদ্র শিল্পে এটি উৎপাদন করলে ভালই হয়। তবে গ্রামের মধ্যে এই শিল্প গড়া চলবে না। কারণ তাতে লাভ অনেক কমে যাবে। সব থেকে ভাল হয় যেখানে অনেক লেদ্ মেসিন আছে, অর্থাৎ প্রচুর পরিমানে স্ক্র্যাপ্ লোহা পাওয়া যায় সেই জায়গায় বা তার আশেপাশে এর কারখানা করতে পারলে খুব ভাল হয়। কারণ অল্প খরচে স্ক্র্যাপ লোহা নিজের কারখানায় আনা যায়।

আরও সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। আমি দুটি কাঁচামালের কথা বলেছি। (১) মরিচা ধরা ছোট ছোট লোহার টুকরা (২) সালফিউরিক এ্যাসিড। সেই কারণে যেখানে ছোট খাট লোহার কারখানা আছে সেই রকম জায়গায়

কারখানা করা ভাল। আবার মরিচা ধরা লোহার টুকরা যত ছোট হবে, ফেরাস সালফেটের কোয়ালিটি ততই ভাল হবে। দেখতে ফিকে সবুজ রংয়ের। জলে দিলে গলে যায়। আর সাইজ হয় ছোট, বড় ও মাঝারি জেলার আকারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে আমরা বলে থাকি ৩ থেকে ১০০ মেশের মধ্যে হবে। জিনিষের কোয়ালিটি অনুসারে বাজারে দামটাও কম বা বেশী হয়ে থাকে। একেবারে ছোট দানা ও Commercial Grade, সেটার দামটা একটু কম। প্রতি কেজি ১ টাকা করে বিক্রী হয়। আর যেটা বড় দানা ও ভাল কোয়ালিটি তার দাম পড়ে ২ টাকা প্রতি কেজি।

ঠিক যে ভাবে অ্যালিউমিনিয়াম সালফেট তৈরী করা হয় হীরাকসও ঐ রকম ভাবে তৈরী করতে হবে। তবে এখানে উত্তাপ বেশী লাগবে। তাই কি কি মেসিন লাগবে তার তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। (১) ভাঁটি (মাটির) একটি, (২) পাকা চৌবাচ্চা দু'টি, (৩) লেড্‌লাইণ্ড ভ্যাট দু'টি, লোহার কড়াই দু'টি, (৪) এস, এস—প্যান একটি, (৫) এস, এস,—খুন্তি একটি। ভাঁটির পাশেই দুটি চৌবাচ্চা রাখতে হবে। মাঝখানে ৬ ইঞ্চি গোল করে বাদ দিয়ে সমস্ত চৌবাচ্চা ঢেকে রাখতে হবে। কারণ গরম লোহা যখন চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জলে ফেলে দেওয়া হবে তখন গরম জল ছিটকে চোখে বা মুখে লেগে যে কোন সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

মাত্র তিন কাঠা জমি পেলেই এই কারখানা করা চলতে পারে। কেবল এক কাঠায় টালির বা টিনের শেড্‌ দিয়ে নিতে হবে। দু-জন লোক রাখলেই রোজ ৫০ কেজি বা তার থেকে সামান্য কিছু বেশী হীরাকস তৈরী করতে পারা যাবে। এর থেকে যদি আরও কম উৎপাদন করা হয় তবে লাভ করা খুব শক্ত ব্যাপার হবে। এই জিনিষটি কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ যা পড়ে, তার থেকে সামান্য লাভ রেখে বাজারে বিক্রী করতে হয়।

ফরমুলা

মরিচা ধরা লোহার টুকরা	৫৬ গ্রাম
ডাইলিউট সালফিউরিক এ্যাসিড	১৭০ সি. সি

কিভাবে সালফিউরিক এ্যাসিড ডাইলিউট করতে হবে, অর্থাৎ কতটা জলে কি পরিমাণ সালফিউরিক এ্যাসিড মেশাতে হবে? মনে রাখতে হবে, এ্যাসিডে জল মেশান চলবে না। পরিমাণ ম'ত এ্যাসিড নিয়ে ধীরে ধীরে

জলে মেশাতে হবে। ডাইলিউট এ্যাসিড করতে গেলে এইটাই নিয়ম। নতুবা বিপদ হতে পারে।

ফরমুলা

জল	১২০ সি. সি
সালফিউরিক এ্যাসিড	৫০ সি. সি

এখন দেখাযাক হীরাকস কিভাবে তৈরী করা হবে। টুকরা মরিচা ধরা লোহা একটি লোহার কড়ায়ের মধ্যে দিয়ে ভাঁটিতে ধীরে ধীরে গরম করতে হবে। যখন লাল হয়ে যাবে, হাতার সাহায্যে পাশের জল ভর্ত্তি চৌবাচ্চায় মাঝখানের ফাঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি লোহার টুকরা গুলি ফেলে দিতে হবে। এদিকে মাল তৈরী করার একদিন আগেই জল আর এ্যাসিড ফরমুলার মাপ অনুসারে মিশিয়ে রেখে দিতে হবে। এই কাজটি যদি আগে করে না রাখা হয় তবে মাল ঠিক মত তৈরী করা যাবে না। গরম লোহার টুকরা যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন ফের হাতার সাহাযো তুলে এ্যাসিড জলে দিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে ১ দিন বা ২৪ ঘঃ রেখে দিতে হবে। যদি লক্ষ্য রাখা যায় তবে দেখা যাবে লোহার টুকরা গুলি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে শেষ কালে ঐ লৌহ ও এ্যাসিড মিশ্রণ ঢিমা আঁচে জ্বাল দিয়ে জল তাড়িয়ে দিলে বিভিন্ন মেশের ফেরাস সালফেট পেয়ে যাব।

সব কথা জানার পরও একটি বিষয় অজানা থেকে যায়, সেটি বিক্রয় বাজার। বিভিন্ন প্রয়োজনে বাজারে ও কেমিক্যাল মার্কেটে হীরাকস্ বিক্রী হলেও এর প্রধান বিক্রয় বাজার, সেখায় কালী তৈরী করার কারখানায়, রং শিল্পে, ঔষধ শিল্পে ও সামান্য পরিমাণে রবার শিল্পে। দেখতে অনেকটা তুঁতের মত বলে অনেকে তুঁতের সঙ্গে ভেজাল হিসেবে ব্যবহার করে। তুঁতে অনেক সময় জমিতে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি হীরাকস মিশ্রিত তুঁতে জমিতে দেওয়া হয়, তবে জমির খুব ক্ষতি হয়। তাই এই কাজটি না করাই ভাল।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF HIRAKASA OR FERROUS SULPHATE 75 kg/Day

A. Non-Recurring Expenditure Rs. 2,500/-

(a) Land ·5 cottahs—Own/Rental

(b) Covered Area 3 ,, ,, ,,

(c) *Machinery & Equipment* Rs. 2,500/-

Furnace
Iron Pan
S. S. Pan
S. S. Stirrer
Weighing Scale
Reaction Vats

B. Recurring Expenditure/P. M. Rs. 2,000/-

(1) *Raw Materials* Rs. 1,000/-

Sulphuric Acid
Scrap Iron
Distilled water

(2) *Salaries & Wages* Rs. 500/-

Workers	(2)	Rs.	180/-
Sales man	(1)	Rs.	150/-
Manager	(1)	Rs.	170/-
		Rs.	500/-

Rent & Taxes	Rs.	200/-
Packing etc.	Rs.	300/-
	Rs.	500/-

Total Rs. 1000/- + Rs. 500/- + Rs. 500/- = Rs. 2,000/-

C. Capital out lay

Non-Recurring Expenditure + Recurring Expenditure for 3 months.

Rs. 2,500/- + Rs. 6,000/ = Rs. 8,500/-

D. Tentative Profit and Loss A/C P.A.

By sale of 27,000 kg of Hirakasa @ 1·25/kg.	Recurring Expenditure Rs. 24,000/-
	Depreciation on Machinery @ Rs. 15% P.A. (On Rs. 2,500/-) Rs 375/-
	Interest on Capital out lay @ 10% P.A. (on Rs. 8,500/-) Rs. 850/-
	Profit (Un Taxed) Rs. 8,525/-
Rs. 33,750/-	Rs 33,750/-

অ্যালিউমিনিয়াম সালফেট

নগরে, শহরে এমন কি গ্রামের মধ্যেও যে রসায়ন শিল্পটি গড়া যায় তার নাম অ্যালিউমিনিয়াম সালফেট। তবে এমন কতকগুলি শিল্প আছে যা একটু বড় করে না করলে তার থেকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ বিক্রয় দরটা, উৎপাদন খরচার থেকে অনেক কম হয়ে যায়। তাই ঐ সমস্ত শিল্পগুলি মেসিনের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমানে উৎপাদন না করলে বাজারে চালাতে পারা যায় না। কিন্তু অ্যালিউমিনিয়াম সালফেট এমন একটি রসায়ন যা একেবারে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের আকার থেকে বৃহৎ শিল্প আকারে করা চলতে পারে। সেই কারণে ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদিত অ্যালিউমিনিয়াম সালফেট বড় শিল্পে উৎপন্ন মালের সঙ্গে দামের দিক থেকে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে না। তবে ক্ষুদ্র শিল্পে যে ভাবে অ্যালিউমিনিয়াম সালফেট তৈরী হবে, তা মেসিনে প্রস্তুত বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে একটু পার্থক্য থাকবে।

এবার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের আকারে যদি এই রসায়নটি উৎপাদন করা হয় তবে সেটা লাভজনক হবে। তা হলে অ্যালিউমিনিয়াম সালফেট কি? যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তাঁরা নিশ্চয় জানেন জিনিষটি কি? তবু অনেকে হয়তো নাও জানতে পারেন। তাই জানিয়ে দিচ্ছি, চলতি কথায় বাংলায় যাকে আমরা ফিটকিরি বলি। যদিও আমাদের ম'ত সাধারণ লোকেরা পাড়ার মুদিখানার দোকানে দু-চার পয়সার ফিটকিরি বিক্রী হতে দেখি, তবু বলা যায় এটি বেশ লাভজনক ব্যবসা। প্রায় ধরতে গেলে সারা ভারতবর্ষের গ্রাম থেকে শহরে এর ব্যাপক চাহিদা। এখন এই শিল্পটি গড়তে গেলে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। (ক) কাঁচা মাল, (খ) মূলধন, (গ) বিক্রয় বাজার, (ঘ) জমি, (ঙ) শিল্প বিষয়ে জ্ঞান।

(ক) কাঁচামাল—দু'টি মাত্র কাঁচামাল লাগে ফিটকিরি তৈরী করতে। (১) অ্যালিউমিনিয়াম, (২) সালফিউরিক অ্যাসিড। ২নং কাঁচা মালটি কোথায় এবং কত দামে পাওয়া যায় তা নিয়ে অনেক জায়গায় লেখা হয়ে গেছে। পাঠক একটু দেখলেই পেয়ে যাবেন। আর ১নং মালটি পাওয়া যাবে অ্যালিউমিনিয়ামের কারখানায়। আমাদের এখানে লাগবে টুকরা বা

স্ক্র্যাপ্ অ্যালিউমিনিয়াম। এর কোন নির্দিষ্ট দর নেই। সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজের উপর। কায়দা করে যতটা সস্তায় কিনতে পারবেন, উৎপাদন খরচ সেই পরিমানে কমে যাবে। এখানে আরও একটি কথা বলার আছে। যাঁরা মেসিনে বা বড় কারখানায় ফিটকিরি উৎপাদন করবেন তাঁরা ঐ সব জায়গায় স্ক্র্যাপ অ্যালিউমিনিয়াম কিনতে যাবেন। কিন্তু যাঁরা ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পে উৎপাদন করবেন তাঁদের সব থেকে সস্তা পড়বে যাঁরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভাঙা, ফুটো এ্যালিউমিনিয়ামের থালা, বাটি, ঘটি, মগ, হাঁড়ি প্রভৃতি সস্তা দরে নিয়ে আসে, তাঁদের কাছ থেকে কিনতে পারলে। এতে লাভটা দু'ভাবে হবে। (১) কাঁচামাল কেনা ও বাজার থেকে নিয়ে আসার জন্য যে খরচ পড়ে সেটা বাঁচবে, (২) বড় কারখানায় কেনার থেকে ঐ সব লোকের কাছ থেকে কিনলে দামের দিক থেকে বেশ খানিকটা কম পড়বে। এবার তা'হলে নিশ্চয় বলা যেতে পারে এই দু'টি দিক দিয়ে যদি পয়সা বাঁচান যায় তবে উৎপাদন খরচ নিশ্চয় কমিয়ে আনা যাবে।

(খ) মূলধন—যদি মাসে গড়ে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে হয় তবে হাজার পাঁচেক টাকা প্রথম দিকে দরকার হবে। এর থেকে আর কম টাকায় কারখানা করা চলবে না। যে সমস্ত জিনিষগুলি একান্ত দরকার, সেগুলির তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। (১) ফার্নিস (মাটির ভাঁটি), (২) পাকা চোবাচ্চা দু'টি, ৩) স্টেন-লেস্-স্টীলের কড়াই একটি, (৪) খুন্তি চারটি, (৫) ঢালাই লোহার কড়াই তিনটি, (৬, হাতা দু'টি, (৭) ভ্যাট তিনটি। বিদ্যুৎ বা খুব বেশী জল এই শিল্পে দরকার হয় না। আর ফার্নিস বা ভাঁটি কয়লায় চালাতে পারা যায়। এখন বাকী থাকে কতটা পরিমাণে সালফিউরিক এ্যাসিড ও স্ক্র্যাপ অ্যালিউমিনিয়াম কেনা হবে? বাজারে যে রকম অর্ডার বাড়বে, তার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে কাঁচামাল কিনলেই হবে।

(গ) বিক্রয় বাজার—আগেই বলেছি এর বিক্রয় বাজার সর্বত্র। মুদিখানার দোকান থেকে বড় বড় কল কারখানায় এর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে খাবার জল ফিল্টার করার জন্য কর্পোরেশনে ও মিউনিসিপ্যালিটিতে, ঔষধের কারখানায়, রেলওয়েতে, ও দাঁত মাজার মাজনে এর চাহিদা প্রচুর। পশ্চিম বাংলায় রিসড়ায় ফস্ফেট কোম্পানি ও বেঙ্গল কেমিক্যাল্ এখন তৈরী করছেন। তবুও বলা যেতে পারে যদি ক্ষুদ্র শিল্পের আকারে এটি উৎপাদন করা যায় তবে

বাজারে চালান যেতে পারে। তাছাড়া যে সমস্ত কোম্পানি অ্যালিউমিনিয়াম হাইড্রো-অক্সাইড-জেল তৈরী করছেন তাঁদেরও ফিটকিরি একটি প্রধান কাঁচামাল। এই সমস্ত কোম্পানীতে নিজে গিয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(২) জমি—সাধারণভাবে দেখতে গেলে এক কাঠারও কম জমিতে এই কারখানা করা চলতে পারে। তবে কাঠা তিনেক জমি হলেই ভাল হয়। সব জায়গায় যদি সেড দিতে না পারা যায় দু-কাঠা জায়গায় সেড দিতেই হবে। জমিটাও একটু উঁচু হওয়া দরকার। কারণ বর্ষার সময় জমিতে জল বসলে ভাঁটি বা ফার্নিস খারাপ হয়ে যেতে পারে। যদি ফাঁকা জায়গা না পাওয়া যায় তবে ফার্নিসটা বাইরে করে অন্য কাজগুলি ঘরের মধ্যে করা চলতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে চৌবাচ্চা দু'টি ফারনিসের পাশে করতেই হবে। তা না হলে মাল তৈরী করার সময় অসুবিধা হতে পারে। কলকাতা ছাড়া যদি বাইরে করা যায় তবে জায়গার জন্য খুব একটা অসুবিধা হবে না।

(৩) শিল্প বিষয়ে জ্ঞান—এই জিনিষটির উপর নির্ভর করছে সবকিছু ; এমন কি উচ্চ মানের উৎপাদন ও তার বিক্রয় মূল্য। আমরা সবাই জানি প্রত্যেকটি ধাতুর একটি মেল্টিং টেম্পারেচার্ থাকে। দেখা গেছে এ্যালিউ-মিনিয়াম ৬৫০°C থেকে ৬৫৮°C তাপে গলে যায়। প্রথমে স্ক্র্যাপ্ এ্যালিউমিনিয়ামকে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে লোহার কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ফার্নিসে গরম করতে দিতে হবে। এখন দেখতে হবে কতটা গরম করা দরকার। ৪৫০°C থেকে ৫০০°C পর্যন্ত গরম হলেই অর্থাৎ যখন টকটকে লাল হয়ে যাবে তখন হাতার সাহায্যে এই গরম এ্যালিউমিনিয়ামকে কড়াই থেকে তুলে নিয়ে পাশের চৌবাচ্চায় ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। এই কাজটি খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার। এইভাবে গরম অ্যালিউমিনিয়াম ফেলার সময় চৌবাচ্চার জল যদি গরম হয়ে যায়, তবে জল বার করে দিয়ে আবার ঠাণ্ডা জল ভরে দিতে হবে; সেই কারণে পাশাপাশি দু'টি চৌবাচ্চা থাকলে ভাল হয়। এই কাজটিকে বলা যেতে পারে প্রথম ধাপ। এখন দ্বিতীয় ধাপে আলাদা একটি ভ্যাটে সালফিউরিক এ্যাসিড জল মিশিয়ে রেখে দিতে হবে। ভাগটা হবে ১ ভাগ এ্যাসিড ও ৪ ভাগ জল। এবার চৌবাচ্চায় যে অ্যালিউ-মিনিয়াম ভেজান আছে তা ভ্যাটের মধ্যে অর্থাৎ এ্যাসিড মিশ্রিত জলে ফেলে দিতে হবে। এই কাজটিও খুব সাবধানে করা দরকার। কারণ

একটু অসাবধান হলেই যে কোন সময়ে আগুন লেগে যেতে পারে। যদি এইভাবে উৎপাদন করা যায় তবে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে কেজি প্রতি লাভ থাকে ১ টাকার কাছাকাছি। ভাগটা দিয়ে দিচ্ছি।

অ্যালিউমিনিয়াম	...	১৬ ভাগ
জল মিশ্রিত এ্যাসিড	...	৯৭ ভাগ

এই ভাগটিকে কেজি, পাউণ্ড বা সেরে মেপে নিয়ে কাজ করা চলতে পারে। তবে অ্যালিউমিনিয়াম কেজিতে, ও এ্যাসিড জল মিঃ লিঃ মাপে নিলে কাজের সুবিধা হয়।

কপার সালফেট

পশ্চিমবাংলায় ছোটবড় মাঝারি শিল্প গড়ে উঠবে, আর তাকে ঘিরে বাঙালী শিক্ষিত বেকার যুবকরা বাঁচার রাস্তা খুজে পাবেন একথা ভাবতে যেমন আনন্দ হয়, আবার তেমনি রিক্ত বাঙালীর অর্থনৈতিক চেহারাটা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সে আনন্দের তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যে দেশে মূলধনের এত অভাব সেখানে শিল্প গ'ড়ে তোলার বিষয় নিয়ে আলোচনার কি দরকার! ঠিক কথা, তবু আমার এ আলোচনা দু'টি দিক বিবেচনা করে। (১) অনেক সময় দেখা যায় এরই মধ্য যাঁদের কিছু টাকা আছে অথচ কোন শিল্প বিষয়ে মোটামুটি জানা না থাকায় বা সঠিক পদ্ধতি না জানার ফলে সাহস করে কিছু করতে পারছেন না। (২) আবার অনেকের, যাঁদের উৎসাহ আছে ও অল্প সামান্য খরচ করতে পারেন, এই ভাবে কুড়ি বা ত্রিশজন মিলে সমবায় ভিত্তিতে একটি মাঝারি ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন। এই দু'টি মাত্র দিক ভেবে আমার এই আলোচনা।

সমবায় ভিত্তিতে যাঁরা শিল্প গড়ে তুলতে চান, তাঁরা প্রথমে নিজেদের মধ্যে কিছু দিয়ে মূলধন যোগাড় করা, পরে গ্রামের বা পাড়ার চেনা জানার মধ্যে শেয়ার বিক্রী ক'রে আরও মূলধন বাড়াতে পারা যায়। এইভাবে খানিকটা কাজ এগিয়ে গেলে বাকি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এটাও সবার জেনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্ক সমবায় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা সবথেকে আগে বিবেচনা করে দেখেন।

এবার যে রসায়ন শিল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তার নাম "কপার সালফেট"। আমরা যাকে চলতি কথায় তুঁতে বলে থাকি। তুঁতের সঙ্গে আমাদের সবার অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। একথাও ঠিক যে, প্রথম শ্রেণীর যে ক'টি রসায়ন দ্রব্য আছে, তুঁতে তাদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি এই শিল্পে সত্তর হাজার টাকার মত খরচ করলে প্রতিমাসে আট থেকে দশ হাজার টাকা "নেট প্রফিট" করা যায়। অথবা পঞ্চাশ হাজার বা তার বেশী খরচ করলে মাসে কম করে পাঁচ হাজার টাকার ম'ত লাভ থেকে যায়। এর থেকে কম টাকা বিনিয়োগ করে এ ব্যবসা লাভজনকভাবে চালাতে পারা যায় না।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তুঁতে না হয় করা গেল—কিন্তু সারা ভারতে এর চাহিদা কতখানি? গোটা ভারতবর্ষে দশ হাজার টনেরও বেশী দরকার হয় তুঁতের। আর সারা বছরে ভারতে মোট তুঁতের উৎপাদন পাঁচ হাজার টনেরও কিছু বেশী। তাহলে হিসেবে দাঁড়ায় মাত্র অর্ধেক চাহিদা মেটান যাচ্ছে। এরই ফলে কোন কোন সময় বাজারে তুঁতের অভাব দেখা দেয়। সেই কারণে দরও বেড়ে যায়। কলকাতায় মাত্র দু'টি ছোট অবাঙালী কোম্পানী আছে, আর টাটা সমেত সারা ভারতবর্ষে তিনটি বড় ফার্ম রয়েছে। তা'ছাড়াও খুঁজে দেখলে দু-চারটি হয়তো ছোট খাট প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে, তবে তাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা বিশেষ একটা উল্লেখযোগ্য নয়। আবার বিশুদ্ধতার দিক দিয়েও খুব একটা ভাল নাও হতে পারে। অবশ্য এটা আমার সম্পূর্ণ অনুমান মাত্র।

বড় বা মাঝারি যে কোন রকমের কারখানা হোক না কেন, মোটামুটি ভাবে এইক'টি জিনিষের দরকার হবেই। (ক) একটি ফারনেস। এটা ইলেকট্রিক, তেল অথবা কয়লা চালিত হতে পারে। অবশ্য যেখানে ইলেকট্রিক আছে সেখানে অন্য কোন শক্তি ব্যবহার না করাই ভাল। (খ) লেড লাইণ্ড ট্যাঙ্ক একটি, (গ) লেড লাইণ্ড ইভাপরেটার একটি, (ঘ) কাঠের ভ্যাট চার-পাঁচটি, (ঙ) ক্রীষ্টালাইজার একটি, (চ) ছাকুনি তিনটি কি চারটি। আর কাঁচামালের মধ্যে লাগে তামার পাত ও সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড। তামা আমাদের দেশে খুব কম পাওয়া যায়। তাই ভারত সরকার তুঁতে তৈরীর কারখানাকে বিদেশ থেকে তামার পাত আমদানি করার অনুমতি দেন। কিন্তু একথা অনেকে জানেন না যে, বাজারে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে

টুকরো তামা পাওয়া যায় (যাকে স্ক্র্যাপ কপার বলি) তার থেকে ভাল তুঁতে তৈরী করতে পারা যায়। একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এই স্ক্র্যাপ কপার থেকে তুঁতে তৈরী করার সব থেকে ভাল উপায়। ফলে বিদেশ থেকে আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয় না। সেই সঙ্গে উৎপাদন খরচও অনেক কমে যায়। হিসেবটা দিলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে। মাত্র একটন স্ক্র্যাপ কপার থেকে মোট সাড়ে চারটন কপার সাল্‌ফেট পাওয়া যাবে।

চাহিদা সম্বন্ধে আগেই বেশ খানিকটা আলোচনা হয়ে গেছে। এখন প্রত্যক্ষ ভাবে কোথায় কোথায় তুঁতে লাগে তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। বহু জায়গায় এর ব্যবহার, তার মধ্যে যেগুলি প্রধান যথা—(১) জমিতে, (২) ইস্পাত প্রকল্পে, (৩) অন্যান্য রসায়ন শিল্পে, (৪)—গাছ-পালা-সংরক্ষণে, (৫) ঔষধে, (৬) কাগজ শিল্পে, (৭) চামড়ার কারখানায়, (৮) সুতাকলে, (৯) রবার শিল্পে, (১০) কাঠশিল্পে, (১১) আঠা তৈরীতে।

সাধারণভাবে কপার সাল্‌ফেট তৈরী করতে গেলে জমি দরকার হবে প্রায় পাঁচ কাঠার ম'ত। তবে সমস্ত জায়গাটায় শেড না হলেও চলে যাবে। যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁরা সবটাই শেড করে নিতে পারেন। তা নাহলে কাঠা দুই কি তিনের ম'ত জায়গায় শেড করে নিতে পারলে কাজ চলে যাবে। অবশ্য প্রথম দিকে বেশী খরচ না করাই ভাল। আর গোটা পাঁচজন লোক লাগবে এই কারখানাটি চালাতে। শেষ করার আগে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি এই শিল্পে একটি এ্যাসিড রাখার জায়গার দরকার। অনেকে আজকাল পলেথিনের জারে রাখেন, আমার মতে প্রথম দিকে একটু বেশী খরচ করে ঢালাই লোহার ট্যাঙ্কে এ্যাসিড রাখা অনেক ভাল ও নিরাপদ।

বোরিক অ্যাসিড

একেবারে ঠিক প্রথম শ্রেণীর তালিকায় বোরিক এ্যাসিডের নাম না থাকলেও, চাহিদা ও ব্যবহারের বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম সারিতে নিশ্চয় স্থান দেওয়া যেতে পারে। এখানে, অর্থাৎ আমাদের দেশে রসায়নের স্থান নির্ণয় করা হয় বিদেশের বাজার থেকে আমদানি করার তালিকা দেখে। বোরিক এ্যাসিড অবশ্য বিদেশ থেকে এখন আর আমদানি করতে হয় না, বর্তমানে ভারতের প্রথম শ্রেণীর শিল্প নগরী বোম্বেতে বেশ বড় আকারের কারখানা তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সেই এককথা, যতটা আমাদের দেশে

প্রয়োজন সেই অনুপাতে উৎপাদন অনেক কম। ফলে কেমিক্যালের মার্কেটে একই দৃশ্য দেখতে হয়, ২৫ পঃ না হয় ৫০ পঃ দাম বেড়ে গেছে। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করুণ কারণটা কি? সোজাকথা, বোম্বে থেকে মাল আসছে না, তাই বাজার টান আছে। অবশ্য এইসব প্রয়োজনীয় রসায়নের ভারতে নিত্য চাহিদা রয়েছে।

বর্তমানে দেশের যা অবস্থা তাতে এখন কেউ আশি হাজার বা একলাখ টাকা খরচ করে মোরারজি কেমিক্যাল্‌য়ের ম'ত বড় কারখানায় বোরিক এ্যাসিড তৈরী করার কথা নিশ্চয় চিন্তা করবেন না। কিন্তু অল্প পয়সা বিনিয়োগ করে এই ধরণের ছোট ছোট কেমিক্যাল ইউনিট যদি পশ্চিমবাংলায় গড়া যায় তবে একদিকে চাহিদাও মোটে আবার অন্যদিকে মাঝারি শিল্পগুলি সবসময় ঠিক দামে মাল কিনতে পেরে তাঁদের উৎপাদনও বজায় রাখতে পারেন। অবশ্য বোরিক এ্যাসিড তৈরী করতে গেলে খরচা একটু বেশীই পড়ে যায়। কিন্তু অন্য একটি পদ্ধতি আছে, যদি সেই উপায়ে তৈরী করা হয় তবে বৃহৎ শিল্পে উৎপাদনের থেকে কোন অংশেই বোরিক এ্যাসিডের দাম বেশী হয় না। তবে উৎপাদন, ১০ থেকে ১৫ কেজির বেশী রোজ করা যাবে না।

বোরিক এ্যাসিড দেখেননি বা একবারও ব্যবহার করেন নি, এমন লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে। আর কিছু না হোক বোরিক কটন্ ব্যবহার না করুণ, নিশ্চয় দেখে থাকবেন। বহু প্রকার শিল্পে ও ঔষধে বোরিক এ্যাসিড ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার এটি দু রকম কোয়ালিটির হয়। (১) আই, পি, কোয়ালিটি, অর্থাৎ একেবারে পিওর—এটি ব্যবহার হয় ঔষধ শিল্পে। (২) টেক্‌নিক্যাল্ কোয়ালিটি—এটি লাগে রসায়ন শিল্পে। তবে তৈরী করার পদ্ধতি একই থাকে। প্রথমে টেক্‌নিক্যাল্ কোয়ালিটি করে পরে আই, পি—কোয়ালিটি করা হয়। যে সমস্ত শিল্পে এর প্রধান ব্যবহার তার নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। (১) ঔষধ শিল্পে, (২) কাচ শিল্পে, (৩) রবার শিল্পে, এই তিনটি শিল্পে প্রধান ব্যবহার—আর লাগে ল্যাবরেটরীতে, ইলেকট্রিক বাল্‌ব তৈরী করতে ও সামান্য পরিমাণে প্রসাধন শিল্পে। আরও অনেক ছোট শিল্পে এর ব্যবহার আছে। অল্প পরিমাণে লাগে বলে সেগুলির নাম উল্লেখ করলাম না।

রোজ যদি ১০ কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে মাত্র কাঠা চারেক জায়গা পেলেই কাজ চলে যাবে। এর মধ্যে কিন্তু সমস্ত জায়গাটায় শেড দিয়ে

ঘিরতে হবে। যদি শেড দেওয়ার জায়গা না পাওয়া যায় তবে মাঝারি সাইজের চারটি ঘর পেলেই হবে। তবে একেবারে গ্রামের মধ্যে এই শিল্প গড়তে গেলে একটু অসুবিধা আছে। মহানগরে বা তার আশেপাশে হলেই ভাল হয়। কারণ এই শিল্প চালাতে গেলে বিদ্যুৎশক্তি একান্তভাবে দরকার। উৎপাদনের হারটা যদি একই থাকে তবে মাত্র তিন থেকে চারজন লোক রাখলেই কোন অসুবিধা হবে না।

এবার আসা যাক এই জিনিষটি তৈরী করতে কি কি কাঁচামাল লাগে? (১) বোর‍্যাক্‌স্‌, (২) সালফিউরিক এ্যাসিড। প্রথমটি পাওয়া যায় কলকাতার যে কোন কেমিক্যালের দোকানে। এক মেট্রিক টনের দাম পড়ে ২,৫০০ টাকার কাছাকাছি। আর দ্বিতীয়টি তৈরী করে বেঙ্গল কেমিক্যাল, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া সমেত অনেক কোম্পানি। এরও দাম পড়ে ৩৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত। প্রথমে দুটিকে আলাদা পাত্রে সল্যুশন করে নিতে হবে। এবার সালফিউরিক এ্যাসিড সল্যুশন, বোর‍্যাক্‌স্‌ সল্যুশনে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এখন ঐ মিশ্রণকে গরম অবস্থায় ফিল্টার করতে হবে। যদি না করা হয় তবে সোডিয়াম সালফেট বোর‍্যাক্‌স্‌ এর সঙ্গে চলে আসবে। এইভাবে বার বার বিভিন্ন উত্তাপে ফিল্টার পদ্ধতিতে দ্রবণ থেকে বোরিক এ্যাসিডকে আলাদা করে নিতে হবে। দেখা গেছে খুব কম করে তিন—থেকে চার বার পর্য্যন্ত ফিল্টার করতে হয় বোরিক এ্যাসিডকে আলাদা করতে। যত সহজভাবে এখানে বলা হ'ল, কিন্তু মাল তৈরী করার সময় এই রকম সহজে হয় না। একটু দোষ হলেই সমস্ত production টাই খারাপ হয়ে যাবে। তাই খুব সাবধানে ফিল্টার করতে হয়। শেষকালে ভ্যাকিউয়াম ইভাপরেটারের সাহায্যে ঘন করে নিয়ে ক্রিষ্টাল করতে হবে।

যে পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করা হ'ল, ঠিক সেই ভাবে এটি তৈরী করতে গেলে ৩-৫০ পঃ থেকে ৪ টাকার মধ্যে প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ পড়ে যাবে। অবশ্য এখানে যে হিসেবটা ধরা হচ্ছে তা প্যাকিং করার খরচ নিয়ে। আর বাজারে বিক্রী হবে প্রতি কেজি ৫-৫০ পঃ থেকে ৬ টাকার মধ্যে। তাহলে হিসেব করে দেখা যায় মাসে খুব কম করে লাভ থাকে ৭০০ থেকে ৯০০ টাকার মধ্যে। এটা কিন্তু একটা অনুমান করে হিসেব করা হ'ল। সামান্য কম বা বেশী হতে পারে। সর্বশেষ যে প্রশ্নটি এসে যাচ্ছে তা হ'ল প্রথমে কত টাকা নিয়ে আরম্ভ করা যাবে, আর মেসিনপত্র কেনার জন্য কত টাকা লাগবে?

প্রথমদিকে এটি চালু করতে গেলে মেসিনপত্র কিনতে ও বসানোর খরচ নিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা পড়ে যাবে। আর প্রতিমাসে কাঁচামাল কিনতে খরচ পড়বে আট থেকে দশ হাজার টাকা। তাহলে মোট খরচ দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। আরও একটু কম করে করা যায়। তাতে কিন্তু কারখানা লাভজনকভাবে চালাতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। তাই টাকাপয়সা খরচ করে বিরাট ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। এবার মেসিনগুলির তালিকা দিয়ে দিচ্ছি, পাঠক ইচ্ছে করলে বাজারে গিয়ে মেসিন পত্র যেখানে বিক্রী হয় সেখানে খোঁজ-খবর নিতে পারবেন। (১) ভ্যাকিউয়াম ইভাপরেটার, (২) ভ্যাকিউয়াম ক্রিষ্টালাইজার, (৩) এস, এস, প্যান, (৪) এস, এস-ইলেকট্রিক-অপারেটেড-স্টারার, (৫) হট্-ফিল্টারেশন-অ্যাপ্যারেটাস প্রভৃতি। এর মধ্যে ১নং ও ২নং মেসিনটির দাম ১৪,০০০, থেকে ১৫,০০০, টাকার মধ্যে পড়বে। আর বাকীগুলো অল্প দামের মেসিন। মাত্র পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাঙ্ক থেকে যাতে ঋণ পাওয়া যায় তাই একটু বড় করে একটা স্কীম দিয়ে দিচ্ছি। যাঁরা জমি ও মেসিনের জন্যে অর্ধেক টাকাটা প্রথম দিকে খরচ করতে পারবেন তারা ব্যাঙ্কে গিয়ে স্কীমটা জমা দিয়ে ঋণের জন্য আবেদন করে দেখতে পারেন।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF BORIC ACID 25kg/DAY

A. Non-Recurring Expenditure — **Rs. 20,000/-**

(i) Land — 300 sft. (approx.) own/Rental

(ii) Covered area 200 sft. — ,, ,,

(iii) Machinery and Equipment — Rs. 18,000/-

(*a*)	Vacuum Evaporator	Rs. 6,000/-
(*b*)	Vacuum Crystallizer	Rs. 6,000/-
(*c*)	S. S. Pan	Rs. 1,000/-
(*d*)	Electrically Operated Stirrer	Rs. 2,500/-
(*e*)	Filtration Apparatus	Rs. 2,500/-
		Rs 18.000/-
(*f*)	Installation Charges	Rs. 500/-
(*g*)	Water and Power line Connections	Rs. 1.000/-

(*h*) Misc. Equipment like weighing
Scale, Lab. Apparatus etc. Rs. 5,00/-

Rs. 2,000/-

Total Non-recurring Expenditure Rs. 18,000/-+
Rs 2,000/-=Rs. 20,000/-

B. Recurring Expenditure/P. M. Rs. 4,000/-

(1) *Raw materials* Rs. 2,000/

(a) Borax
(*b*) Sulphuric Acid
(*c*) Misc. Chemicals.

(2) *Salaries and wages* Rs. 2,000/-

(*a*) Chemist (1) Rs. 500/-
(*b*) Workers (2) Rs. 300/-
(*c*) Sales man (1) Rs. 200/-
Rs. 1,000/-

(*d*) Rent, Electricity and Taxes Rs. 400/-
(*e*) Paking etc. Rs. 600/-

Rs. 1,000/-

Total Recurring Expenditure=
Rs. 2,000/-+Rs. 1,000/-+Rs. I,000/-=Rs. 4,000/-

C. Anticipated Capital out lay=Non-recurring+Recurring
Expenditure for 3 months.
Rs. 20,000/-+Rs. 12,000/-=Rs. 32,000/-

D Tentative Profit and Loss A/c. P. A.

By sale of 9,000 kg. of Boric Acid @ Rs. 8·00 per kg.	Recurring Expenditure	Rs. 48,000/-
	Depreciation on Mechinery @ 15% P A. (on Rs. 18,000)	Rs. 2,700/-
	Depreciatian an other Non-recurring heads @ 10% P.A. (on Rs 2,000/-)	Rs. 200/-
	Interest on Capital out lay @ 10% P. A. (on Rs. 32,000/-)	Rs. 3,200/-
	Profit (un-Taxed)	Rs. 17,900/-
Rs. 72,000/-		Rs. 72,000/-

দিয়াশলাই শিল্প

দিয়াশলাইয়ের কথা বলতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বহু বছর পেছনে। যেখানে লেজকাটা বানর প্রথম শিখল দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে। তারপর হ'ল তার মেরুদণ্ড সোজা। আরও কয়েক হাজার বছর পরিশ্রমের পর হ'ল তার মনুষ্যত্বের বিকাশ। সে যুগকে বলি আমরা আদিম যুগ। সত্যিকথা বলতে কি প্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেতে ও নিজের প্রয়োজনে আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আগুন জ্বালার পদ্ধতি। কোন একজন আদিম পুরুষ নিজের খেয়ালে দু'টি কাঠের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘষতে ঘষতে জ্বলে উঠে ছিল আগুন। আগুনের উত্তাপে গরম হয়ে আদিম পুরুষ বুঝতে পারল প্রকৃতির নির্মম শিতল হাওয়া থেকে বাঁচবার একটি মাত্র পথ হ'ল এই আগুন। এরপর জাগল তাকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি। মানুষের জীবনে ঘটতে লাগল বিবর্তন। পেরিয়ে এল প্রস্তর যুগ, লৌহ-যুগ, এল ইস্পাতের যুগ। আরও সহজ পদ্ধতিতে ও অল্প সময়ে পাথর আর ইস্পাতে ঘর্ষণ করে তার ফুলকি দিয়ে আগুন জ্বালল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ও নিত্য নতুন গবেষণায় শেষ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হ'ল আগুনকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের পদ্ধতি। এই ভাবে অগ্রগতির পর সর্বশেষ তার আবিষ্কার আধুনিক শেফ্‌টি ম্যাচ্‌ বা দিয়াশলাই।

যদিও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর থাকায় সুইডেনের পক্ষে আধুনিক দিয়াশলাই তৈরী অনেক সহজ হয়েছে, তবুও আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ নিজের সামর্থ অনুযায়ী দিয়াশলাই উৎপাদন করছেন। ভারতবর্ষও সেই তালিকায় পড়ে। যদিও আমাদের দেশে বহু ছোট বড় দিয়াশলাই তৈরীর কারখানা রয়েছে তবুও স্থানীয় বেশ খানিকটা এলাকা নিয়ে একেবারে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের পর্য্যায়ে দিয়াশলাই করা চলতে পারে।

এবার দেখা যাক রাসায়নিক পদ্ধতিতে কিভাবে আগুন জ্বালান হয়। মাত্র দু'টি রসায়ন হলেই আগুন জ্বালা যায়। (১) পটাশিয়াম ক্লোরেট, (২) সালফিউরিক এ্যাসিড। এই দু'টি জিনিসের মিশ্রণ ঘটলেই আগুন জ্বলে ওঠে। অবশ্য এ পদ্ধতি যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন তাঁর নাম চ্যানসেন। ভদ্রলোক ইউরোপের অধিবাসী। তাঁর পদ্ধতি ছিল চিনি বা ঐ জাতির কোন আঠার সঙ্গে পটাশিয়াম ক্লোরেট মিশিয়ে একটা কাঠিতে শুকিয়ে নিলেন, তারপর সেই

কাঠিটি সালফিউরিক এ্যাসিডে ডুবিয়ে দিয়ে আগুন জ্বালালেন। এইভাবে আগুন জ্বাললেও এই পদ্ধতি কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ সালফিউরিক এ্যাসিড নিয়ে সব সময় ঘুরে বেড়ানো বিপদ জনক। তাই এই জিনিষ ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে গেল।

আজকের যে দেশলাই, আমরা যেটা বাজারে বা দোকানে দেখতে পাই তা অধিকাংশ বড় বড় কলকারখানায় প্রায় সম্পূর্ণ মেসিনে তৈরী হয়। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে কুটীর শিল্পে দেশলাই উৎপাদন বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম। যদি গ্রামে গৃহস্থঘরে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও অল্প বয়সের বালকরা দেশলাই তৈরীর কাজে লাগে, তবে উৎপাদন খরচ অনেক কম পড়বে। এই ব্যাপারে আমাদেরই বন্ধু রাষ্ট্র জাপান বিশেষ ভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। যাঁদের একটু বয়স হয়েছে তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে একসময় জাপানের তৈরী দেশলাই সারা ভারতবর্ষের বাজার সম্পূর্ণ দখল করে রেখে ছিল। মোটামুটিভাবে এই ক'টি রাসায়নিক দ্রব্য হোলেই দেশলাই তৈরী করা যাবে।

(১) এ্যান্টিমনি সালফাইড, (২) পটাসিয়াম ক্লোরেট, (৩) পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট, (৪) রেড লেড ও (৫) গঁদের আঠা। এতো গেল রাসায়নিক দ্রব্য। আর যা লাগবে, (১) পাতলা কাঠি, (২) দেশলাইয়ের খোল, (৩) বাক্সের ওপরের লেবেল। যদি এই শিল্প আরম্ভ করা যায় তবে খুব কম করে সাত আটশো টাকা হলেই প্রথম দিকে বেশ ভালভাবে চলে।

সাধারণভাবে দেশলাইতে কাঠি, বা বাক্সের জন্য যে কাঠ ব্যবহার করা হয় তা হয় পাইন, না হয় দেবদারু। অবশ্য এই দুই জাতের কাঠ বিশেষ ভাবে দেশলাই শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু কুটীর শিল্পের আকারে এই শিল্প যখন গড়ে উঠবে তখন কিন্তু পাইন বা দেবদারু কাঠ ব্যবহার করা চলবে না। সব থেকে ভাল হয় যদি বাঁশ থেকে কাঠি বা বাক্স তৈরী করা যায়। গ্রাম অঞ্চলে সহজে ও অল্প দামে বাঁশ সংগ্রহ করা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। এর পরে যদি কেউ দেশলাই তৈরীর বিষয়ে আরও বিষদ ভাবে জানতে চান তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনায় একটি ট্রেনিং সেণ্টারে গিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

এবার দিয়াশলাই তৈরী করার দু'তিনটি ফরমূলা এখানে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথমে অল্পকরে তৈরী করে দেখে নেওয়া উচিত কোনটা ভাল হয় ও দামের দিক থেকে সস্তা পড়ে। পরে সেই ম'ত তৈরী করা চলবে।

ফরমূলা—১ (ক)

পটাসিয়াম ক্লোরেট	৭২৫ গ্রাম
এ্যাণ্টিমনি সালফাইড	২৯৫ গ্রাম
শিরীষ আঠা	১২৫ গ্রাম

ফরমূলায় যে তিনটি কাঁচামাল দেওয়া হ'ল তার মধ্যে প্রথমে শিরীষ আঠা কে ২০০ সি.সি জলের মধ্যে দিয়ে সামান্য গরম করে আঠা তৈরী করে নিতে হবে। এর পর বাকী দু'টি কাঁচামাল একটির পর অপরটি মিশিয়ে যে মণ্ড তৈরী হবে তা দেয়াশলাই কাঠিতে লাগিয়ে দিলেই (শুকিয়ে যাবার পর) বারুদ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। অর্থাৎ ফরমূলা ১(ক) দিয়েশলাই কাঠিতে লাগাবার জন্যে যে বারুদের প্রয়োজন হয় তা এখানে দেওয়া হ'ল।

ফরমূলা—২(খ)

অক্সাইড অফ ম্যাঙ্গানীজ	১ কেজি
এমারফস ফস্‌ফরাস	১'২২৫ গ্রাম
শিরীষ অথবা গঁদ	৫২৫ গ্রাম

দিয়াশলাই এর বাক্সের দু'পাশে যে বারুদ লাগানো থাকে তা এই ফরমূলার সাহায্যে তৈরী করা হয়। পদ্ধতি ঠিক আগের মতই। প্রথমে ৬০০ সি. সি. জল নিয়ে আঠা তৈরী করতে হবে। এরপর বাকী দু'টি জিনিষ একে একে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা দরকার। শেষে কোন বুরুষের সাহায্য দু'পাশের কাগজ মাখিয়ে দিয়ে চড়া রোদ শুকিয়ে নিতে হবে।

ফরমূলা—১ (গ)

পটাসিয়াম ক্লোরেট	৬০০ গ্রাম
পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট	২৪০ গ্রাম
অক্সাইড অফ লেড	২৪০ গ্রাম
গঁদ	৩৭৫ গ্রাম

প্রথমে ৭০০ সি. সি. জলেতে গঁদের আঠা তৈরী করে নিয়ে বাকী জিনিষ মিশিয়ে দিতে হবে। এতে কাঠিতে লাগাবার বারুদ তৈরী হবে।

ফরমুলা—২ (ঘ)

অক্সাইড অফ ম্যাঙ্গানীজ	৬০০ গ্রাম
এ্যান্টিমনি সালফাইড	৫০ গ্রাম
বাইক্রোমেট অফ পটাশ	৭৫ গ্রাম
কাঁচগুড়ো	৫০ গ্রাম
গঁদ	১০০ গ্রাম

২০০ সি. সি. জলেতে (গরম) গঁদের আঠা তৈরী করে নিয়ে সমস্ত জিনিষগুলো মিশিয়ে দিয়ে বুরুষে করে দিয়েশলাইয়ের বাক্স লাগিয়ে দিতে হবে। কাচগুঁড়ো খুব মিহি হওয়া দরকার। সবথেকে ভাল হয় পাতলা কাপড় দু'বার ছেঁকে নিতে পারলে। আসলে দেখতে অনেকটা পাউডারের মত হবে। শেষের দু'টি ফরমূলায় তৈরী বারুদ খুব উঁচু মানের হবে।

ধূপ কাঠি

আমাদের দেশে এমন অনেক ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প অথবা গৃহ শিল্প রয়েছে যা মাত্র দু' তিনশো টাকা দিয়েই প্রথমে শুরু করা চলে। অথচ একটু চিন্তা করে না দেখার ফলেই চার'দিকে কেবল হতাশার ছবি। শেষে এমন একটা সময়ের সামনে এসে দাঁড়াই যখন না থাকে চাকরী করার বয়স অথবা ব্যবসায় খাটার ম'ত মনবল। অবশ্য আগে থাকতেই যদি কেউ ভেবে বসেন যে ছোট খাট ব্যবসা করে দাঁড়াতে পারা যায় না তাদের ক্ষেত্রে কিছু বলার নেই। কারণ উভয় পক্ষের যুক্তির কথা বলতে গিয়ে কেবল তর্কের সৃষ্টি হবে। আমার কথা হ'ল প্রথমে ছোট-খাট ব্যবসাতে হাত ও মন বসিয়ে পরে তার থেকে অন্য কিছু করা চলতে পারে অথবা নিজের হাতে গড়া ঐ প্রতিষ্ঠানকেও ভবিষ্যতে বাড়াতে পারা যায়। সত্য কথা বলতে কি ব্যবসা এমনই জিনিষ কখন কিভাবে মানুষের হাতে পয়সা এনে দেবে তা কেউ আগে থাকতে সঠিকভাবে বলতে পারে না। তাছাড়া অল্প মূলধন নিয়ে ছোট-খাট ব্যবসা করলে একেবারে লোকসান খাবার ভয় থাকে না।

ধূপকাঠি তৈরী করে বিক্রী করা এমনই একটা ব্যবসা, যার জন্যে কোন রকম ঝুঁকি নিতে হয় না। মেসিন পত্র বলতে যা বোঝায় তারও কোন প্রয়োজন নেই। দরকার পড়েনা বিদ্যুৎ শক্তির অথবা জলের। কেবল বাজার থেকে কিছু কাঁচামাল কিনে এনে তার থেকে ফরমূলা ম'ত ধূপ তৈরী করতে পারলেই কাজ মিটে যাবে। ফরমূলার প্রসঙ্গে আসার আগে আরও কয়েকটি কথা পাঠকের জানা দরকার।

প্রথমেই বলেছি ধূপকাঠি তৈরী একেবারে গৃহে শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। কাজেই অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়েরা এই কাজ করতে পারে। ফলে দিনের সমস্ত সময়টা বিক্রীর জন্য ঘুরতে পারা যায়। রেলগাড়ীতে এর বাজার খুবই ভাল। একজন হকার সারা দিনে ২০-২৫ টাকার ম'ত ধূপ বিক্রী করে থাকে। তা ছাড়া সমস্ত মুদির দোকানেও ডজন দরে মাল দিতে পারা যাবে। নগদ টাকার বিক্রী। কাজেই সেই হিসেবে টাকা কোথাও আটকে থাকার সুযোগ নেই। বাজারে চাহিদাও যেমন রয়েছে তেমনি কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে ধূপের ব্যবসা চালাতে হবে। কারণ পশ্চিম বাংলার এটি এখন নিজস্ব ব্যবসা। মহীশূর শব্দটা এখন অভ্যাসের ম'ত লোকে বলে যায়। দেখা গেছে যে সমস্ত ধূপকাঠি মহীশূর বলে বাজারে বিক্রী হচ্ছে তার সবকটিই পশ্চিমবাংলাতেই তৈরী। আসল কথা, ধূপের কারখানা যতই বাড়ুক চাহিদা যে পরিমাণে রয়েছে তাতে কোন রকমেই লোকসান খাবার ভয় নেই।

ফরমুলা—১

কর্পূর	২৫০ গ্রাম
অগুরু	২৫০ গ্রাম
শ্বেতচন্দন গুঁড়ো	৪০০ গ্রাম
দেবদারু কাঠের গুঁড়ো	৭৫ গ্রাম
তেজপাতা	৪৫ গ্রাম
লোবান	১২৫ গ্রাম
বেনার মুল	২০০ গ্রাম
নাগর মুথা	৪৫ গ্রাম
ঘুঁটে গুঁড়ো	২ কেজি
গঁদের আঠা	৩০০ গ্রাম

কিভাবে তৈরী করতে হবে?

প্রথমে ঘুঁটেকে ভালভাবে গুঁড়িয়ে নিয়ে তারপর পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। এই কাজটি খুব ভালভাবে করা দরকার। এরপর ফরমুলায় দেওয়া গঁদ এক লিটার জলে ভিজিয়ে আগের তৈরী করা ঘুঁটে গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করে নিতে হবে। এরপর বাকী জিনিষগুলো ভালভাবে গুঁড়ো করে ও পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নেবার পর সব একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেই ধূপের মশলা তৈরী হয়ে যাবে। যদি দেখা যায় মণ্ড খুব গাঢ় হয়ে গেছে তবে আরও খানিকটা জল মেশান যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য রাখা দরকার যেন বেশী পাতলা না হয়ে যায়। এরপর ধূপ কাঠির এক ইঞ্চি বাদ দিয়ে ঐ মণ্ডে ডুবিয়ে দিয়ে শুকিয়ে নিলেই ধূপকাঠি তৈরী হয়ে যাবে। তেজপাতা খুব অল্প তাপে ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করতে পারা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বেশী ভাজা না হয় অথবা পুড়ে যায়। তাহলে ধূপের গন্ধ খারাপ হয়ে যাবে।

ধূপের সম্পর্কে আরও একটা কথা পাঠকের জানা উচিত। যে কাঠিতে ধূপের মশলা মাখান হয় তা সাধারণ কাঠি নয়। অবশ্য বাড়ীতে বাঁশের কাঠি তৈরী করে নিতে পারা যায় তবে কলকাতার বড় বাজারে মহীশূরের কাঠি বিক্রী হয়। সেটা কিনে নেওয়া সব থেকে ভাল। কারণ ধূপ জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাবে না। বাঁশের কাঠিতে সে দোষ থাকতে পারে।

ফরমুলা—২

কাঠ কয়লা (গুঁড়ো)	১ কেজি
কর্পূর	৪৫০ গ্রাম
সোরা	২৫ গ্রাম
লোবান	৫০০ গ্রাম
ক্যাসকেরিলা	২৫ গ্রাম
গঁদ	২০০ গ্রাম
অটো মাস্ক	২৮ সি. সি
চন্দনের তেল	১৫ সি. সি

তৈরী করার নিয়ম

ঠিক আগের ফরমুলায় যেভাবে ধূপ তৈরী করা হয়েছে এটির ক্ষেত্রেও একইভাবে তৈরী করতে হবে। প্রথমে গঁদের আঠা তৈরী করে নিয়ে তারপর বাকী জিনিষগুলো গুঁড়ো করে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ড করা দরকার। গন্ধদ্রব্য অবশ্য ঐ মণ্ডে মিশিয়ে নিতে পারা যায়। শেষে কাঠির ১ ইঞ্চি বাদ দিয়ে মণ্ড মাখিয়ে শুকিয়ে (রোদে নয়, কারণ গন্ধ কমে যাবে) নিলেই ধূপ তৈরী হয়ে যাবে।

ফেস্ ভ্যানিশিং ক্রীম

আমাকে সুন্দর দেখাক, সবার কাছে আমি আকর্ষণীয় হয়ে উঠি, এ ইচ্ছেটা প্রায় সবারই মনের গোপন কথা। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির নানা কৌশল আবিষ্কার করে আসছে। এর প্রমান আমরা পাই ইতিহাস থেকে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, দেখা যায় যে, সে যুগের মানুষও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কৌশল জানতেন। নিজেকে সুন্দর করে তোলার এই প্রবৃত্তিটা অবশ্য পুরুষের থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রবল। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নকল সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কৌশল অনেক পালটে গেছে। বিজ্ঞানের চরম আশীর্বাদে এখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। যত রকমের সৌন্দর্য-বর্ধক দ্রব্য আছে তার মধ্যে যেটি একেবারে সাধারণ থেকে বিরাট ধনী লোক পর্য্যন্ত মুখের লাবণ্য বৃদ্ধিতে ব্যবহার করে তা হলো "ফেস্ ভ্যানিশিং ক্রীম।"

সারা ভারতবর্ষে বহু নামকরা ছোট ও বড় কোম্পানী আছে। তাঁরা নানা ধরনের "ফেস্ ক্রীম" প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রী করছেন। তবুও যদি কেউ এটি তৈরী করেন তবে স্থানীয় এলাকায় অতি সহজে বিক্রী করে ধীরে ধীরে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। তবে একটি বিষয়ের প্রতি খুব ভাল ভাবে নজর রাখতে হবে। আজকের দিনে সাধারণ মানুষ জিনিষের গুণাগুণের দিকে নজর দেয় না। তাই বাইরের "গোর্‌জাস্‌নেসে" যেন কোন ত্রুটি না থাকে। প্লাষ্টিকের কল্যাণে সে অভাব মেটান খুব একটা বড় কথা নয়। খুব সামান্য দামে অতি সুন্দর প্লাষ্টিকের কৌটা পাওয়া যায়।

বাজারে চলতি যে সব "ফেস্ ক্রীম" পাওয়া যায় তার পরিমাণ ও কৌটার মাপটা নিয়ে সেই রকম মাপের কৌটা তৈরী করে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। তবে নামটা খুব ভাল দেখে দেওয়া দরকার। এরই ওপর নির্ভর করছে সম্পূর্ণ চাহিদা।

এবার আসা যাক এই ক্রীম তৈরী করতে কি কি জিনিষ লাগে? (১) ষ্টীয়ারিক এ্যাসিড (কস্মেটিক কোয়ালিটি), (২) পোটেসিয়াম্ হাইড্রো অক্সাইড, (৩) ডিসটিল্ড ওয়াটার, (৪) গ্লীসারিন, (৫) গন্ধ দ্রব্য—(ক) রোজ বা (খ) লিল্যাক্। আর লাগে সামান্য গোলাপ জল। এই ক'টি কাঁচামাল হলেই কাজ চলে যাবে। সবকটি কাঁচামাল কলকাতার চীনাবাজারে বা বাগ্রী মার্কেটে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে কোনটাই পেতে আমাদের অসুবিধা নেই।

একটা মাঝারি ঘর হলেই এ শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায়। মাত্র দু'জন লোক লাগে। সব থেকে বড় কথা এতে কোন বিদ্যুৎ শক্তির দরকার হয় না। শহরে, আধা শহরে, এমন কি গ্রাম অঞ্চলেও এ শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায়। মেশিন-পত্রের বিশেষ একটা দরকার হয় না। চারটি কি পাঁচটি বড় বড় এ্যালুমিনিয়াম ও কলাইয়ের গামলা ও হস্ত পরিচালিত মিকচার মেসিন একটি, আর লাগে টুকিটাকি কয়েকটি জিনিষপত্র। মেশিন ও কাঁচামাল সমেত এই শিল্পটি গড়ে তুলতে মাত্র দুই থেকে তিন হাজার টাকা লাগে। আগেও বলেছি, আবার বলছি, সুন্দর নাম ও বাইরের চাকচিক্য এর প্রধান মূলধন।

এটা তৈরী করা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এটুকু বলা চলে, এমন কিছু একটা শক্ত কাজ নয়। তবে একটি চার্জ নামাতে পুরো ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। কারণ এর প্রস্তুত প্রণালী দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমে ষ্টীয়ারিক এ্যাসিড, পোটেসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ও ডিস্টিল্ড ওয়াটার আগুনে চাপিয়ে একটা নরম "পেষ্টের" মত করে নিতে হবে। এইবার ঐ পেষ্ট নামিয়ে নিয়ে ভালভাবে ঢাকা দিয়ে একদিন রেখে দিতে হবে। পরে তাতে পরিমাণ ম'ত গ্লীসারিন দিয়ে মিক্শ্চার মেসিনের সাহায্যে তা ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই সময়ে একটু নজর রাখতে হবে যেন কোন রকম ময়লা না থাকে। কারণ ময়লা থাকলে ক্রীমে তা লেগে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ক্রীমের রং খারাপ হয়ে যাবে। সব শেষে মেশাতে হবে গন্ধ দ্রব্য। আমি দু'টি গন্ধ দ্রব্যের নাম উল্লেখ করেছি। (১) রোজেস্, (২) লিল্যাক। এখন যে ব্যক্তি এটি

তৈরী করবেন তাঁর পছন্দ ম'ত বা বাজারের চাহিদা বুঝে যে কোন ভাল গন্ধ দ্রব্য মিশিয়ে নিতে পারেন। যাঁরা অন্য কোন গন্ধ দ্রব্য মেশাবেন তাঁরা প্রথমে বা পরে গোলাপ জল একদম দেবেন না। কেবল ডিসটিল্ড ওয়াটার দিলেই হবে। কলকাতায় গন্ধ দ্রব্যের একটি মাত্র ভাল বাজার আছে, সেটা এজরা ষ্টীটে। সেখান থেকে দেখে শুনে কিনতে পারলে বেশ সস্তায় কিনতে পারা যায়।

এর লাভের দিকটাও খারাপ হয় না। সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে প্রায় অর্ধেকের বেশী লাভ থাকে। মোটামুটিভাবে বলা চলে এ ব্যবসার লাভটা অনেকটা নির্ভর করে কাঁচামাল কেনার ওপর। এক সঙ্গে যদি একটু বেশী করে মাল কেনা যায় তবে পড়তা বেশ ভালই থাকে।

ফরমুলা—প্রথম পর্য্যায়

ষ্টীয়ারিক এ্যাসিড্	১০০ গ্রাম
পোটেশিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড	৫ গ্রাম
ডিসটিল্ড ওয়াটার	৫০০ সি. সি

দ্বিতীয় পর্য্যায়

গ্লীসারিন	২৫ সি. সি
গন্ধ দ্রব্য	৫ সি. সি

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF FACE CREAM 10 kg /day.

A Non Recurring Expenditure **Rs. 2,500/-**

1. Land Covered own/Rental 100 sft.

2. *Machinery & Equipment* Rs. 25,00/-

(*a*)	S. S. Mixture Machine		Rs. 1500/-
(*b*)	Stirrer (S. S.)	(4)	Rs. 100/-
(*c*)	S. S. Pan	(1)	Rs. 500/-
(*d*)	Weighing scale	(1)	Rs. 200/-
(*e*)	Chemical Lab. (Small)		Rs. 200/-
			Rs. 2,500/-

B. Recurring Expenditure/P.M. Rs. 2,300/-

1. *Raw materials* Rs. 1,500/-

(a)	Stearic Acid	Rs. 600/-
(b)	Potasium Hydor-Oxide	Rs. 400/-
(c)	Glycerin	Rs. 300/-
(d)	Rose water	Rs. 150/-
(e)	Misc. Chemicals	Rs. 50/-
		Rs. 1,500/-

(f) Salaries and wages Rs. 730/-

Workers	(2)	Rs. 180/-
Sales man	(1)	Rs. 150/-
Rent & Taxes		Rs 100/-
Packing etc		Rs. 300/-
		Rs. 730/-

Total Recurring Expenditure Rs. 1,500/- + 730/- = 2,230/-
Say Rs. 2,300/-

C. Capital out lay

Non-recurring Expenditure + Recurring Expenditure for months.

Rs. 2500/- + 6900/-
=Rs. 9400/- say Rs. 9500/-

D. Tentative profit and loss account P. A.

By sale of 3600 kg. of Face cream @ Rs. 10/- per kg.	Recurring expenditure Rs. 27,600/- Depriciation on Machinery @ Rs. 15% P. A. (On Rs. 2504/-) Rs. 375/- Interest on Capital out lay @ 10% P. A. (on Rs. 9,500/-) Rs. 950/- Profit (Un-Taxed) Rs. 7075/-
Rs. 36,000/-	Rs. 36,000/-

তরল আলতা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এমন কতকগুলি ব্যবসা আছে যা তার একেবারে নিজস্ব জিনিষ। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে অন্য কোন প্রদেশে এর চল নেই বলে। আলতা ঐ রকম একটি জিনিষ যা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে ব্যবহার সীমাবদ্ধ। এই তিনটি প্রদেশের মেয়েরা পায়ের শ্রীবৃদ্ধিতে যেমন ব্যবহার করে তেমনি বিশেষ কয়েকটি সামাজিক শুভ কাজে ও পাল পার্বনে ব্যবহার করা হয়। আলতা ব্যবসা করতে গিয়ে অনেকে যেমন কোন মতে দুটি ডাল ভাতের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন আবার দুচারজন তেমনি এই ব্যবসায় লক্ষপতিও হয়ে গেছেন। আমার এই মন্তব্য শুনে অনেকে হয়তো খারাপ কিছুও ভাবতে আরম্ভ করেছেন। আমি কিন্তু যে কোন সময়ে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে পারি।

আল্‌তার ব্যবসাকে একেবারে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। যদি কেউ এই ব্যবসায় নামতে চান তবে ১৫০ টাকা হলেই ছোট্ট একটা কারখানা চালাতে পারেন। যদি আরও একটু ভালভাবে চালাতে চান তবে ২৫০ টাকা হলেই চলে যাবে। মাসিক উপার্জন নির্ভর করে যত বেশী উৎপাদন করা যাবে ও বাজারে বিক্রয় করা যাবে। তবে শীত, গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে বিক্রয় বেশী হয়। ঠিক দুর্গাপূজার আগে যে বাজারটা পাওয়া যায় সেটাকে অবশ্য বাদ দিয়েই ধরা হয়েছে। আজকাল বিশেষ করে বাংলাদেশে আধুনিক মহিলারা সহসা আল্‌তা পরতে চান না। যাঁদের গ্রীষ্মকালে পা ঘামে, আল্‌তার রং পায়ে লেগে ভাল ভাল শাড়ি খারাপ হয়ে যায়। আমি এখানে যে ফরমূলা দিচ্ছি, যিনি এটি তৈরী করবেন তিনি জোর দিয়ে বাজারে বলতে পারবেন যে—"আমার আল্‌তা পা ঘামলেও শাড়ীতে লাগবে না। কারণ এটা সম্পূর্ণ ওয়াটার প্রুফ্"। বাজারে যে সব আলতা বিক্রী হয় তাতে গঁদের আঠা মেশান থাকে। ফলে জল লাগলে বা পা ঘামলে আল্‌তায় মেশান রং সহজে উঠে যায়। অবশ্য গঁদের আঠা দিয়ে করলে দামটা একটু কম পড়ে। আমি অবশ্য দুটো ফরমূলাই এখানে দিয়ে দিচ্ছি। পাঠক ইচ্ছে করলে বা বাজারে মাল চালাতে পারলে প্রথমে যেটা তৈরী করতে দামে একটু কম পড়বে সেটাই চালিয়ে দেখতে পারেন।

১নং ফরমুলা

ডিউঅ্যাক্স্ শ্যালাক্	১০ গ্রাম
বোরাক্স্	৫ গ্রাম
বৃষ্টির জল	২০০ সি. সি.
ক্রোসিন্ স্কারলেট	৮ গ্রাম
রোডামিন	২ গ্রাম
জেরেনিয়ম রোজ	৫ ফোঁটা

কিভাবে আল্‌তা তৈরী করতে হবে ? প্রথমে বৃষ্টির জল বা কলের জল একটি বড় অ্যালিউমিনিয়ামের হাঁড়িতে বা কড়ায়ে দিয়ে উনানের আঁচে ভাল ভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। জল ফুটে যাবার পর বোরাক্স মেশাতে হবে। বোরাক্স যখন সম্পূর্ণ জলের সঙ্গে মিশে যাবে তখন ডিউঅ্যাক্স—শ্যালাক্ ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে হবে। এই সময় জলের রং সামান্য হোল্‌দেটে হয়ে যাবে। এবার আঁচ্ থেকে কড়াই নামিয়ে ক্রোসিন্ স্কারলেট রং ও রোডামিন রং একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটু নেড়ে নিলেই আল্‌তা হয়ে গেল। যখন আল্‌তা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন জেরেনিয়ম রোজ মেশাতে হবে। গরম অবস্থায় কোন জিনিষের মধ্যে যদি গন্ধ দ্রব্য মেশান যায় তবে গন্ধ উপে যায়। তাই ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মেশান উচিত। এই ভাবে আল্‌তা করলে রং হবে গাঢ় লাল। ফরমূলা একই রেখে কেবল রোডামিন রং ৫ গ্রাম ও ক্রোসিন স্করলেট রং ৫ গ্রাম মেশালে লালের বদলে সামান্য কালচে লাল হয়ে যাবে। এ রংটাও বাজারে চলতি রয়েছে। বোরাক্স থাকাতে বর্ষাকালে পায়ের বা হাতের হাজাতে লাগালে খুব ভাল উপকার পাওয়া যায়।

সস্তা দামের ২নং ফরমূলা

গঁদের আঠা	২ গ্রাম
ক্রোসিন স্কারলেট	১০ গ্রাম
কলের জল	২০০ সি.সি
ম্যাগ্নেশিয়া কার্বনেট	৫ গ্রাম
মেথিলেটেড স্পিরিট	২ সি. সি.
এসেন্স অফ রোজ	৪—৫ ফোঁটা

১। গঁদের আঠা ভালভাবে গুঁড়ো করে ২৪ ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন আবার দেখুন গঁদের গুঁড়ো জলের সঙ্গে মিশে গেছে কিনা। যদি না মিশে থাকে তবে ফের একটু জলনিন ও নাড়তে থাকুন। এই ভাবে আঠা প্রস্তুত করে নিন। এবার একটি অ্যালিউমিনিয়ামের অথবা এ্যানামেলের কড়াইতে ২০০ মি. লি. জলের সঙ্গে ১০ গ্রাম ক্রোসিন স্কারলেট রং গুলে উনানে চাপিয়ে দিন। একটু ফুটে গেলেই গঁদের আঠা সবটা একসঙ্গে ঢেলে দিন। এইভাবে ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত ফোটাতে হবে। কড়াই আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হবার পর ম্যাগ্নেশিয়া কার্বনেট ও এসেন্স অফ্ রোজ একত্রে মিশিয়ে কড়ায়ে ঢেলে দিয়ে ভালভাবে নেড়ে নিন। এখন ভালভাবে ঢাকা দিয়ে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। পরের দিন ঢাকা খুলে দেখতে পাবেন ম্যাগ-কার্ব তলায় থিতিয়ে রয়েছে। তখন খুব সাবধানে ওপরের আল্‌তা একটা আলাদা পাত্রে ঢেলে নিতে হবে। যদি পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে পারা যায় আরও ভাল হয়। শিশিতে বা বোতলে প্যাক্ করার আগে মেথিলেটেড স্পিরিট ২ সি. সি. মিশিয়ে দিতে হবে।

তরল আল্‌তা কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা শেখার পরেও কতকগুলি জিনিষ পাঠকের জানা উচিত। যেমন কাঁচামাল কোথায়, কতদামে ও কি ধরণের কিনতে হবে? আল্‌তার যেটি প্রধান, সেটি হচ্ছে রং। এখানে দু'টি রংয়ের কথা বলা হয়েছে। কলকাতায় Armenian Street-য়ে অনেকগুলি রংয়ের দোকান আছে। ওখানে নিজে গিয়ে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

ম্যাগ্নেশিয়া কার্বনেট—বাজারে দু'রকমের কোয়ালিটি চালু আছে। একটি লাইট, অপরটি হেভী। আল্‌তা তৈরী করতে আমাদের হেভী ম্যাগ্নেশিয়া কার্বনেট কিনতে হবে। ১নং ফরমূলায় বোরাক্স ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এ দুটির কাজ হ'ল হাজা ঘা ভাল করা। ম্যাগ-কার্ব কিন্তু কিছুতেই গরম অবস্থায় মেশান উচিত নয়। যদি মেশান হয় তবে আল্‌তার রং একেবারে খারাপ হয়ে যাবে। এই দু'টি কলকাতায় Bonfield Lane-য়ের যে কোন কেমিক্যালের দোকানে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

সেণ্ট ও শিশি—কলকাতায় এজরা ষ্ট্রীটে অনেকগুলি আতর ও সেণ্টের দোকান আছে। এর মধ্যে ঘোষ কোম্পানির দোকান খুব নামকরা এখান থেকেও নেওয়া চলতে পারে। শিশি চেপটা বা গোল ৪ আউন্স মাপের নিতে পারা যায়।

কুম্‌কুম্‌ বা বিন্দী

ভারতবর্ষে এমন একটি সময় ছিল যখন সব বয়সের মেয়েরা মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জন্য ঠিক কপালের মাঝখানে একটি ছোট্ট সিন্দুরের টিপ ধারণ করত। এই প্রথাটি প্রায় সমস্ত প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর কুম্‌কুমের ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় বিশেষ করে আধুনিক ও শিক্ষিতা মেয়েরা সিন্দুরের বদলে কুম্‌কুম ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। যতদিন যাচ্ছে এর জনপ্রিয়তা ততই বাড়ছে।

কুম্‌কুমের ব্যবসায় খুব বেশী একটা মূলধনের দরকার হয় না। প্রথমে ১০০ টাকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারা যায়। যদি আরও একটু ভালভাবে করার ইচ্ছে থাকে তবে ২০০ টাকা যথেষ্ট। তিন রকমের রং বাজারে খুব চালু। (১) লাল, (২) গোলাপি, (৩) ফিকে গোলাপি। এই তিনটি প্রধান রং ছাড়াও আরও অনেক প্রকার রং দ্বারা বিন্দী প্রস্তুত করা যায়। বাজারে যে রং চলবে তাই ব্যবহার করা উচিত। তিন থেকে চার কেজি জল ধরে এই রকম একটি এ্যানামেলের কড়াই বা হাঁড়ি হলেই চলবে। আবার গন্ধদ্রব্য মেশাবার সময় ঐ একই কথা। এসেন্স্‌ অফ্‌ রোজ, অটোমাস্ক এসেন্স অফ জেস্‌মিন প্রভৃতির যে কোন একটি ব্যবহার করিতে পারা যায়।

ফরমুলা :

গঁদের আঠা	২৫০ গ্রাম
ক্রোসিন স্কারলেট রং	৪ আউন্স
জল (কলের বা বৃষ্টির)	১ লিটার
বোরিক এ্যাসিড	২ আউন্স
গ্লিসারিণ	২ আউন্স
গন্ধদ্রব্য	২০ ফোঁটা

গঁদের আঠা প্রথমে ভালভাবে গুঁড়ো করে নিয়ে কুম্‌কুম্‌ তৈরী করার ছয় থেকে আট ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখতে হবে। গঁদ সম্পূর্ণরূপে ভিজে যাওয়ার পর একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে তার সাথে রং মেশাতে হবে। এবার ঐ রং মেশান আঠা একটি এ্যানামেলের হাঁড়ি অথবা কড়ায়ে চাপিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিঃ ধরে সিদ্ধ করতে হবে। এবার অন্য একটি কাঁচের পাত্রে বোরিক এ্যাসিড ও গ্লিসারিণ সামান্য গরম জলে গুলে

ফুটন্ত কড়ায়ে মিশিয়ে দিতে হবে। এই সময় মাঝে মাঝে কড়াই থেকে সামান্য পরিমাণে খুন্তির সাহায্যে তুলে ও একটু ঠাণ্ডা হলে হাতের আঙুলে লাগিয়ে দেখতে হবে যেন গড়িয়ে না পড়ে। এবার নামিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার মুখে পরিমাণ ম'ত গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে দিয়ে শিশিতে প্যাক করলেই বিন্দী বা কুম্‌কুম্‌ তৈরীর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

নেল পলিশ

নেল পলিশ এমন একটি ব্যবসা যা মাত্র একজন লোকে ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা নিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করতে পারেন। যদিও আজকাল বাজারে অনেক কোম্পানি নেল পলিশ বিক্রী করছেন তবুও এ ব্যবসা একটু চেষ্টা করলেই চালাতে পারা যায়। কারণ তৈরী করার মেহনত কম, আর লাভ অত্যন্ত বেশী। ফলে যে ব্যক্তি এটি উৎপাদন করছেন তিনি বাজারে বিক্রীর জন্য অনেক সময় দিতে পারছেন। কেজি দুই পরিমাণ জল ধরে এই রকম সাদা দু'টি কাচের বোতল হলেই উৎপাদনের কাজ মোটামুটি ভাবে চলে যায়।

অনেক রকম রংএর নেল পলিশ বাজারে চলে। তারমধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে ন্যাচার‍্যাল কালার আর নিম্ন মধ্যবিত্ত অ-বাঙালী পরিবারে ঘোর লাল বা ফিকে লাল রংএর চলন বেশী। ভারতবর্ষে প্রায় সকল প্রদেশের মেয়েরা নেল পলিশ ব্যবহার করেন। দেখা যায় যেটা কম দামী নেল পলিশ তার চাহিদা বাজারে সব সময় বেশী। অবশ্য একটু বড় দোকানে দামী নেল পলিশও চলে ভাল। দোকানদার ইচ্ছে করলে যে কোন নতুন কোম্পানিকে ভালভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে নেল পলিশের দামটা কম বা বেশী নির্ভর করে শিশি, লেবেল ও নোখে লাগাবার তুলির ওপর। তা না হলে ফরমূলা সবই এক। কেবল রংটা যা আলাদা হয়ে যায়।

নেল পলিশের প্রধান কাঁচামাল সেলোলাইড বা স্ক্র্যাপ্‌ ফিল্ম। সেলো-লাইড দিয়ে করতে গেলে দামটা একটু বেশী পড়ে যায়। আর স্ক্র্যাপ ফিল্ম দিয়ে করলে দামটা একটু কম পড়ে। সেলোলাইড ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করার একটা নিয়ম আছে। যদি আগুনে ধরলে সেলোলাইড্‌ দপ

করে জলে ওঠে তবেই সেই সেলোলাইড দিয়ে কাজ হবে, তা নাহলে বুঝতে হলে সেলোলাইড খারাপ। যদি স্ক্র্যাপ ফিল্ম দিয়ে তৈরী করা হয় তবে একটি বড় এ্যানামেলের হাঁড়িতে সামান্য কাপড় কাচা সোডা দিয়ে ঐ স্ক্র্যাপ ফিল্মকে জলের সঙ্গে ফুটিয়ে নিয়ে কাল দাগগুলি তুলে ফেলতে হবে। নতুবা নেল পলিশের রং খারাপ হয়ে যাবে। আগুনে ফোটাবার সময় খুব খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোন আগুন না ধরে যায়।

ফরমূলা :—

সেলোলাইড অথবা স্ক্র্যাপ ফিল্ম	...	৪ × ২ = ৮ গ্রাম
এ্যাসিটোন ...	..	২৫ × ২ = ৫০ সি. সি.
এ্যমিল এ্যাসেটেট অথবা ব্রুটাইল এ্যাসেটেট	...	২৫ × ২ = ৫০ সি. সি
স্কারলেট রং ...	...	সামান্য।

তৈরী করার পদ্ধতি

প্রথমে সেলোলাইড বা স্ক্র্যাপ ফিল্মকে খুব ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে। এবার একটি বোতলে রং বাদ দিয়ে ফরমূলায় যা লেখা আছে সবগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে খুব ভালভাবে নাড়তে হবে। এখন দেখতে হবে সেলোলাইড বা স্ক্র্যাপ ফিল্মের টুকরোগুলো সব গলে গেছে কিনা। যদি না গলে থাকে তবে ঐভাবে নাড়িয়ে গলিয়ে ফেলতে হবে। এবার মেশাতে হবে রং। যদি গাঢ় লাল করতে হয় তবে বেশী পরিমাণ রং মেশাতে হবে। আর যদি ন্যাচার্যাল কালার করতে হয় তবে ফরমূলায় যে ভাগ দেওয়া আছে ঐ ভাগেতে একটা কাঠিতে যেটুকু রং লাগে ঐ পরিমাণ রং লাগিয়ে নেল পলিশে কেবল "টাচ্" করাতে হবে। তা হলেই পরে ন্যাচার্যাল কালারে দাঁড়িয়ে যাবে। যদি রং একটু কম মনে হয়, অবশ্য নখে লাগালেই বুঝতে পারা যাবে তবে আর সামান্য রং মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এখন ছোট ছোট শিশিতে পরিমাণ ম'ত ঢেলে বাজারে বিক্রয় করা যেতে পারে।

শ্যাম্পো

চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জন্য যেমন তেল ব্যবহার করা হয়, তেমনি মাথা পরিষ্কার করার জন্য ও মরামাস বা চুল ওঠা বন্ধ করার জন্য মাঝে মাঝে শ্যাম্পো ব্যবহার করা উচিত। বর্ত্তমানে শতকরা হিসাবে প্রায় ৭৫ জন মেয়ে ও পুরুষ শ্যাম্পো ব্যবহার করেন। তবে শীতকালের থেকে গ্রীষ্মকালে এর ব্যবহার একটু বেশী হয়। আজকাল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে চুলে শ্যাম্পো করা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়েছে। টাটা সমেত অনেক ছোট বড় কোম্পানি শ্যাম্পো তৈরী করেছেন।

এটি তৈরী করার জন্য জায়গা ও পরিশ্রম খুবই সামান্য লাগে। যদি নিজেই সবকিছু দেখাশুনা করা যায় তবে যথেষ্ট লাভও থাকে। তাই শ্যাম্পো তৈরী অল্প মূলধনের লাভজনক কুটীর শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে। সুন্দর গন্ধ ও ভালভাবে বোতলে প্যাক্ করে বাজারে ছাড়তে পারলে খুব ভাল দামে বিক্রী করতে পারা যায়। যদি প্রথম দিকে হাজার চারেক টাকা এই ব্যবসায় লাগাতে পারা যায় তবে মাসে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রায় পাঁচশো টাকা পর্য্যন্ত লাভ করা যেতে পারে। শ্যাম্পোকে বেশী দিন রাখতে হলে ও ট্র্যান্স্পেরেণ্ট করতে হলে ওয়াটার বাথে তৈরী করা সব থেকে ভাল। যে পাত্রে এটি তৈরী করা হবে তা এনামেলের বা কলাই-করা বাসনে হলে ভাল হয়। যদি আরও ভাল করে করা যায়, তবে স্টেন্লেস্ স্টীলের পাত্র সব থেকে ভাল। যদি ওয়াটার বাথে না করা হয় তবে শ্যাম্পোর সাবান পুড়ে যেতে পারে ও রং ঠিকমত নাও দাঁড়াতে পারে।

ফরমুলা :—

নারিকেল তেল	৫০০ গ্রাম
কষ্টিক পটাস	১৩০ গ্রাম
পটাসিয়াম কার্বনেট	১৫ গ্রাম
গ্লিসারিণ	১২৫ সি. সি.
ডিষ্টিল্ড ওয়াটার	৩০০০ সি. সি.
টার্পোনিল	৫০ সি. সি.
ল্যাভিণ্ডার	৫ সি. সি.
অ্যাল্কোহল্	১২০ সি. সি.

ফরমুলায় যে রকম ভাগ দেওয়া আছে সেই অনুসারে প্রথমে নারিকেল তেল, কষ্টিক পটাস ও পটাসিয়াম কার্বনেট ওজন করে বিভিন্ন পাত্রে রেখে দিতে হবে। এখন দু'টি কাচের বা এ্যানামেলের পাত্রে ১৩০ গ্রাম কষ্টিক পটাস ও ২,০০০ সি. সি. ডিষ্টল্ড ওয়াটার মিশিয়ে একটি সলুশন্ করে রেখে দিতে হবে। আবার অন্য একটি পাত্রে ১৫ গ্রাম পটাসিয়াম কার্বনেট ১,৫০০ সি. সি. ডিষ্টিল্ড ওয়াটার মিশিয়ে সলুশন করে রেখে দিতে হবে।

এবার ওয়াটার বাথে নারিকেল তেল অল্প গরম করে কষ্টিক পটাস সলুশন্ মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে। এই সময় একটু লক্ষ্য নেওয়া দরকার যেন তেল ও কষ্টিক পটাস সম্পূর্ণ ভাবে মিশে যায়। এবার পটাসিয়াম কার্বনেট সলুশন ও গ্লিসারিণ ঢেলে দিয়ে ওয়াটার বাথের পাত্রটি একটি থালা বা ঐ জাতিয় কোন জিনিষের সাহায্যে বন্ধ করা দরকার। এই ভাবে কিছুক্ষণ সিদ্ধ হওয়ার পর ওয়াটার বাথ থেকে পাত্রটি নামাবার মুখে টার্পোনিল মিশিয়ে একটু নেড়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা করা উচিত। সাবান কখন ওয়াটার বাথ থেকে নামাতে হবে? ফরমুলায় যে ভাগ দেওয়া আছে (ল্যাভিণ্ডার ও অ্যাল্‌কোহল্) বাদ দিয়ে যেন সমস্ত মাল, ২,৫০০ সি, সি, হয়। যদি কেউ আন্দাজে এই মাপটি ঠিক করতে না পারেন তবে আগে থাকতে ওয়াটার বাথের পাত্রটিতে দাগ বা চিহ্ন দিয়ে রাখতে পারেন। তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না।

এবারের কাজটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বলা যেতে পারে। এখন অ্যাল্‌কোহল্ ও ল্যাভিণ্ডার সাবানে মিশ্রিত করে একটি কাচের পাত্রে ঢাকা দিয়ে ১৫ দিন রেখে দিতে হবে। ১৫ দিন বাদে দেখা যাবে শ্যাম্পোর উপরে গাঁজলা ভেসে রয়েছে। এবার ধীরে ধীরে ছেঁকে নিলে শ্যাম্পো তৈরী হয়ে যাবে। যদি দেখা যায় শ্যাম্পো ট্রান্সপেরেণ্ট হয়নি তবে আরও একটু অ্যাল্‌কোহল্ মেশান যেতে পারে। যদি ফের অ্যাল্‌কোহল্ মেশান হয় তবে আরও ৪-৫ দিন শ্যাম্পো ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। কারণ সামান্য যদি গাঁজলা ওঠে তবে তা ছেঁকে নেওয়া চলতে পারে। এখন শিশিতে বা ছোট সাইজের বোতলে প্যাক্ করে বাজারে বিক্রয় করা চলতে পারে।

ফেস্ পাউডার

এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র রসায়ন শিল্প আছে যেগুলি তৈরী করতে খুব একটা বেশী পরিশ্রম বা সময়ের প্রয়োজন হয় না। কিছু তৈরী করা বা বাজারে বিক্রী করা যে একটা বিরাট কাজ সেকথাও কিন্তু ঠিক নয়। ব্যবসা করতে গেলে সামান্য একটা মূলধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তারজন্য একটা বিরাট মূলধন নাহলে যে কিছু করা যায় না, একথা ঠিক নয়। আসল কথা আমরা জন্ম থেকে বাবা, দাদা ও কাকাদের চাকরি করতে দেখে আসছি। তারপর লেখাপড়া শিখে বাবা না হয় দাদা তাঁদের নিজেদের জায়গায় কোনমতে একটা চাকরিতে বসিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে অবসরগ্রহণ করছেন এই রকম ছকে বাঁধা জীবনে চলতে ও দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অথচ এই ভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবসা আজ বাঙালীর হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ফলে এমন একটা সময়ের মুখে এস দাঁড়িয়েছি যখন সবকিছু থাকা সত্বেও নিজে থেকে কিছু করার যে উৎসাহ তো ষোল আনাই হারিয়ে ফেলেছি।

আরও একটা দোষ আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে। যদি কাউকে ফরমূলা দিয়ে অল্প মূলধনে সহজ ব্যবসার কথা বলা হয়, তাহলে দেখা যায় সেই ব্যক্তি বাজার চলবে না বলে পেছিয়ে যান। আবার যদি কাউকে এমন ফরমূলা দেওয়া হয় যা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তখন মূলধনের অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়েন। অথচ এ কথাটা আমরা কেউ বুঝতে চেষ্টা করিনা, যে-প্রতিষ্ঠানে আর যা মাইনেতে চাকরি করতে যাই, যদি নিজে ছোটখাট কিছু তৈরী করা যায় তবে ২-৪ বছর বাদে মাইনে দিয়ে নিজেই লোককে চাকরি দিতে পারি। অবশ্য ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি দুটোই আছে। সময় আর পরিশ্রম যদি ঠিকমত দিতে পারা যায় তবে আজ না হয় কাল মাথা তুলে নিশ্চয় দাঁড়াতে পারা যাবে। যে ব্যবসার কথা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, খুব ছোট ব্যবসা। এই শিল্পে যেমন অনেক দিনের পুরান কোম্পানি বাজারে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তেমনি মাত্র দু-তিন বছর আগের অনেক ছোট ও নতুন কোম্পানি ভালভাবেই করে খাচ্ছেন।

আগেই বলেছি ফেস পাউডার তৈরী করা খুব সহজ। কোন মেসিন কিনতে হয় না, বিদ্যুৎ শক্তিও লাগে না। কেবল কয়েকটি জিনিষ বাজার থেকে কিনে এনে একটি বড় এ্যানামেলের গামলায় মিশিয়ে দিতে পারলেই ফেস

পাউডার তৈরী হয়ে যায়। তবে দু'টি জিনিষের প্রতি খুব ভালভাবে নজর রাখতে হবে। (১) গন্ধ, (২) বাইরের গোরজাস্‌নেস। টিনের কৌটায় ভাল রং দিয়ে পেন্ট করে তবেই বাজারে ছাড়তে হয়। আর যত মৃদু ও সুন্দর গন্ধ করতে পারা যায় ততই বাজারে চালাতে পারা যাবে। এখানে আমি দু'টি ফরমূলা দিচ্ছি। ১ নং টি গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করলে ঘামাচির পক্ষে উপকার হবে। ২নং টি সব সময়ে ব্যবহার করা চলবে। তবে আমাদের দেশে গরমকালে পাউডার বেশী চলে।

ফরমূলা—(১)

ফ্রেঞ্চ চক	১২৫ গ্রাম
ট্যাল্‌ক্ পাউডার	৬২ গ্রাম
জিঙ্ক অক্সাইড	১৩ গ্রাম
রাইস স্টার্চ পাউডার	২০০ গ্রাম
বোরিক পাউডার	৫০ গ্রাম
অয়েল অফ্ রোজ	১'৫ সি.সি.
স্পাইক ল্যাভিণ্ডার	১'৫ সি সি.

ফরমূলা—(২)

বিস্‌মাথ হোয়াইট	২৫০ গ্রাম
ফ্রেঞ্চ চক্	২৫০ গ্রাম
জেসমিন অয়েল	১'৫ সি.সি.
অটো মাস্ক	২০ ফোঁটা

তৈরী করার নিয়ম

প্রথমে একটি বড় গামলায় সমস্ত পাউডারগুলিকে ফরমূলায় যে ভাগ দেওয়া আছে সেইমত ওজন করে নিতে হবে। এবার গন্ধদ্রব্যগুলি এক একটি করে ঐ পাউডারের মিশ্রণে চারিদিকে ফোঁটা ফোঁটা করে মিশিয়ে দিতে হবে। সমস্ত গন্ধ দ্রব্য মিশান হয়ে গেলে পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে কম করে দু-বার ছেঁকে নিতে হবে। যদি সঙ্গে সঙ্গে কৌটায় প্যাক্ করা না হয় তবে ভালভাবে ঢাকা দিয়ে রাখা দরকার। তা নাহলে গন্ধ উপে গিয়ে পাউডার

খারাপ হয়ে যাবে। যখন পাউডার চালা হবে বা গন্ধদ্রব্য মেশান হবে তখন হাত ভালভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। তা নাহলে পাউডারে ময়লা লেগে যাবে। সব থেকে ভাল হয় যদি রবারের তৈরী "সার্জিক্যাল্ গ্লাভ্" হাতে পরে কাজ করা যায়। ঠিক এই ভাবেই ২নং ফরমুলা থেকে পাউডার তৈরী করতে হবে।

সাবান শিল্প

এবার বিভিন্ন প্রকারে সাবান তৈরী ও সেগুলির বাজার ও ফরমুলা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। (১) সেভিং সোপ বা দাড়ি কামাবার সাবান :—

চলতি বাজারে যে সমস্ত সাবান পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা গায়ে মাথার জন্য ও কাপড় কাচার জন্য ব্যবহার করি সেভিং সোপ, সেগুলির থেকে একটু অন্য ধরণের। দেখতে সাদা রং-এর, শক্ত, চক্‌চকে ও সুন্দর হবে। গোল চাকার আকারে অথবা লম্বা ষ্টিক্ও বাজারে চলে। তবে আজকাল অনেক কোম্পানি হাল্‌কা সবুজ রংএর ও টিউবে পেস্ট আকারে বিক্রী করছেন। এদের মধ্যে হিন্দুস্থান লিভার অন্যতম।

মোটামুটিভাবে সেভিং সোপের কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ল। কিন্তু আরও কতকগুলি গুণ আছে যা বিভিন্ন প্রকারের রসায়ন মিশিয়ে করা হয়। অন্য যে-কোন সাবানের থেকে সেভিং সোপে ফেনা বেশী পরিমাণে হবে। সেই সঙ্গে দেখতে হবে ফেনা গাঢ় ও গালে লাগালে অনেকক্ষণ ধরে ফেনা থাকে। আর ক্ষয় যেন কম হয়। এই শিল্প, কুটীর শিল্পের মধ্যে পড়ে। একজন বা দু-জন মাত্র লোক রাখলেই উৎপাদন করা যায়। বাজারে যদি সুনাম অর্জন করবার ও শিল্পে প্রতিষ্ঠা পাবার ইচ্ছে থাকে তবে সাবানে সুন্দর গন্ধ করা একটি প্রধান মূলধন।

এবার দেখা যাক কি কি কাঁচামাল দরকার হয় এই সাবান তৈরী করতে। (১) কোকোনাট্ অয়েল, (২) কাস্টর অয়েল, (৩) ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড, (৪) কষ্টিক পটাস্, (৫) কষ্টিক সোডা, (৬) চর্ব্বি, (৭) গন্ধদ্রব্য।

কোকোনাট অয়েল—পরিষ্কার ও রিফাইণ্ড্ কোয়ালিটি হওয়া দরকার। যদি তেলে কোন রকম ময়লা বা গন্ধ থাকে, তবে সাবানে খারাপ গন্ধ হয় ও

রং ঠিকমত দাঁড়ায় না। এর প্রধান গুণ সাবানকে ধপ্‌ধপে সাদা করে ও ফেনা তৈরী করতে সাহায্য করে। তবে যদি এর সঙ্গে চর্ব্বি মেশান না হয় তবে ফেনা গাঢ় হয় না ও বেশীক্ষণ থাকে না। আরও একটি অসুবিধা হয়, সেটি হচ্ছে কেবল কোকোনাট অয়েলে প্রস্তুত সাবান অল্প কিছুদিন বাদেই শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। ফলে ওজন অনেক কমে যায়। তাই ভাল সাবানে কোকোনাট অয়েলের সঙ্গে সামান্য চর্ব্বি মেশান উচিৎ।

কাস্টর অয়েল—এই তেলও পরিষ্কার আর রিফাইণ্ড কোয়ালিটি হওয়া দরকার। এই তেল সাবানে দুটি প্রধান কাজ করে। (১) সাবান তাড়াতাড়ি হয়, (২) কোকোনাট অয়েলের সঙ্গে মিশে সাবানে ফেনা বেশী হয়। যাঁরা নরম সাবান তৈরী করেন তাঁদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাস্টর অয়েল ব্যবহার করেন। আর শক্ত সাবানে গ্লেজ আনার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সাবানকে নরম রাখা এর আরও একটি প্রধান কাজ।

ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড—সাবানকে চক্‌চকে করা বা ফেনার উপর একটা সিল্কের মত গ্লেজ বার করা এর কাজ। তবে এটি cosmetic quality হবে। ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড থাকার জন্য সাবানের ফেনা গাঢ় হয়। তাই সেভিং সোপে এটি মিশ্রিত করা একান্ত দরকার। কলকাতার কেমিক্যাল মার্কেটে যে কোন দোকানে পাওয়া যায়।

কস্টিক পটাস—একে চলতি কথায় খারও বলা হয়। কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক পটাস ছাড়া কোন সাবান তৈরী করা যায় না। টাটা, আই, সি, আই সমেত অনেক বড় বড় কোম্পানী কষ্টিক তৈরী করছেন। দু-রকমের কষ্টিক বাজারে পাওয়া যায় একটি ডেলা এবং অপরটি মাছের আঁশের আকারে।

চর্ব্বি—বাজারে নানা প্রকারের চর্ব্বি বিক্রয় হয়। এর মধ্যে মোষের চর্ব্বি সব থেকে ভাল। বিশেষ করে সেভিং সোপ তৈরী করতে। দেখতে সাদা। এর থেকে তৈরী সাবানও সাদা হয়। সাবানকে শক্ত করা ও সাবানের পরিষ্কার করার শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া এর প্রধান কাজ। একটু ভাল কোয়ালিটির সাবান তৈরী করতে গেলে চর্ব্বি একান্ত ভাবে দরকার।

গন্ধদ্রব্য—আগেই বলেছি গায়ে মাখা ও সেভিং সোপের এটি একটি প্রধান মূলধন। যদি সবানের গন্ধ একবার বাজার ধরে নেয় তবে সে কারখানা খুব

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য। তাই লক্ষ্য রাখা দরকার সাবানের গন্ধ যেন ভাল হয়। আমি দুটি compound দিয়ে দিচ্ছি। সাবানে ব্যবহার করার আগে পাঠক একবার দেখে নিতে পারলে ভাল হয়।

গন্ধদ্রব্যের ফরমুলা (১)

লেভেণ্ডার অয়েল	৪ ফোঁটা
অয়েল অফ্ সিট্রোনিলা	২ "
রোজ জিরেনিয়ম	৪ "
সাণ্ডেলউড অয়েল	২০ "

ফরমুলা (২)

মাস্ক ফ্লাওয়ার—এস্	৪ ড্রাম
জেরেনিয়াম অয়েল	৮ "
অয়েল অফ বর্গমেট	৮ "

ফরমুলার যে ভাগ দেওয়া হ'ল সবগুলি একসঙ্গে একটি শিশিতে মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়লেই কম্পাউণ্ড তৈরী হয়ে যাবে। প্রয়োজন বুঝে যে পরিমাণ লাগবে সেই পরিমাণ দেওয়া উচিৎ।

এবার সেভিং সোপ তৈরী করার জন্য বিভিন্ন ভাগের তিনটি ফরমূলা দেওয়া হচ্ছে। এতে সাবানের দামটাও কম বেশী হবে। অবস্থা বুঝে ও বাজারের চাহিদা অনুসারে যে কোন একটি ফরমূলা ঠিক করে নিয়ে তৈরী করা যেতে পারে।

১নং—ফরমুলা

কোকোনাট অয়েল	৫০ X ২ = ১০০ গ্রাম
কাস্টর অয়েল	১০ X ২ = ২০ "
চর্বি	১৪০ X ২ = ২৮০ "
ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড	২০ X ২ = ৪০ "
কষ্টিক পটাস	২৫ X ২ = ৫০ "
অথবা	
কষ্টিক সোডা	২২ X ২ = ৪৪ "
গন্ধদ্রব্য পরিমাণ অনুসারে	

২নং—ফরমুলা

কোকোনাট অয়েল	১৮০×২=৩৬০ গ্রাম
কাস্টর অয়েল	১০×২=২০ ”
পামমেটিক এ্যাসিড	২×২= ৪ ”
চর্ব্বি	১০০×২=২০০ ”
ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড	২০×২= ৪০ ”
কষ্টিক পটাস	২৫×২= ৫০ ”
অথবা	
কষ্টিক সোডা	২০×২= ৪০ ”

গন্ধ দ্রব্য পরিমাণ অনুসারে।

৩নং—ফরমুলা

কোকোনাট অয়েল	৪০=২=৮০ গ্রাম
চর্ব্বি	২০×২=৪০ ”
ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড	৪½×২= ৯ ”
কষ্টিক পটাস	৯×২=১৮ ”
অথবা	
কষ্টিক সোডা	৯×২=১৮ ”

গন্ধ দ্রব্য পরিমাণ অনুসারে।

সেভিং সোপ তৈরী করার পদ্ধতি

এটিও তৈরী করার সময় ওয়াটার বাথে করতে হবে। প্রথমে একটি কাচের বা এনামেলের পাত্রে কষ্টিক পটাস বা কষ্টিক সোডা (পামমেটিক এ্যাসিড) নিয়ে তাতে ২৫০ মি. লি. জলে সলুশন্ তৈরী করে রেখে দিতে হবে। এবার ওয়াটার বাথের পাত্রে ফরমূলার মাপ অনুসারে কোকোনাট অয়েল, কাস্টর অয়েল, চর্ব্বি ও ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড একসঙ্গে মিশিয়ে সম্পূর্ণভাবে গলিয়ে নিতে হবে। এখন ধীরে ধীরে কষ্টিক সলুশন্ গলিত তেলের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। এই সময় খুন্তির সাহায্যে ভালভাবে নাড়তে হয়। যদি দেখা যায় সাবান খুব তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে আসছে, তা'হলে সামান্য জল মেশান দরকার। তবে বেশী জল যেন মেশান না হয়।

এবার জানতে হবে কখন সাবান ওয়াটার বাথ থেকে নামাতে হবে। মানে সাবান সিদ্ধ হয়েছে কিনা তা জানা দরকার। যদি রং মেশানের ইচ্ছে থাকে তো এই সময় মেশান যেতে পারে। এবার ওয়াটার বাথ থেকে খুব সামান্য পরিমাণে সাবান আঙুলে লাগিয়ে যদি দেখা যায় সাবান আঙুলে লেগে আছে তবে জানতে হবে সাবান আরও সিদ্ধ হবে। যখন দেখা যাবে আঙুল থেকে সাবান পড়ে যাচ্ছে বুঝতে হবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার পাত্রটি ওয়াটার বাথ থেকে নামিয়ে ফেলে ঠাণ্ডা হওয়ার মুখে গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে ছাঁচে ঢেলে দিলেই সেভিং সোপ তৈরী হয়ে যাবে।

এখন কাপড় কাচার জন্য বিভিন্ন ভাগের চারটি ফরমুলা দেওয়া হচ্ছে! এতে সাবানের দাম যেমন কম বা বেশী হবে সেইসঙ্গে কোয়ালিটির পার্থক্য হবে।

১নং ফরমুলা

কাস্টর অয়েল	১০×২= ২০ গ্রাম
গ্রাউণ্ড নাট অয়েল	৪০×২= ৮০ ,,
মহুয়া অয়েল	১৫০×২=৩০০ ,,
কষ্টিক সোডা	৩২×২= ৬৪ ,,

২নং ফরমুলা

কোকোনাট অয়েল	১০×৫ – ৫০ গ্রাম
গ্রাউণ্ড নাট অয়েল	১২×৫= ৬০ ,,
মহুয়া অয়েল	৭৫×৫=৩৭৫ ,,
রোজিন	৩×৫= ১৫ ,,
কষ্টিক সোডা	১৭×৫= ৮৫ ,,

৩নং ফরমুলা

কাস্টর অয়েল	...	৫×৫=২৫ গ্রাম
গ্রাউণ্ড নাট অয়েল	...	২০×৫=১০০ ,,
চর্বি	...	৭৫×৫=৩৭৫ ,,
কষ্টিক সোডা	...	১৭×৫=৮৫ ,,

৪নং ফরমুলা

কোকোনাট অয়েল	··	৩৫ গ্রাম
মহুয়া অয়েল	···	৩০ গ্রাম
রোজিন	···	১৫ গ্রাম
চর্ব্বি	···	২০ গ্রাম
কষ্টিক সোডা	···	১৮ গ্রাম

যে সমস্ত ফরমূলাগুলি দেওয়া হ'ল সেগুলির দ্বারা বিভিন্ন রকমের কাপড় কাচা সাবান তৈরী করা যায়। ছাঁচ যে আকারের হবে সাবানও সেই আকারের হবে। মোটামুটি ভাবে বাজারে গোল সাবান, বার সাবান, ও সানলাইটের আকারে সাবান চলে বেশী। ৩নং ফরমূলায় যে সাবান তৈরী হবে তা কোয়ালিটির দিক দিয়ে খুব ভাল হবে।

রোজ যদি ১০০ কেজি করে সাবান তৈরী করা যায় তবে মোট তিন চার জন লোক হলেই চলে যাবে। আর জিনিষ পত্রের মধ্যে লাগে দুটি বড় দেখে লোহার কড়াই, আটটি খুন্তি, ২০০টি কাঠের ছাঁচ, হাতা ৪টি, কষ্টিক গোলার ড্রাম দুটি, অটম্যাটিক ষ্ট্যাম্পিং মেসিন, অটম্যাটিক কাটিং মেসিন ও প্যাক্ করার কাগজ প্রভৃতি। যদি উৎপাদনের হারটা বজায় রাখা যায় তবে প্রতি ৫০ কেজিতে সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে ১০ টাকা লাভ থাকেই অর্থাৎ ১০০ কেজিতে মাসে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত লাভ করা যাবেই।

কাপড় কাচা সাবান তৈরী করা কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। যেভাবে সেভিং সোপ বা লিকুয়িড সোপ তৈরী করা হয় ঠিক ঐ ভাবেই তৈরী করতে হবে। তবে সেভিং সোপ করার সময় ওয়াটার বাথের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু কাপড় কাচা সাবান তৈরী করার সময় উনানে সোজাসুজি কড়াই বসিয়ে দিয়ে কাজ করতে হবে। তবে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায়। তাহলেই সাবান ওজনে কম হয়ে যাবে ও রং ঠিক হবে না।

একটু বড় করে একটা স্কীম দিয়ে দিচ্ছি। যাঁরা রাষ্ট্রিয়করণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করে এই কারখানা করতে চান তাঁদের অনেক সুবিধা হবে।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF WASHING SOAP—3,000 kg. P. M.

A. Non Recurring Expenditure. **Rs. 2,500/-**

1. *Land* 2, Cottah own/Rental
2. Covered Area 2, ,, ,, ,,

2, *Machinery & Equipment* Rs, 2,500/-

(a)	Iron Pan	2	Rs. 200/-
(b)	Stirrer	8	Rs. 100/-
(c)	Wooden Die		Rs. 700/-
(d)	Weighing scale	(1)	Rs. 350/-
(e)	Automatic Stamping Machine	(1)	Rs. 650/-
(f)	Cutting Machine	(1)	Rs. 500/-
			Rs. 2,500/-

B. Recurring Expenditure/ P.M. **Rs. 2,300/-**

(a) *Raw materials* Rs. 1,500/-

Castor Oil
Rosin
Coconut Oil
Fat
Mahua Oil
Caustic Soda

(b) Salaries and wages Rs. 730/

Workers	(2)	Rs. 180/-
Sales man	(1)	Rs. 150/-
Rent & Taxes		Rs. 100/-
Packing etc.		Rs. 300/-
		Rs. 730/-

Total Rs. 1,500/-+730/-
=Rs. 2,230/-
Say Rs. 2,300/-

C, Capital out lay

Non-recurring Expenditure + Recurring Expenditure for 3 months.

Rs. 2,500/- + Rs. 6,900/-
= Rs. 9,400/- say Rs. 9,500/-

5, Tentative Profit and Loss A/c. P.A.

By sale of 36,000 kg. washing Soap @ Rs. 1.00/k.g,	Recurring Expenditure Rs. 27,600/-
	Depreciation on machinery @ 15% P.A. (on Rs. 2,500/-) Rs. 375/
	Interest on capital out lay @ 10% P. A (on Rs, 9,500/-) Rs, 950/-
	Profit (un-taxed) Rs, 7,075/-
Rs. 36,000/-	Rs, 36,000/-

লিকুয়িড্ সোপ

চলতি বাজারে আমরা বহু রকমের সাবান দেখতে পাই, তার মধ্যে দুটি ভাগ প্রধান। (১) কাপড় কাচা ও (২) গায়ে মাখা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই দুইটি ভাগের মধ্যে নানা রকমের সাবান আছে। আর এই সব সাবান বহু নামকরা বড় বড় কোম্পানি তৈরী করেছেন। কিন্তু এমন কতগুলো জিনিষ আছে যেখানে এই সব সাবান ব্যবহার করা চলে না। যদিও বা ব্যবহার করা হয় তবে দামের দিক থেকে পড়তায় আসে না। ধরা যাক হাত ধোয়া বা মটর গাড়ির বডি ধোয়ার ব্যাপারে কি সাবান ব্যবহার করা উচিত। আমরা সবাই জানি মটর গাড়ির বডিতে রং লাগান থাকে। সময় সময় মটর গাড়ির বডি সাবান দিয়ে ধোয়ার প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্য ধুতেই হয়। কিন্তু যদি বাজারে চলতি যে কোন কাপড় কাচা বা গায়ে মাখা সাবান দিয়ে ধোয়া যায় তবে তাড়াতাড়ি গাড়ির রং নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক হাত ধোয়ার ব্যাপারেও ঐ একই কথা। যে কোন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া চলতে পারে, কিন্তু যেখানে হাজার লোক এক সঙ্গে হাত ধোবেন সেখানে ঐ রকম সাবান কিনে খরচে পোষাবে না। এই দুটি দিক বিবেচনা করে আজকাল অনেকেই লিকুয়িড সোপ ব্যবহার করছেন। অবশ্য আরও অনেক ব্যবহার আছে। এখানে দুটি প্রধান ও ব্যাপক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

কেন এই রকম হয়? আর সাধারণ সাবান থেকে এই লিকুয়িড্ সোপের তফাৎ টা কোথায়? সাধারণ চলতি বাজারে সাবানে খার জাতিয় জিনিষ বেশী থাকে ফলে রং নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু লিকুয়িড সোপ সম্পূর্ণ "নিউট্রাল" করে তৈরী করা হয়। ফলে হাত ফাটে না রংও নষ্ট হয় না। অথচ ময়লা ভাল ভাবে পরিস্কার হয়ে যায়। তাই এই সাবান ব্যবহারে অনেক স্থবিধা ও দামও বেশ কমের দিকে। এই সাবান ৪ লিটার টিনে তে বিক্রী হয়। প্রত্যেকটি হোটেলে রেস্তোরাঁতে, ক্যান্টিনে ও বড় বড় মিল-ফ্যাক্টারিতে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়। কলকাতার একটি বড় প্রতিষ্ঠানের কথা জানি। এঁরা সারা বছরে একবার টেণ্ডার আহ্বান করেন। তাতে প্রায় পনের হাজার লিটারের মত লিকুয়িড্ সোপ সাপ্লাই করার কথা লেখা থাকে। প্রতিষ্ঠানটির

নাম কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সমিতি। এদের অফিসে গিয়ে কি দামে আগে কিনেছেন ও পরিমানটা জেনে নিতে পারেন। ভারতীয় রেলওয়েতে রয়েছে প্রচুর চাহিদা। সারা বছর ধরে বিভিন্ন জোনে টেণ্ডার কল হয়ে থাকে। সামান্য জিনিষ, অথচ চাহিদার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সত্যই অন্য কোন ভাল কাটতি জিনিষের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

এককাঠা মাত্র জায়গা লাগে, একটু টালির বা টিনের শেড্ দিয়ে নিতে পারলে ভাল। আর চাই দু'টি লোক। শেড়ের কাছাকাছি কল বা পাতকুয়া থাকলে আরও ভাল হয়। মোটামুটি এই পরিবেশ হলেই ছোট্ট একটা সাবানের কারখানা খোলা চলতে পারে। জিনিষপত্রের মধ্যে লাগবে দু'টি বড় ঢালাই লোহার কড়াই, দুটি বড় খুন্তি ও গোটা আটেক ১০০ লিটার ক্যাপাসিটি খালি লোহার ড্রাম। এই খালি ড্রাম গুলোতে সাবান তৈরী হয়ে গেলে রাখতে পারা যাবে। তবে ড্রামগুলো যেন ঢাকনা সমেত কেনা হয়। কারণ খোলা থাকলে সাবানের সঙ্গে মিশে যে জলটা থাকবে তা বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাবে। এতে সাবান মোটা হবে যাবে ও পরিমাণে অনেক কম হবে।

কি কি কাঁচামাল হলে এটি তৈরী করা যাবে? (১) পাম অয়েল, অথবা (বাদাম তেল) (২) কাস্টর অয়েল, (৩) লিন্সীড অয়েল, (৪) রোজিন, (৫) কষ্টিক সোডা। একটা ছোট্ট চার্জ কি ভাবে করতে হবে তার প্রসেস্টা জানিয়ে দিচ্ছি।

পাম অয়েল অথবা বাদাম তেল	=২০×২=৪০ গ্রাম
কাস্টর অয়েল	=৩৫×২=৭০ গ্রাম
লিন্সীড্ অয়েল	=৩৫×২=৭০ গ্রাম
রোজিন	=১০×২=২০ গ্রাম
	২০০
কষ্টিক সোডা	=১২×২=২৪ গ্রাম
সাবান	=১ ভাগ=৩০০ মিঃ লি.
জল	=১ ভাগ=৩০০ মি. লি.

এখানে লেখা হয়েছে সাবান ১ ভাগ অর্থাৎ ৩০০ মি. লি। বাদাম তেল, কাস্টর অয়েল, লিন্সীড্ অয়েল, রোজিন, মিলিয়ে ২০০ গ্রাম হয়েছে। (কষ্টিক

বাদ গেছে) কিন্তু হিসেব করার সময় ধরতে হবে দেড়া। তাই ২০০ গ্রাম হয়েছে বলে, ৩০০ মি. লি. ধরতে হ'ল। এটা সব সময় সাবানের ক্ষেত্রে ধরতে হবে।

প্রথমে ফরমুলা অনুসারে একটা কাচের পাত্রে বা কলায়ের পাত্রে ১০০ মি. লি. জলের সঙ্গে কষ্টিক সোডা গুলে নিতে হবে। এই সময় একটু নাড়তে হবে, তা না হলে কষ্টিক জমে যাবে। এই কষ্টিক গোলা জল আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে। এবার উনানে কড়াই চাপিয়ে দিয়ে বাদাম তেল (পাম অয়েল), কাস্টর অয়েল, ও লিন্‌সীড অয়েল একসঙ্গে মিশিয়ে কড়ায়ে ঢেলে দিতে হবে। যখন তেল বেশ গরম হয়ে যাবে তখন আঁচ কমিয়ে বা কড়াই নামিয়ে রেখে ঐ গরম তেলকে ঠাণ্ডা করতে হবে। তেল যদি বেশী গরম থাকে তাতে যদি কষ্টিক গোলা জল ঢালা যায় তবে যে কোন সময় মারাত্মক অ্যাক্‌সিডেন্ট ঘ:ট যেতে পারে। তাই এই সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ঐ গরম তেলে এবার কষ্টিক সোডার জল সবটা ধীরে ধীরে মেশাতে হবে। ঐ মিশ্রণ যখন ভালভাবে ফুটে যাবে তখন ৪০০ মি: লি: (মিলি লিটার) পরিমাণ জল দিতে হবে ও নাড়তে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ ফোটার পর সবশেষে মেশাতে হবে রোজিন। রোজিন দেওয়ার অর্থ হ'ল যদি বেশী কষ্টিক থাকে তবে সেটা রোজিনে খেয়ে নেবে। অর্থাৎ নিউট্রাল করে দেবে। মনে রাখতে হবে রোজিন দেওয়ার পর আর জল মেশান চলবে না।

আমি ফরমুলাতে পাম অয়েল অথবা কাস্টার অয়েল ব্যবহার করতে বলেছি। যদি পাম অয়েল ব্যবহার করা যায় তবে বেশী পরিমানে জল খাওয়াতে পারা যাবে। সেটা নির্ভর করছে বাজারে যেরকম দর পাওয়া যাবে তার ওপর।

নারিকেল ছোবড়ার শিল্প

দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি জায়গায় এই শিল্প ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করলেও, পশ্চিমবাংলায় এই শিল্পের বড় অভাব। অথচ ঠিকমত যদি চালাতে পারা যায় তবে বেশ কয়েক হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হয়। পশ্চিম বাংলায় নারিকেলের উৎপাদন কম বলে মাত্র হাজার দুই লোকের কর্ম সংস্থানের কথা বলা হ'ল, কিন্তু কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরে তিন লক্ষেরও বেশী লোক একটি মাত্র শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত রয়েছেন। হাল্কা কাজ বলে

শতকরা হিসেবে প্রায় ৪৫ জন স্ত্রীলোক এই কারখানায় কাজ করতে পারেন।

খুব সহজ কাজ, আর সামান্য মূলধন বিনিয়োগ করে এই শিল্পটি আরম্ভ করা যেতে পারে। ছোবড়া থেকে দড়ি, পাপোশ, গদি, মাতুর, কার্পেট, বুরুশ প্রভৃতি তৈরী করা যায়। এরমধ্যে দড়ি, গদি ও বুরুশ তৈরী করার জন্য কোন মেসিনের সাহায্য না পেলেও ক্ষতি হয় না। তবে কার্পেট, মাতুর ও পাপোশ তৈরী করার জন্য হস্ত চালিত বা বিদ্যুৎ পরিচালিত মেসিনের দরকার হয়। এই সমস্ত শিল্পজাত জিনিষগুলি ভারত থেকে বিদেশে বহুদিন যাবৎ রপ্তানি হয়ে আসছে। যদি নিত্য নতুন ডিজাইন বার করে তৈরী করা যায় তবে বিদেশের বাজারে আরও চাহিদার সৃষ্টি করা যেতে পারে। মাত্র দুটি দেশ আমাদের প্রতিযোগী। (১) ফিলিপিন, (২) সিংহল। যদি মেসিনে ভালভাবে "ফিনিশ" করা যায় তবে বেশ কয়েক কোটি টাকা বছরে আয় হয়।

পশ্চিম বাংলায় একটি মাত্র জায়গার নাম করা যেতে পারে, যেখানে এই শিল্প গড়ে তোলা সব থেকে সুবিধাজনক। প্রথম অবস্থায় নারিকেল ছোবড়াকে নরম করার জন্য লবন জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর শুকিয়ে নিয়ে মোটা লাঠির সাহায্যে পিটিয়ে ময়লা বা অন্যান্য বাজে জিনিষ বার করে দিতে হয়। এখানে ছোবড়ার সাইজ অনুসারে আলাদা করে তার থেকে বিভিন্ন জিনিষ উৎপাদন করা হয়। যদি দীঘা বা তার আশেপাশে অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে এই শিল্পটি গড়া যায় তবে প্রথম দিকের কাজগুলি একরকম বিনা পয়সায় হয়ে যায়। কারণ একদিকে সমুদ্রের নোনা জল কাজে লাগান যাবে আবার অন্য দিকে ঐ অঞ্চলে কোন শিল্প না থাকায় কৃষি কাজে নিযুক্ত কৃষক পরিবার বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন।

নারিকেল ছোবড়া থেকে শিল্প তৈরী করার বিষয় আলোচনা হ'ল, কিন্তু আরও কয়েকটি শিল্প নারিকেল মালা থেকে তৈরী করা যায়, (১) বিভিন্ন ধরনের খেলনা, (২) পুতুল, (৩) বোতাম, (৪) হুকা প্রভৃতির নাম করা যায়। এই শিল্প জাত দ্রব্যগুলিরও বিদেশে ভাল বাজার আছে। নারিকেলে পরিণত হওয়ার আগেই আমরা যেভাবে হাজার হাজার ডাব নষ্ট করে ফেলি তা দিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের কাজের সুযোগ পশ্চিমবাংলায় করা যেতে পারত। যদি সরকার মনে করেন যে এই শিল্প ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করবে, তবে ছোট ছোট ইউনিট গঠন করে সমবায় ভিত্তিতে প্রথমদিকে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত এক একটি ইউনিটকে ঋণ দিয়ে দেখতে পারেন।

ফোল্ডিং বেবি মসকীটো—নেট

আমরা যাকে চলতি কথায় বেবি-নেট বলি তারই পুরো নাম ফোল্ডিং বেবি মসকীটো নেট। এটি ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের মধ্যে পড়ে। ছোট ছোট কিছু ইউনিট পশ্চিমবাংলা সমেত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে রয়েছে। তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষেও রয়েছে এর চাহিদা। যে হারে শিশুর জন্ম হচ্ছে, মনে হয় চাহিদা আরও বেড়ে যাবে। তবে একথাও ঠিক নয় যে প্রত্যেকটি পরিবার তাঁদের শিশুর জন্য বেবি-নেট কিনে আনেন। গড়ে দেখা যায় প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬ জন পিতামাতা তাঁদের শিশু সন্তানের জন্য বেবি-নেট ব্যবহার করেন। স্থানীয় কাপড়ের দোকানে বা কলকাতার হোলসেল মার্কেটে যদি ঠিকভাবে চালাতে পারা যায় তবে মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত লাভ করা যেতে পারে। জিনিবের কোয়ালিটি অনুসারে ২·৫০ পঃ থেকে ৬·৫০ পঃ দরে বাজারে বিক্রী হয়।

আগেই বলা হয়েছে এটি ক্ষুদ্র শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে, তাই সমস্ত মেসিন পত্র সমেত প্রথম দিকে খরচ পড়ে ২,৫০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকার মধ্যে। এবার কি কি মেসিন দরকার, তার তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। (১) সেলাই কল দুটি, (২) ড্রিল মেসিন একটি (বিদ্যুৎ পরিচালিত), (৩) এয়ার—ব্লোয়ার মেসিন একটি (হস্ত চালিত), (৪) কাঠের ভ্যাট তিনটি, আর কাঁচা মালের মধ্যে লাগবে (১) লোহার তার, (২) মশারীর—নেট, (৩) গ্যাল্‌ভ্যানাইজ তার, (৪) টিনের পাত, (৫) রং। এখানে দু রকমের তারের কথা বলা হয়েছে। যাঁরা প্রথমে এই কারখানা করবেন তাঁরা দু রকমের বেবি নেট তৈরী করতে পারবেন। একটাতে লোহার তার দিয়ে ও কমদামী নেট ব্যবহার করে, অপরটিতে ভাল টাটার নেট ও গ্যাল্‌ভ্যানাইজ তার ব্যবহার করে, ফলে বাজারে বিক্রীটা বেশী হবে।

কাঠা দুই জায়গা পেলেই এই শিল্প গড়তে পারা যায়। তবে সব থেকে ভাল হয় যদি তিনটি খালি ঘর পাওয়া যায়। কারণ জল লাগলে নেটের রং খারাপ হয়ে যাবে ও তারে মরিচা ধরে যাবে। রোজ যদি ৫০০ পিস্ করে উৎপাদন করা হয় তবে ৬ জন লোকের দরকার হবে। আর রোজ ৫০০ পিস্ করে উৎপাদন করা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। যদি পাইকারি দরে বিক্রয় করা হয় তবে প্রতি পিসে ৫০ পঃ লাভ রেখে দিয়েও কারবার করা যায়।

যদি কেউ বিদ্যুতের সুবিধা না পান তবে ড্রিল মেশিন হস্ত চালিত কিনে কাজ চালাতে পারেন।

যদি রোজ ৫০০ পিস্ করে উৎপাদন করা যায় তবে মাসে কাঁচা মাল ও চালানোর খরচ নিয়ে চার হাজার টাকা লাগবে। অবশ্য বাজারে মাল বিক্রী হতে আরম্ভ হলেই আবার ঐ টাকা ঘুরে আসবে। কাজেই একটা মাস একটু কষ্ট করে চালাতে পারলে ঐ টাকাই রোল করার পর লাভের মুখ দেখতে পারা যাবে। যদি কেউ একা করতে সাহস না পান তবে দু-জন বা তিন-জনে মিলে এর একটি ছোট্ট কারখানা করতে পারেন।

তৈরী করার বিষয়ে কিছু বলতে গেলে বলা চলে অনেকটা সাইকেল রিক্সার হুড়ের ম'ত। ঠিক ঐ পদ্ধতিতে তৈরী করতে হবে। বাজারে তিনটি রং খুব চলে, (১) লাল, (২) গোলাপি ও (৩) সবুজ রং। বাজারের সাইজটা দেখে নিয়ে তৈরী করার একদিন আগে তিনটি জ্যাটে তিন রকমের রং জলে গুলে নেটকে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার শুকিয়ে নিয়ে মেশিনে সাইজ অনুসারে সেলাই করে নিতে হবে। এই কাজটিকে প্রথম পর্য্যায়ের কাজ বলা যায়। এবার লোহার তারকে সাইজ অনুসারে কেটে নিয়ে দুদিকে সামান্য পিটিয়ে নিয়ে ড্রিলের সাহায্যে ফুটো করে নিতে হবে। শেষকালে দু-পাশে মোটা টিনের পাতে ঐ তার রিবিট করে দিলেই ফ্রেম হয়ে যাবে। এখন ফ্রেমের সঙ্গে নেট সেট করে দিলেই বেবী নেট তৈরীর কাজ শেষ। যদি কোন অসুবিধা মনে হয় তবে বাজার থেকে কিনে একটি বেবি নেটকে ভাল ভাবে দেখা যায় তবে আর কোন অসুবিধা হবে না।

ত্রিপুরা ও বাঁশের শিল্প

উন্নততর প্রণালীতে এবং সঠিক পরিকল্পনায় যদি কুটীর শিল্পের বিস্তার না ঘটে তবে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করা যাবে না। একথা যে কতখানি সত্য তা জাপানের গৃহ-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। তাই দেশে যখন সম্পদের অভাব নেই, তখন সেই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কেন আমরাও শিল্পে উন্নত হব না! সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে বাঁশ গাছ। ঐ বাঁশকে ক্ষুদ্র বা কুটীর শিল্পের প্রধান কাঁচামাল

হিসেবে নিয়ে প্রায় এক হাজার রকমের জিনিষ তৈরী করা যেতে পারে। কেবল ত্রিপুরা নয়, সারা পশ্চিম বাংলায় নানা জাতের বাঁশের বাগান রয়েছে। ঐ বাগানগুলিতে আরও ভালভাবে চাষ করে এখানেও কয়েকটি স্থায়ী শিল্প গড়া যেতে পারে। এখানে বাঁশ থেকে উৎপন্ন কয়েকটি শিল্প ও সেগুলি তৈরী করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) খেলনা, খাঁচা, ঝুড়ি, ট্রে, টেবিল বাতি, মাছুর প্রভৃতি —

যে সমস্ত জিনিষগুলির নাম উল্লেখ করা হ'ল, দেখা যায় বাঁশকে নির্দিষ্ট ভাবে চার পাঁচটি আকার দিতে পারলেই জিনিষগুলি তৈরী করা খুবই সহজ হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে বহু কারিগর আছেন তাঁরা ঐ ধরণের জিনিষ বাঁশ থেকে তৈরী করছেন। কিন্তু কোন মেসিনের সাহায্য না পাওয়ার ফলে উৎপাদন হচ্ছে খুবই অল্প। ফলে জিনিষের দাম পড়ে যাচ্ছে বেশী। তাই ধীরে ধীরে এই শিল্প উঠে যাচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি মেসিনের সাহায্যে বাঁশকে কয়েকটি নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায়, তবে উৎপাদনও হয় প্রচুর সেই সঙ্গে দামটাও অনেক কমে যায়।

মোটামুটিভাবে দেখা যায় এই ধরণের মেসিন হলেই ভাল হয়। (১) ছোট সাইজের বিদ্যুৎ চালিত করাত। এই দিয়ে বাঁশকে কেটে সুবিধা অনুসারে নানা সাইজের চওড়া পাত বার করা যাবে। (২) অটম্যাটিক রাউণ্ড ব্লেড। এই মেসিনের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের পাতলা কাঠি পাওয়া যাবে ও সমান ভাবে গোল করা যাবে। (৩) ইলেকট্রিক ড্রিল মেসিন। এর কাজ ছিদ্র করা। (৪) ইলেকট্রিক-স্প্রে পেন্টিং—মেসিন। এর দ্বারা বাঁশ থেকে উৎপন্ন জিনিষগুলি সুন্দরভাবে রং করা যাবে। এই সব মেসিনগুলির দাম পড়বে প্রায় আট থেকে দশ হাজার টাকা। প্রথম দিকে একটু বেশী খরচ পড়ে যায় ঠিক কথা, কিন্তু যদি উৎপাদন ভাল হয় তবে স্বদেশ ছাড়াও বিদেশের ভাল বাজার পাওয়া যায়।

(২) মাছ ধরবার ছিপ :—

সব থেকে সহজ শিল্প এটি। মেসিনের তো কোন দরকারই হয় না আর তৈরী করার জন্যও বিশেষ একটা কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। প্রথমে বিভিন্ন সাইজের উপযুক্ত বাঁশ বাছাই করে নিতে হয়। অবশ্য সোজা বাঁশ হলেই ভাল হয়। এরপর কষ্টিক সলুশনে ভিজিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। এবার যদি দেখা যায় যে সামান্য বাঁকা আছে তবে আগুনের ওপর রেখে অল্প

চাপ দিয়ে সোজা করে নেওয়া দরকার। শেষকালে সরিষার তেল মাখিয়ে প্রায় ছয় মাস রৌদ্রে রেখে দিতে হবে। তেল শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে তেল মাখিয়ে দিতে হবে। এই তেল ও রৌদ্রে রাখার ফলে ছিপ শক্ত হবে, সহজে ভেঙে যাবে না। এবার ভালভাবে বার্নিশ লাগিয়ে বাজারে বিক্রী করা চলবে। ভারতবর্ষ ছাড়া বিদেশেও এর ভাল বাজার আছে।

(৩) বাঁশের হ্যাণ্ডব্যাগ, বোতাম, কাপড় রাখার ব্যাকেট, জানালা দরজার পর্দা প্রভৃতি।

আগে যে মেসিনগুলির কথা বলা হয়েছে সেই সব মেসিনগুলি লাগবেই, আরও একটি মেসিনের দরকার, সেটা বিদ্যুৎচালিত পাঞ্চিং মেসিন। বোতাম তৈরী করার সময় এটির প্রয়োজন। প্রথমে বিদ্যুৎচালিত করাতে দেড় থেকে দু ইঞ্চি সাইজ করে বাঁশকে কেটে নিতে হয়। পরে অটম্যাটিক পাঞ্চিং মেসিনে বিভিন্ন সাইজের বোতামের আকারে গোল করে কেটে নেওয়া হয়। এবার ড্রিল মেসিনের সাহায্যে বোতামে ছিদ্র করা হয়। শেষকালে রং করে দোকানে বিক্রী করা। রং করার জন্য যে খরচ তা একটু কমাতে পারা যায়। কারখানার মালিক এই কাজটি না করে ঐ এলাকার মধ্যে গৃহস্থের বাড়িতে যদি দিয়ে আসেন তবে বৃদ্ধেরা ও স্কুলের ছেলে মেয়েরা অবসর সময়ে বাড়িতে বসেই রং করে দিতে পারে। ফলে একদিকে সস্তাও হয় আবার অবসর সময়ে কাজ করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা কিছু অর্থ উপার্জন করে সংসারে সাহায্য করতে পারে। আশাকরি বাকী জিনিষগুলির বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন হবে না। কারণ এ বিষয়ে দক্ষ কারিগর মাথা খাটিয়ে যত সুন্দর ডিজাইন করতে পারবেন বাজারে চাহিদা সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। এগুলি ছাড়াও বাঁশের তৈরী অধুনিক আসবাব পত্র অনেকে ব্যবহার করছেন। বিশেষ করে সুন্দর ডিজাইনের টেবিল ও বসার চেয়ার আজকাল বহু অবস্থাপন্ন ঘরের বৈঠকখানায় দেখা যায়।

কাঁচ ও তার শিল্প

কাঁচ এমন একটি জিনিষ যা দিয়ে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প থেকে আরম্ভ করে একেবারে বিরাট শিল্প পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ লাভজনক ভাবে চালাতে পারা যায়। এ ধারণাটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই নেই। কাঁচ তৈরি করে,

তার থেকে কিছু করা মানে বিরাট কিছু একটা ব্যাপার। এর প্রধান কারণ আজ অবধি দেশে ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রসার ঘটেনি বলে।

যদিও পণ্ডিতেরা বলেন মিশর সর্বপ্রথম কাঁচ তৈরী করে, কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের মাটিতে এমন সব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যার ওপর অনুমান করে এখন বলা চলতে পারে মিশর দেশের আগেই ভারতে কাঁচ তৈরী হোত।

আজ প্রায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তাঁদের চাহিদা অনুসারে কাঁচ তৈরী করছেন ও তা দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। যদিও বর্তমানে ভারতবর্ষে অনেকগুলি বৃহৎ কারখানা গড়ে উঠেছে, তবুও বিদেশে প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্ট মানের কাঁচের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারিনি। যার জন্য ভারতে সেই আজ আর পাঁচজনের থেকে অনেক পিছনে। একথা ভাবতেও দুঃখ হয়। তবু আশার কথা বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে কয়েকটি গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, যাহার প্রধান লক্ষ্য উন্নত মানের কাঁচ তৈরী করা। কাঁচ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এমনভাবে মিশে গেছে যে একে বাদ দিয়ে একদিনও চলা যায় না।

যদিও সাধারণ ভাবে আমরা বুঝি কাঁচ মানে এক প্রকার স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলে বা কোন কঠিন পদার্থের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে সহজেই ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আমরা দৈনন্দিন কাঁচ দ্বারা তৈরী যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করি তা কোন রকম রসায়ন মিশ্রিত করে করা হয়। এ তথ্য বৈজ্ঞানিকরা অনেক দিন ধরে গবেষণা করে তবেই আবিষ্কার করেছেন। কাঁচের প্রধান কাঁচামাল বালি। এর সঙ্গে চুণ ও সোডা মিশিয়ে প্রায় ১১০০° তাপে যদি গলিয়ে ফেলা যায় তবেই পাওয়া যায় কাঁচ। এই প্রকার কাঁচ হোল সাধারণ স্তরের। বাজারে যে সমস্ত শিশি, বোতল, লণ্ঠনের চিম্‌নি প্রভৃতি পাওয়া যায় বা অল্প দামের মধ্যে সচারচর আমরা যে দ্রব্যগুলি ব্যবহার করি সেগুলো এই ধরণের কাঁচ দিয়ে তৈরী করা হয়। এদের সাধারণ ধরণের কাঁচ বলা হয়। তার কারণ এই কাঁচ বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। আবার যে সমস্ত কাঁচ দ্রব্য বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ব্যবহার করা হয় তাতে কিন্তু সোডা ব্যবহার করা হয় না। তার বদলে পটাস ব্যবহার করা হয়। পটাস থাকার ফলে গালাবার সময় তাপ বেশী লাগে ও এই কাঁচ দ্বারা তৈরী জিনিষ অধিক তাপও সহ্য করতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ, বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী করা হয়।

তাই ম্যাগনেসিয়াম, সিসা, বেরিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতব-অক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

সম্পূর্ণ কুটীর শিল্পের আকারে যদি এই শিল্প গড়া যায় তবে প্রথম দিকে প্রায় আট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ হবে। তবে এর থেকেও আরও কম টাকায় করা যেতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে ফারনিস্ পাকা হবে না। যাঁদের ক্ষমতা আছে পাকা ফারনিস্ তাঁরা করে নিতে পারেন। আর লাগে বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ। এই ছাঁচ আবার দু' রকমের হয়। (১) কাঠের, (২) লোহার। কাঠের ছাঁচ চলে অল্প দিন। কিন্তু লোহার ছাঁচ চলে অনেক দিন। তবে খরচ একটু বেশী পড়ে যায়। আরও একটা কথা এখানে বলার আছে যে, কাঠের ছাঁচের জিনিষ সব থেকে সুন্দর হয়। আর লাগে চার—পাঁচ মিটার লম্বা লোহার নল। যার একদিক সরু ও অপর দিক মোটা। বাজারে চলতি নাম "ফুকো নল"।

কাঠা চারেক জমি পেলেই এই শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায়। তবে সমস্ত জায়গাটায় শেড দিয়ে ভালভাবে ঘিরতে হবে। যদি শেড দিয়ে জল পড়ে তবে ফারনিস্ ফেটে যেতে পারে। সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। আর লোক লাগে জনা তিনেক। বিদ্যুৎ শক্তি বা জলের বিশেষ একটা প্রয়োজন হয় না। তাই এই শিল্প শহরের বাইরে করা চলতে পারে। সেই সঙ্গে দেখতে হবে হবে যেন পরিবহন ব্যবস্থা ভাল থাকে।

গলিত কাচকে বিভিন্ন প্রণালীর সাহায্যে গঠন করা হয়। এর মধ্যে চার রকম প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত। (১) ফুঁকো প্রথা, (২) টানা প্রথা, (৩) রোলিং প্রথা ও (৪) চাপ প্রথা। বাজারে যে সমস্ত নীল, সবুজ, লাল ও বর্ণহীন সাদা কাচের ছোট বা বড় শিশি বোতল পাওয়া যায় তা ঐ ১নং প্রণালীর সাহায্যে অতি সহজেই তৈরী করা যায়। ১নং প্রণালীর সাহায্যে তৈরী করার একটি বিশেষ সুবিধা যে এতে কোন মেসিনের দরকার হয় না। তবে গড়ে উৎপাদন একটু কম হয়।

দেশে অনেক ঔষধ কোম্পানি আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সারা বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে অর্ডার সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়া চলতি বাজারে একটা বিক্রী তো আছেই। তাই এই ব্যবসায় সহজে খুব একটা লোকসান খাবার ভয় থাকে না।

এই শিল্পে বালি একটি প্রধান কাঁচামাল। তাই কি ধরনের বালি ও কোথাকার বালি হলে ভাল হয় এ প্রশ্ন সহজেই আসতে পারে। পশ্চিমবাংলায় সকলেই প্রায় দামোদরের বালি ব্যবহার করেন। তবে মগরা বা পাণ্ডুয়ার বালিও ব্যবহার করা চলতে পারে। দামোদরের বালিতে মাটির ভাগ কম থাকে বলে ধুয়ে ফেলে মাটি বা জলে সহজে দ্রবণীয় খনিজ পদার্থ সব বার করে দেওয়া হয়। ঐ বালি শুষ্ক হওয়ার পর চুম্বকের সাহায্যে যতটা সম্ভব লৌহ কণা অপসারিত করার হয়। মগরা বা পাণ্ডুয়ার বালিতে মাটি বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ বেশী থাকায় ঐগুলি অপসারণ করার জন্য খরচ একটু বেড়ে যায়। অবশ্য যাঁদের দামোদর থেকে বালি আনার অসুবিধা আছে তাঁরা মগরা বা পাণ্ডুয়া থেকে বালি নিয়ে কাজ চালাতে পারেন। বালির দানার বিষয়েও কিছু বলার আছে। একেবারে মিহি বালি হলে কাজের খুব একটা সুবিধা হবে না। ফার্নিসে বা ভাঁটিতে ঐ মিহি বালি ব্যবহার করলে গ্যাসের টানে সহজে উড়ে গিয়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ৩০ থেকে ৬০ মেশের চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে কাজ করা সব থেকে ভাল।

বর্ণহীন সাদা কাঁচ তৈয়ারী করার ফরমূলা—(১)

বালি ...	১০৬ কেজি
চূণাপাথর ...	৫৩ কেজি
সোডা কার্বনেট ...	৩১ কেজি
সোডা সালফেট ...	১০ কেজি
	২০০ কেজি

ফিকে নীল কাঁচ তৈয়ারী করার ফরমূলা—(২)

বালি	১৪৬·০ কেজি
চূণা পাথর	১৭·৪ কেজি
পটাশ কার্বনেট ...	২৯·০ কেজি
কোবাল্ট অক্সাইড ...	০·৬ কেজি
কপার অক্সাইড ...	৭·০ কেজি
	২০০·০ কেজি

গাঢ় সবুজ কাঁচ তৈয়ারী করার ফরমূলা—(৩)

বালি	৬০ কেজি
চুণা পাথর	১৫ কেজি
পটাশ কার্বনেট	১০ কেজি
সোডা কার্বনেট	১২ কেজি
কপার অক্সাইড	২ কেজি
ক্রোমিক অক্সাইড	১ কেজি
	১০০ কেজি

যে সমস্ত রসায়নগুলি ব্যবহার করা হবে সেগুলি যেন সি. পি. কোয়ালিটি হয়। প্রথমে ফরমূলা অনুসারে সবগুলি একটি জায়গায় ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই মিশ্রণের ওপর নির্ভর করে কাঁচের গুণাগুণ। তাই অনেকে মিশ্রণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। এবার ক্রুসিবলে মিশ্রণ ঢেলে সম্পূর্ণ রূপে গলিয়ে নিতে হবে।

এখন যে ধরণের শিশি বা বোতল তৈরী করা হবে সেই মাপের লোহার বা কাঠের ছাঁচ ঠিক করে রেখে দিতে হবে। লোহার নলে অর্থাৎ (ফুঁকো নলে) মোটা দিকটিতে বেশী করে গলিত কাঁচ লাগিয়ে নিয়ে নলের অপর প্রান্তে অর্থাৎ সরু দিক থেকে ফুঁ দিলে ফাঁপা লম্বা বেলুনের ম'ত হবে। ঠিক এই সময়েই ঐ বেলুনটি ছাঁচে ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে একটু জোরে ফুঁ দিলেই নরম কাঁচ আরও ফুলে গিয়ে ঐ ছাঁচের আকার ধারণ করবে। দু' ভাগে বিভক্ত ছাঁচ থেকে দ্রব্যটি বার করে আবার আগুনে অল্প সময়ের জন্য গরম করে নিতে হবে। ও ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করতে হবে। এই প্রথাকে বলে মৃদুকরণ। তা না হলে কাঁচের পাত্রটি ছাঁচ থেকে খোলা মাত্র হঠাৎ ঠাণ্ডা পেয়ে সহজেই ফেটে যায়, না হয় ভেঙে যায়। ঐ ভাবে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করার ফলে নষ্ট কম হয়।

শেষকালে ফুঁকো নল খুলে নিয়ে মুখটি কোন পাথরের সাহায্যে ঘষে সমান করার পরই বাজারে ছাড়া চলতে পারে।

মেঘালয় রাজ্যের বনজ সম্পদ ও তার শিল্প

খুব বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র কয়েক মাস আগে আসামের মানচিত্র থেকে কয়েকটি পার্বত্য জেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বহুদিনের আগের দাবি স্বতন্ত্র রাজ্য চাই। শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিলেন তাঁদের দাবি। জন্ম নিল নতুন এক রাজ্য, নাম তার "মেঘালয় রাজ্য"। কেবল রাজ্য পেলেই হোল না, সেই সঙ্গে চাই তার অর্থ নৈতিক উন্নতি। তা না হলে সে পেছিয়ে থাকবে আর অন্য সব রাজ্যগুলো থেকে। ফলে এমন একটা সময় আসবে যখন কোন রকম কাজের সুযোগ না পেয়ে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেখানকার মানুষ নিজেদের জড়িয়ে ফেলবেন। এ ভাবনা যতখানি দেশের লোকের তেমনি আগে থাকতে ভবিষ্যতের সমস্যার দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে তার সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যসহ উভয় সরকারের। তাই বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে এবং সর্বোপরি দেশের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সত্যিকারের একটা শিল্প যাতে "মেঘালয় রাজ্যে" গড়া যেতে পারে তাই নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা করা হচ্ছে।

জন্ম তারিখের বিচারে "মেঘালয় রাজ্য" একেবারে সদ্যজাত শিশু হোলেও বনজ সম্পদের বিচারে তার গৌরব বহুদিনের। সে এক প্রকৃতির অফুরন্ত দান। প্রকৃতির সেই চরম দানকে যদি না আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজে লাগাতে পারি তবে কি করে আমরা সমৃদ্ধশালী করবো আমাদের দেশকে? মেঘালয়ের বিভিন্ন পাহাড়ে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচুতে পাওয়া যায় G. Cecidodaphne গাছ। আরও "দু" রকমের গাছ আছে যথা—(১) G, Glanduliferum ও (২) G, Tamala অবশ্য শেষের দুটির তুলনায় প্রথম জাতের গাছটি জন্মে প্রচুর। আর এই সব গাছ থেকেই পাব "সিনামন লিফ্ অয়েল।" বাংলায় যাকে বলা হয় "ডাল চিনির তেল" সংস্কৃততে বলে "তমাল পত্র"। বৃহৎ শিল্প আকারে যখন এই তেল তৈরী করা হবে তখন কিন্তু কেবল পাতার ওপর নির্ভর করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে চাই ঐ গাছের ডাল ও কুঁড়ি। হিসেব করে বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন পাতার মধ্যে তেলের ভাগ থাকে শতকরা হিসেবে ১'৫ থেকে ১'৭ ভাগ পর্য্যন্ত। যদিও এটা পরিমাণে খুব অল্পই তবু ডালপালা ও কুঁড়ি মেশানোর জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অর্থাৎ লাভজনকভাবে উৎপাদন করা চলতে পারে।

এবার দেখা যাক কিসে ব্যবহার হয় ঐ তেল? (১) ঔষধ শিল্পে, (২) গন্ধদ্রব্য তৈরীর কারখানায়, (৩) নিজে সুগন্ধি হিসাবে। প্রতি বছর সিংহল থেকে আমাদের দেশে আমদানি হয়ে আসে প্রায় কুড়ি হাজার কেজি করে। তবে ভারতেও অল্প কিছু "সিনামন লিফ্ অয়েলের" উৎপাদন হয়। মাইশোর রাজ্যের কানাড়া সহ দু-তিনটে জেলাতে। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় খুব একটা বেশী কিছু নয়। হিসেব করে দেখা গেছে মাইশোর রাজ্যের বছরে গড় উৎপাদন মোট তিন হাজার সাতশো পাউণ্ড বা তার থেকে সামান্য কিছু বেশী। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ছড়িয়ে রয়েছে এর বাজার। তাই এই শিল্প কেবল দেশের চাহিদা মেটাবে না, আনবে আমাদের জন্য অমূল্য বিদেশী মুদ্রা। রোজ পনের কেজির ম'ত তেল উৎপাদন করতে গেলে ডালপালা ও পাতা যোগাড় করতে হবে এক হাজার টন করে। লাভ থাকবে অবশ্য বাজার বুঝে। খুব কম করে ধরলেও এক কেজি তেলের দাম সত্তর টাকার নিচে হবে না।

পাতা ও ডাল থেকে তেল তৈরী করতে গেলে আমার মতে ষ্টীম ডিষ্টিলেশনের সাহায্য নেওয়াই ভাল। কারণ তাতে তেলের মান হবে উন্নত ধরনের। তাই হিসেব করে দেখা যায় মোটামুটিভাবে এইসব মেসিনের সাহায্য লাগবেই। (১) পাতা কাটা কল, (২) বয়লার—তেল বা কয়লা চালিত, (৩) ষ্টীম ডিষ্টিলেশনের সম্পূর্ণ সেট, (৪) জল ও তেল সেপারেশন মেসিন, (৫) সর্বশেষ তেলের আদ্রতা মুক্ত মেসিন। আর চাই একটি ল্যাবরেটরী। জল ও বিদ্যুৎ শক্তি এই শিল্প চালাতে একান্তভাবে দরকার। আপাত দৃষ্টিতে খতে গেলে মনে হবে বিরাট একটা কিছু, কিন্তু আসলে তা নয়। মোটদে পাঁচ থেকে ছয় কাঠা জমি হলেই কাজ বেশ ভালভাবেই চলে যাবে। তবে সম্পূর্ণ কারখানা চালু রাখতে মোট আটজন লোকের দরকার। তারমধ্যে একজন ম্যানেজার ও একজন কেমিস্টকে অবশ্য ধরে নিয়ে। যে সব মেসিনের নাম উল্লেখ করা হোল তার দাম ও বসানোর খরচ নিয়ে প্রথমে লাগবে প্রায় একলক্ষ ষাট হাজার টাকা বা তার সামান্য কিছু বেশী।

এখানেই কিন্তু এর শেষ নয়। একই মেসিনে আরও দু'টি মূল্যবান তেল তৈরী করা যাবে। (১) "পাইন নীডল অয়েল," (২) "অরেঞ্জ পেল অয়েল" প্রভৃতি। অবশ্য এর জন্য সামান্য কিছু খরচ বেড়ে যাবে। তবে লাভের দিকটাও

কম নয়। এটা কিন্তু যিনি কারখানা করবেন তাঁর ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে। তবে বিনা খরচে আরও একটি জিনিষ পাওয়া যাবে। কেবল প্যাকিংয়ের জন্য যা খরচ লাগবে। যখন ডিস্টিলেশন ষ্টীম পাইপ দিয়ে জলটা আলাদা করে দেওয়া হবে, সেটা অন্য একটা পাত্রে ধরে রেখে বোতলে ভরে দিয়ে বাজারে বিক্রী করা চলে। কারণ ঐ জলটা বেশ সুগন্ধ যুক্ত থাকে। বাজারে যেমন গোলাপ জল, কেওড়ার জল, বিক্রী হয় এটাও সেইভাবে বিক্রী করা যাবে।

সাধারণ লোকের পক্ষে এই শিল্প গড়তে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিত্তবান কয়েকজন মিলে এটি করলে লাভের পরিমান খুব একটা খারাপ হবে না। এ ছাড়াও রাজ্য সরকারও ভেবে দেখতে পারেন আমার এই প্রস্তাব কতখানি কাজে লাগান যেতে পারে।

টর্চের ব্যাটারী

এমন কতগুলি ছোটখাট জিনিষ আছে যা আমরা দরকারের সময় কাজে লাগাই বা ব্যবহার করি, কিন্তু যেই কাজ ফুরিয়ে যায় আর তার কথা মনে থাকে না। যদিও বা কখনও মনে পড়ে, সামান্য একটু চিন্তা করেই ছেড়ে দি। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে প্রথমটি অর্থের অভাব আর দ্বিতীয়ত যখন দেখি একটি নাম করা বিরাট কোম্পানি সেই জিনিষটি তৈরী করেছেন তখন আর সেদিকে পা বাড়াই না। অথচ একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় অল্প মূলধন খরচ করে ঠিক ঐ রকমের জিনিষ তৈরী করে বাজারে ছাড়া যায়। কেবল তফাত হয় বড় কোম্পানিগুলো মেসিনের সাহায্য নিয়ে দিনে হাজার হাজার কেজি মাল তৈরী করে ফেলে, আর সেই জায়গায় অল্প মেসিনে ও কিছুটা হাতে কাজ করে ওর থেকে সিকি মাল তৈরী করতে পারা যায়। এতে একটু পরিশ্রম হয় বটে তবুও যদি ঠিক ম'ত চালাতে পারা যায় তবে ধীরে ধীরে মেসিনপত্র বাড়িয়ে একটা বড় কারখানা গড়ে তোলা যায়। কয়েকটা বছর একটু সময় লাগে, এইটুকু যা তফাত। এর আরও একটা দিক আছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি একচেটিয়া ভাবে কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান তৈরী করাতে সময় সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ মানুষ তা ব্যবহারের জন্য পায় না। কিন্তু মাঝারি শিল্পে বা ক্ষুদ্র শিল্পে যদি এই

জিনিষগুলি উৎপাদন করা যেত তা হলে বোধ করি এতটা অভাব আমাদের সহ্য করতে হোত না।

আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা চন্দ্র যুগে এসে প্রবেশ করেছি। অথচ এই সব টুকি-টাকি জিনিষ সময় ম'ত পাইনা। ভাবতে গেলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। থাক ওসব কথা, এখন আলোচনা করা যাক ব্যাটারী তৈরীর কারখানা নিয়ে। যদিও আজকাল বৈজ্ঞানিকরা নানা ধরণের ব্যাটারী তৈরী করার কৌশল বার করেছেন ও সেগুলি কাজে লাগাচ্ছেন যার কিছু কিছু আমরা কাগজে বা বইতে দেখে থাকি, কিন্তু আমাদের মোটামুটিভাবে পরিচয় আছে স্টোরেজ ব্যাটারী ও ড্রাই ব্যাটারীর সঙ্গে। স্টোরেজ ব্যাটারী ব্যবহার করা হয় বাসে, ট্রেনে, লরিতে আর ড্রাই ব্যাটারীর ব্যবহার হয় ছোটখাট কাজে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ইলেকট্রিক বেলে, ট্রান্সজিস্টার রেডিওতে ও টর্চে। ড্রাই ব্যাটারীর একটি বড় সুবিধা হচ্ছে যেখানে-সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় ও সব রকম অবস্থায় ইচ্ছামত ব্যবহার করা চলে।

এখন আলোচনা করা যাক কি কি জিনিষ লাগে এটি তৈরী করতে। সর্বপ্রথম যে জিনিষটি আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে শক্ত কাগজের খোল ও তাতে কোম্পানির নাম ছাপা থাকে, এটাকে বলা যেতে পারে প্রথম আবরণ। আজকাল আবার অনেকে উপরের কাগজের খোলের বদলে প্ল্যাষ্টিকের খোল ব্যবহার করছেন। দামের দিক দিয়ে একটু বেশী পড়ে যায় বটে তবে বর্ষাকালে কোনরকম Damp লাগার ভয় থাকে না। প্রথম দিকে যাঁরা এই কারখানা করতে যাবেন তাঁদের কাগজের খোল ব্যবহার করাই ভাল। ঠিক কাগজের খোলের পরেই থাকে দস্তার খোল বা টিনের খোল। যদি কাগজের বদলে প্ল্যাষ্টিকের খোল ব্যবহার করা যায় তবে দস্তার খোল ব্যবহার না করে টিনের খোল ব্যবহার করা উচিত। ঠিক দ্বিতীয় আবরণের পরেই থাকে সামান্য পরিমাণে "সেটিং ইলেকট্রো লাইট পাউডার"। এদের মাঝখান থেকে কার্বনষ্টিক, আর তার চারপাশ ভর্তি থাকে ডিপোলারাইজিং পেষ্ট। এখনও যদি অসুবিধা থাকে তবে একটি ব্যাটারীকে ধীরে ধীরে খুলে আমার লেখার সঙ্গে একটি একটি করে মিলিয়ে নিলেই আরও সহজ হয়ে যাবে।

এবার দেখা যাক মাঝারি একটি কারখানা চালাতে কত টাকা লাগে, আর

কি পরিমাণ জায়গার দরকার হয়? যদি রোজ ৩০০ পিস্ করে ব্যাটারী তৈরী করা যায় তবে মেসিন পত্র কিনতে প্রথমের দিকে খরচ পড়বে ১৫,০০০ টাকার কাছাকাছি। আর জায়গার দরকার হবে মোট চার কাঠা কি পাঁচ কাঠা। আবার যদি দু-তিনটি ঘর নিয়ে তৈরী করা যায় তবে আরও ভাল হয়। মেসিনের মধ্যে লাগবে (১) জিঙ্ক্—টিউব—ইস্কট্র্ডার মেসিন একটি, (২) পেস্ট—বোর্ড—পাইপ—মেকিং মেসিন একটি, (৩) ছোট্ট একটি বলমিল, (৪) এস্-এস্ প্যান একটি। ১নং থেকে ৩নং পর্য্যন্ত মেসিনগুলি চালাতে বিদ্যুৎ চালিত মোটর লাগবে—3—H. P.-য়ের কাছাকাছি। জলের বিশেষ একটা প্রয়োজন হয় না। তবে যেখানে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাবে না সেই রকম জায়গায় এই শিল্প না করাই ভাল। কোন মেসিনে কি কাজ হবে তাও বলে দিচ্ছি। ১নং মেসিনে, কাগজের খোলের পরেই যে দস্তার খোল থাকে সেইটি তৈরী করা যাবে। দাম পড়বে ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকার মধ্যে। ২নং মেসিনে, ব্যাটারীর উপরে যে শক্ত কাগজের খোল থাকে সেইটি তৈরী করা যাবে। দাম পড়বে ৩,০০০ টাকা থেকে ৪,০০০ টাকার মধ্যে। ৩নং মেসিনে, ব্যাটারীর ভেতরে যে সব রসায়নিক পদার্থ থাকে সেগুলিকে ভালভাবে মিশ্রিত করার জন্য দরকার হয়। এখানে বল—মিলের বদলে এস.—এস.—মিক্‌চার মেসিনও ব্যবহার করা চলে। দাম পড়ে ৪,০০০ টাকা বা সামান্য কিছু বেশী। যদি আট ঘণ্টা হিসাবে একটি শিফ্‌ট্ করে কারখানা চালান যায় তবে জনা ছয়েক লোক লাগে।

ব্যাটারীর ভেতরে যে রসায়নিক পদার্থ থাকে তা দু'টি ভাগে বিভক্ত। (১) সেটিং ইলেকট্রোলাইট পাউডার, (২) ডিপোলারাইজিং পেস্ট্। ১নংটি দস্তার খোলের পরেই ঠিক দিতে হয়। এর পর মাঝখানে কার্বন রড বা (কার্বন পেনসিল) সেট করে ২নং পেস্টটি দিতে হয়। এইভাবে দস্তার খোলে মশলা ভর্তি করে ওপরের দিকে পিচ্ বা বিটুমেন ভালভাবে গলিয়ে এঁটে দিতে হয়। তবে ভাল ব্যাটারী যাঁরা তৈরী করবেন তাঁরা যেন পিচের বদলে বিটুমেন ব্যবহার করেন। কিন্তু সিল করার সময় একটা আলপিন বা ছুঁচ আগে থাকতে সেট করে রেখে তবেই সিল করা উচিত। পরে সিল হয়ে গেলে ঐ আলপিন বা ছুঁচ ধীরে ধীরে খুলে ফেলতে হয়। এর কারণ হ'ল যাতে ব্যাটারীর উপরে একটা ফুটো থাকে। ফলে ব্যাটারীর ভেতরে যে গ্যাস হবে তা ঐ ছিদ্র দিয়ে সহজে বেরিয়ে যেতে পারবে।

ফরমুলা—১ (প্রথম পর্য্যায়)

ময়দা	২ কেজি
প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস	৬ কেজি
জিঙ্ক ক্লোরাইড	১ কেজি
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অথবা স্যাল অ্যামোনিয়াক	১ কেজি
	১০ কেজি

এইগুলি মিশিয়ে যে পাউডার পাব তাকে বলা হয় সেটিং ইলেকট্রোলাইট পাউডার। এতে সামান্য জল মিশিয়ে পেস্ট্ করে নেওয়া হয়।

ফরমুলা—২ (দ্বিতীয় পর্য্যায়)

ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড	১২ কেজি
কার্বন অথবা গ্রাফাইট	১০ কেজি
স্যাল—অ্যামোনিয়াক অথবা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	২ কেজি
জিঙ্ক ক্লোরাইড	১ কেজি
	২৫ কেজি

এইগুলি একত্রে মিশিয়ে যে পদার্থ তৈরী করা হবে তাকে বলা হয় ব্ল্যাক্ ডিপোলারাইজিং পেস্ট্।

সাধারণ ভাবে ব্যাটারী তৈরী করার রসায়ন নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। এখন দেখা যাক কীভাবে এটি তৈরী করা হয়। প্রথমে বাজারে প্রচলিত ব্যাটারীর দস্তার খোলের মাপ নিয়ে ১নং মেসিনের সাহায্যে ঐ রকম খোল তৈরী করে নিতে হবে। অবশ্য এই খোলের একদিক বন্ধ থাকবে আর অপর দিক খোলা থাকবে। দস্তার খোল হয়ে যাওয়ার পর শক্ত কাগজের খোল করে নিতে হবে। এই জিনিষটি হবে ২নং মেসিনের সাহায্যে। এর মাপটা

এমন হওয়া দরকার যাতে দস্তার খোল খুব সহজ ভাবে ভেতরে যেতে পারে। একটু লক্ষ্য রাখা দরকার যেন কাগজের খোল বেশী বড় না হয় বা ছোট না হয়। এবার ৩নং মেসিনের সাহায্যে ফরমুলায় যে সমস্ত ভাগ দেওয়া আছে সেগুলি একত্রে মিশিয়ে সেটিং ইলেকট্রোলাইট পাউডার করে নিতে হবে, ও একটি আলাদা পাত্রে রেখে দিতে হবে। এইভাবে ৪নং মেসিনে, ফরমুলায় যে ভাগ দেওয়া আছে সেগুলি একত্রে মিশিয়ে ব্ল্যাক্ ডিপোলারাইজিং পেস্ট্ করে নিয়ে অন্য একটি পাত্রে রেখে দিতে হবে।

এখন দেখা যাক মিশ্রিত রসায়নগুলি কিভাবে ব্যাটারীতে ব্যবহার করা হয়। দস্তার খোলের থেকে সামান্য সাইজে ছোট কাঠের ছাঁচ করে নিতে হবে। ঐ ছাঁচের ঠিক মাঝখানে কার্বন রড্ বা কার্বন পেনসিল (যার মাথায় পেতল দিয়ে মোড়া থাকবে) রেখে ব্ল্যাক্ ডিপোলারাইজিং পেস্ট ভালভাবে প্যাক্ করে দিতে হবে। একটু টিপে না দিলে ছাঁচ থেকে মিশ্রিত রসায়ন বার করার সময় খসে যেতে পারে। এবার দস্তার খোলের নিচে পেস্ট বোর্ড রিং বা শক্ত কার্ডবোর্ড রিং আগে থাকতে দিয়ে তার ওপর ঐ ব্ল্যাক্ পেস্ট রাখতে হবে। আগেই বলা হয়েছে দস্তার খোলের মাপের থেকে ব্ল্যাক পেস্ট যে ছাঁচে দেওয়া হচ্ছে তার মাপ সামান্য ছোট হবে। তাই ব্ল্যাক পেষ্ট দস্তার খোলে ভরে দেওয়ার পর তার চার পাশে সামান্য ফাঁক থেকে যায়। এখন ঐ ফাঁকে সেটিং ইলেকট্রোলাইট পাউডার দিয়ে দিলেই ধীরে ধীরে সেট হয়ে যাবে। মিনিট কুড়ি বাদে অর্থাৎ যখন সেট হয়ে যাবে তখন ওপরে সামান্য কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, পিচ্ অথবা বিটুমেন দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। সিলিং কিভাবে করতে হবে তা আগেই অর্থাৎ ব্যাটারী তৈরী করার বিভিন্ন রসায়নের বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়েছে, সেই সময় বলা হয়ে গেছে।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF DRY BATTERY 300 pcs./DAY

A.	*Non recurring expenditure*	Rs. 15,000/-
	(1) Land	500 sft—own/Rental
	(2) Covered Area	500 sft „ „

(3) *Machinery and Equipment* Rs. 15,000/-

(a)	Zinc Tube Extruder Machine	Rs. 5,000/-	
(b)	Paste Board Pipe Making Machine	Rs. 5,000/-	
(c)	Ball Mill	Rs. 4,000/-	
(d)	S. S. Stirrer (4)	Rs. 200/-	
(e)	S. S. Pan	Rs. 800/-	
		Rs. 15,000/-	

B. *Recurring Expenditure/P. M.* Rs. 4,000/-

(a) Raw materials Rs. 2,500/-

Manganese dioxide
Carbon
Ammonium Chloride
Zinc Chloride
Plaster of Paris etc.

(b) *Salaries and wages* Rs. 600/-

One part-time Chemist
Four Workers

Rent, Electricity & Taxes	Rs. 400/-
Packing etc.	Rs. 500/-
	Rs. 4,000/-

C. *Capital out lay*

Non recurring Expenditure & Recurring Expenditure for 3 months. Rs. 15,000/-+Rs. 12,000/-
=Rs. 27,000/-

D. Tentative profit and loss A/C P. A.

By sale of 1,08,000 pcs. of Dry Battery @ 00'60 paisa each	Recurring expenditure Rs. 48,000/-
	Depreciation on Machinery @ 15% P. A. (On Rs. 15,000/-) Rs. 2,250/-
	Interest on Capital out lay @ 10% P.A. (on Rs. 27,000/-) Rs. 2,700/-
	Profit (Un-Taxed) Rs. 11,850/-
Rs. 64,800/-	Rs. 64,800/-

ঔষধ শিল্প—বেরিয়াম

এক্স্-রে—মিল

ঠিক ঔষধও নয়, আবার খাদ্যও নয়, অথচ যাবতীয় পেটের ও অন্ননালীর এক্স্-রে করার সময় ঐ রসায়ন দ্রব্যটি একান্তভাবে দরকার লাগে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা আজও ভারতের কোন ঔষধ কোম্পানী এই জিনিষটির প্রতি কোন লক্ষ্য দিলেন না। হিসেব করে দেখা যায় প্রতি বছর কয়েক-শ টন করে বেরিয়াম সাল্‌ফেট্ জারমানি থেকে আমদানি করতে হয় এই দরিদ্র দেশে। খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়, দু'টি মাত্র কাঁচা মাল দরকার হয় এটি তৈরী করতে। আর সবকটি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একথা জোর দিয়ে বলতে পারা যায় ভবিষ্যতে এটি তৈরী করতে কাঁচা মালের অভাব কোন দিন হবে না।

আরও সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। এক্স্-রের সাথে সাধারণ আলোক রশ্মির তফাত কোথায়? সাধারণ আলোক রশ্মি স্বচ্ছ জিনিষ ছাড়া অন্য কোন কিছু ভেদ করে যেতে পারে না। কিন্তু এক্স্-রে বা রঞ্জন রশ্মি বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করে যেতে পারে। ঠিক এই কারণে এক্স্-রে চামড়া ও মাংস ভেদ করে শরীরের ভেতরের হাড়ের ছবি তুলতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে এক্স্-রে, হাড় বা ঐ জাতির পদার্থ ভেদ করে যেতে পারে না। তাই রঞ্জন রশ্মি হাড়ে বাধা প্রাপ্ত হয় ও এক্স্-রে প্লেটে ছায়া পড়ে। তবেই আমরা ছবি দেখতে পাই। কিন্তু শরীরের ভেতরে যে অংশে হাড় নেই সেই অংশের ছবি তুলতে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারণ রঞ্জন রশ্মি কোথাও বাধা না পেয়ে সোজা বেরিয়ে যায়। ফলে এক্স্-রে প্লেটে শরীরের ভেতরের যে অংশের ছবি তোলা দরকার সেই অংশের ছায়া পড়ে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বেরিয়াম সাল্‌ফেট্ খেতে হয়। বেরিয়াম্ সাল্‌ফেট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ননালী সমেত পেটের সমস্ত জায়গায় কোটিংয়ের সৃষ্টি হয়। এবার যে অংশের ছবি তোলা দরকার সেখানকার ছবি নেওয়া হয়। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে সঠিক ছবি তোলা সম্ভব হয় ও চিকিৎসার অনেক সুবিধা হয়।

এসব কথা জানার পর অনেকেই হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন, এই তো সামান্য প্রয়োজনে লাগে, তাও আবার শরীরের সব জায়গায় ছবি তুলতে নয়।

এর আর আমাদের দেশে কতটুকু দরকার লাগবে? তাঁদের সকলকে আমার অনুরোধ, একবার যেন যে কোন সরকারী হাসপাতালে গিয়ে যেখানে একস্-রে হচ্ছে একটু খোঁজ খবর নেন। তহলেই বুঝতে পারবেন আমার কথার সত্যতা কতখানি। এ ছাড়াও যে সব বে-সরকারী একস্-রে ইউনিটগুলি আছে সেখানেও প্রতি মাসে ১০ থেকে ১৫ কেজি করে বেরিয়াম সাল্‌ফেট লাগে।

এখন দেখা যাক এই বেরিয়াম সাল্‌ফেটের ছোট একটি কারখানা করতে কত টাকা খরচ পড়ে? আর ক'টি কারখানা দেশে করা যেতে পারে? আমি জোর দিয়ে বলতে পারি রোজ কুড়ি থেকে পঁচিশ কেজি করে উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট চার পাঁচটি কারখানা চলতে পারে। আর এর জন্যে মেসিন পত্র সমেত প্রতিটি কারখানার জন্য খরচ পড়বে পনের থেকে ষোল হাজার টাকা। জারমান থেকে যেটা আসে সেটা বেরিয়াম্ সাল্‌ফেট, খেতে একটু খারাপ লাগে। এটাকে আরও ভাল করা যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে জিনিষটি তৈরী করে দেখেছি, খেতে এতটুকুও খারাপ লাগেনি বরং ভালই লেগেছে। অথচ গুণাগুণের দিক থেকে বিচার করে দেখা গেছে জারমানি থেকে আমদানি করা বেরিয়াম সাল্‌ফেটয়ের থেকে কোন অংশে কম নয়। তাই ভারতীয় ভাবায় এর নাম-করণ করা চলতে পারে "শ্যাডো ফুড্" বা ছায়া খাদ্য।

কাঠা দুই জায়গা পেলেই এই শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায়। তার মধ্যে সবটাই শেড্ দিতে হবে। আবার যাদের খালি জায়গা নেই অথচ তিনটি মাঝামাঝি সাইজের ঘর যোগাড় করার সুবিধা আছে, সেইখানে এই কারখানা গড়ে তোলা সব থেকে সুবিধা জনক। তবে জল ও বিদ্যুৎশক্তি একান্তভাবে দরকার। খুব বেশী লোক লাগে না, মাত্র দু'টি কি তিনটি লোক লাগে। তবে তার মধ্যে একজন অভিজ্ঞ কেমিস্টকে রাখতেই হবে, তা না হলে সরকারের তরফ থেকে ড্রাগ্ লাইসেন্স পাওয়া যাবে না। অবশ্য এই সব ঝামেলা প্রথম দিকে যা একটু সামলাতে হবে।

এবার আসা যাক কি কি কাঁচা মাল লাগে এটা তৈরী করতে। (১) বেরিয়াম সল্ট্, (২) অ্যাসিড। প্রথমটি পাওয়া যায় কলকাতার যে কোন দোকানে, অবশ্য যাঁরা কেমিক্যাল বিক্রী করেন। এক মেট্রিক টনের দাম পড়ে পাঁচশ টাকার কাছাকাছি। আর দ্বিতীয়টি তৈরী করে বেঙ্গল কেমিক্যাল্ সমেত অনেক ছোট বড় কোম্পানি। এখানে জেনে রাখা দরকার

স্যাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড সি, পি, কোয়ালিটি হবে। তাই দাম একটু বেশী পড়বে। তবে অন্যান্য কোম্পানির অ্যাসিড কেনার থেকে বেঙ্গল কেমিক্যাল্‌ থেকে কেনা ভাল। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে এতে ঔষধ তৈরী করতে হবে।

রোজ পঁচিশ কেজি করে বেরিয়াম সাল্‌ফেট করতে গেলে মোট এই ক'টি মেসিন পত্র লাগবেই। (১) ড্রায়ার (২) রিয়্যাক্টর (৩) ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার তৈরী করার মেসিন, (৪) ছোট একটি রেমণ্ড মিল। আর যা টুকিটাকি জিনিষ লাগবে তা হোল গোটা সাত আট পলিথিনের ভ্যাট্‌ ও সাদা ক্যাম্বিসের থলি কুড়ি থেকে বাইশটি। সব কিছু খরচ খরচা ধরে নিয়ে এক কেজি বেরিয়াম সাল্‌ফেট তৈরী করতে খরচ পড়বে পাঁচ টাকা থেকে ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সার কাছাকাছি। আর বাজারে বিক্রী হবে বার থেকে চৌদ্দ টাকার মধ্যে। এবার গড় হিসেব করলে দেখা যাবে প্রায় সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে এক থেকে দেড় হাজার টাকা লাভ থাকবেই।

আরও একটা কথা পাঠককে জানিয়ে রাখি, যদি কেউ ইচ্ছে করেন তবে বাজারে দু-রকমের বেরিয়াম সাল্‌ফেট বিক্রী করতে পারেন। একটা খেতে ভাল, আর একটা খেতে খারাপ লাগবে। অবশ্য দুটোর কাজ একই হবে তবে সুবিধার দিক দিয়ে বিচার করলে দু-রকমই মাল তৈরী করে বাজারে ছাড়া উচিত। একটা একটু কম দাম ও দ্বিতীয়টা একটু বেশী দাম থাকবে। এতে বিক্রীটা বাজারে ভালই হবে। তা ছাড়া সরকারী হাসপাতালে যেটা খেতে খারাপ সেটাই চলে, কারণ দামের দিক দিয়ে কিছুটা সুবিধা হয়।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF BARIUM X—RAY—MEAL—20kg./DAY.

1.	**Covered area**	**300sft (approx.)**
2	**Non Recurring Expenditure**	**Rs. 11,500/-**
(i)	Plant and Equipment Small centrifuge. Vats, Small Drier, Drying pan, Small pulveriser, Distilled water plant	Rs. 9,000/-
(ii)	Small Analytical Laboratory	Rs. 1,000/-
(iii)	Installation charges	Rs. 500/-
(iv)	Water and power line connections	Rs. 500/-
(v)	Misc Equipment like weighings scale, Mugs, pipe etc.	Rs. 500/-
		Rs. 2,500/-

3. Recurring Expenditure/P. M. Rs. 2,400/-

(i) Raw materials like Barium Salt (500kg.) Salphuric Acid (250 kg.) misc chemicals etc, Rs. 900/-

(ii) *Salaries and wages* Rs. 600/-

One Part-time chemist	Rs.	200/-
One manager	Rs.	200/-
Two workers	Rs.	200/-
	Rs.	600/-

(iii) Rent Electricity and Taxes Rs. 400/-

(iv) Packing etc Rs. 500/-

Rs. 2,400/-

4. Capital out lay for 3 months

2+3=Rs. 11,500/-+Rs. 7,200/-
=Rs. 18,700/-
Say Rs. 19000/-

5. Tentative Profit and Loss A/c. P. A.

By sale of 6000 kg. of Barium X-Ray—Meal @ Rs. 7/- per kg.	Recurring Expenditure Rs. 28,800/- Depreciation on machinery @ 15% P A. (on Rs. 9,000/-) Rs. 1350/- Depreciatian on other non recurring heads @ 10% P.A. (On Rs. 2,500/-) Rs. 250/- Interest on capital out lay @ 10% P. A. (on Rs. 19,000/-) Rs. 1,900/- Profit (un-Taxed) Rs. 9,700/-
Rs. 42,000/-	Rs. 42,000/-

অ্যালিউমিনিয়াম হাইড্রো-অক্সাইড জেল

একথা সত্য, আজকের বিজ্ঞান মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু অপর দিকে চিকিৎসা বিজ্ঞান তার নিত্য নতুন ঔষধের আবিষ্কারের ফলে আমরা পেয়েছি তার থেকে বহুগুণ বেশী। আজ আমাদের দেশে এই শিল্প এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার নিজের দেশের চাহিদা ভালভাবে মিটিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে সে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে ভারতের সব জায়গায় এই শিল্প গড়ে ওঠে নি। সারা ভারতে প্রধানত দুটি জায়গায় এই ঔষধ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। দুটি জায়গায় মধ্যে একটি হ'ল আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় কলকাতায়, অপরটি মহারাষ্ট্রের বোম্বেতে।

এখানে সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বোম্বে থেকে ঔষধ নিয়ে এসে এখানকার কারখানাকে কাজ চালাতে হয়। আরও একটু পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি। যেমন, একটি ঔষধ তৈরী করতে চার রকমের জিনিষ লাগে। এরমধ্যে তিন রকমের জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। আর বাকী একটির জন্য বোম্বের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। আমার প্রশ্ন হলো কাঁচামাল যখন এখানেই সহজে পাওয়া যায় তবে মহারাষ্ট্রের মুখ চেয়ে থাকা কেন? মোট দুটি কি তিনটি জিনিষ লাগে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাদের সঙ্গে আমাদের অবাধ পরিচয়। কিন্তু না জানার ফলে আমাদের কাছে এক বিরাট বিস্ময় হয়ে থেকে যাচ্ছে। তাই এই সহজ ঔষধ শিল্পটি যাতে গড়ে তোলা যায় তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

পেটের অম্ল গোলমালে ভোগেন না এমন মানুষ দেশে পাওয়া খুব শক্ত। তার মধ্যে সহজে যে রোগটি ধরে, "অম্ল বা অজীর্ণের" নাম অন্যতম। এই "অম্ল বা অজীর্ণের" যতগুলি ঔষধ বাজার বিক্রয় হয় যথা, "অ্যালুড্রক্স", "অ্যালুজেল-ডি-এফ্", "ক্যাটাক্সল্" প্রভৃতি, তার মধ্যে "অ্যালিউমিনিয়াম হাইড্রো-অক্সাইড জেল" থাকবেই। আশা করি এবার তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই জিনিষটি না থাকলে কোন অম্বলের ঔষধ হবে না।

কাঠা দুই মাত্র জায়গা হলেই এই শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায়। তার মধ্যে মাত্র এক কাঠায় শেড থাকলেই হবে। বাকী জায়গায় শেড্ না দিতে

পারলেও কোন ক্ষতি নেই। আবার যাঁদের খালি জায়গা নেই অথচ দু'টি মাঝারি খালি ঘর পড়ে আছে, সেখানেও এই শিল্প গড়ে তোলার কোন অসুবিধা হবে না। তবে জল ও বিদ্যুৎশক্তি একান্তভাবে দরকার। আর তিন থেকে চারজন লোক লাগে এই কারখানা চালাতে।

এবার আসা যাক কি কি কাঁচামাল লাগে এটা তৈরী করতে। (১) ফটকিরি, (২) সোডা অ্যাশ। প্রথমটি পাওয়া যায় বেঙ্গল কেমিকেলে ও ফস্‌ফেট কোম্পানি, রিষড়াতে। এক মেট্রিক টনের দাম পড়ে ৫৫০ টাকার কাছাকাছি। আর দ্বিতীয়টি তৈরী করে টাটা কোম্পানি! প্রায় ৬৫০ টাকার মতো দাম পড়ে এক মেট্রিক টনের। এই জিনিষটি রিষড়ার ফস্‌ফেট কোম্পানিও তৈরী করে। তবে এদের থেকেও টাটার তৈরী সোডাঅ্যাশ্‌ "কোয়ালিটির" দিক থেকে অনেক গুণ ভাল।

রোজ পনের কেজি করে "অ্যালিউমিনিয়াম জেল" তৈরী করতে প্রায় পনের থেকে সতের হাজার বা আর সামান্য কিছু বেশী টাকা খরচ পড়ে। অবশ্য সমস্ত মেসিনপত্র নিয়ে। মোটামুটি ভাবে এই ক'টি মেসিন হলেই কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে। (১) রিয়্যাক্‌টার, (২) ড্রায়ার, (৩) ছোট রেমণ্ড মিল, (৪) স্বয়ংক্রিয় সেকার। আর যা টুকিটাকি জিনিষ লাগে তা হলো গোটা চার পাঁচ কাঠের ভ্যাট, বড় কাচের জার দশ বারটি ও মোটা সাদা ক্যাম্বিস পনের-কুড়ি মিটার। সবকিছু ধরে নিয়ে এককেজি "অ্যালিউমিনিয়াম জেল" তৈরী করতে খরচ পড়ে সাত টাকা চল্লিশ পয়সার কাছাকাছি। আর বাজারে বিক্রয় হয় প্রতি কেজি বার থেকে চৌদ্দ টাকার মধ্যে। এবারে গড়ে হিসেব করলে দেখা যায় প্রতি মাসে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে দুটি হাজার টাকা লাভ থাকবেই।

এবার যে বক্তব্যটি পাঠকের সামনে রাখছি তা হলো সম্পূর্ণ আমার নিজের অভিজ্ঞতা। "অ্যালিউমিনিয়াম জেল', তৈরী করার সময় অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় ফটকিরি, সোডাঅ্যাশ্‌ ও জল মিশিয়ে যে মণ্ড হয় তা সাধারণ জল দিয়ে প্রায় তিনদিন ধরে ধুতে হয় ও শেষকালে বার দুই ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। হিসেব করে দেখা গেছে প্রতি চার্জে প্রায় দু'শো টাকার কাছাকাছি ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার লাগে। আমার মতে কারখানা করার সাথে সাথে রোজ দু'শো লিটার ক্যাপাসিটির ছোট একটা ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার প্ল্যান্ট করে নেওয়া ভাল, কারণ তাতে উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাবে। ফলে

লাভও অনেক বেড়ে যায়। অবশ্য প্রথম দিকে এই ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার প্ল্যাণ্ট করতে আরও হাজার তিনেক টাকা বেশী খরচ পড়ে যায়। এখন যিনি এই কারখানা করবেন তিনি আমার এই প্রস্তাব একবার ভেবে দেখতে পারেন।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF ALUMINIUM HYDRO-OXIDE-GEL 10 kg. PER DAY

A. Non recurring expenditure Rs. 7000/-

(1)	Land		50 sft (Approx) own/Rental	
(2)	Covered Area		30 sft ,, ,, ,,	
(3)	*Machinery & Equipment*			Rs, 6,200/-
(4)	S S. Boat	(1)	Rs. 1500/-	
(5)	S. S. Tray	(6)	Rs. 1200/-	
(6)	Wooden Vat	(6)	Rs. 1300/-	
(7)	Lab. Equipment		Rs. 200/-	
(8)	Baby Granding Mill		Rs. 2000/-	
			Rs. 6,200/-	
(9)	Power line		Rs. 500/-	
(10)	Water		Rs. 300/-	
			Rs. 800/-	

Total Non Recuring Expenditure Rs. 7,000/-

B. Recurring Ependiture Rs. 3,000/-

(1)	Raw materials		Rs. 2,200/-
(2)	Soda Ash	Rs. 1500/-	
(3)	Alum	Rs. 500/-	
(4)	Misc chemicals	Rs. 200/-	
		Rs. 2200/-	

C. *Salaries & Wages* Rs. 500/

(1)	One chemist part time	Rs. 200/-
(2)	Two workers	Rs. 200/-
(3)	One darwan	Rs. 100/-
		Rs. 500/-

(4) Packing etc Rs. 300/-

Total Recurring Expenditure Rs. 3,000/-

Anticipated capital outlay = Nonrecurring + Recurring Expenditure for 3 months
Rs. 6,000/- + Rs. 9,000/-
= Rs. 15000/-

D. Tentative Profit & Loss A/C P. A.

By sale of 3,600 kg. of Aluminium Hydro-oxide Gel @ Rs. 13.00 per kg.	Recurring Expenditure Rs. 36,000/-
	Depriciation on Machinery @ 15% P.A. (on Rs. 7000/-) Rs. 1050/-
	Interest on Capital out lay @ 10% P.A. (on Rs. 10,000/-) Rs. 1000/-
	Profit (un-Taxed) Rs. 8750/-
Rs. 46800/-	Rs. 46800/-

ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার

ঠিক শহরেও নয় আবার একেবারে গ্রামের ভেতরেও নয়, তবে নগর বা মহানগর থেকে বেশ কিছুটা দূরে যে শিল্পটি চালান যেতে পারে সেটির নাম ডিস্‌টিল্ড-ওয়াটার। শহর অঞ্চলে যে কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। কারণ সেখানে রয়েছে নানা প্রকার সুযোগ। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরকে নিয়ে তো গোটা ভারতবর্ষ নয়। হিসেব করে দেখা গেছে দেশে গ্রামের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষের ওপরে। তাই সমগ্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করতে গেলে চাই শহরের সাথে সাথে গ্রামে বা আধা শহরে ব্যাপক ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের প্রসার। আবার সেই সঙ্গে দেখতে হবে বিক্রয় বাজারটা যেন তার আশেপাশে থাকে। তা না হলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার এরূপ একটি শিল্প যা করা সব থেকে সোজা অথচ কোন কাঁচামাল কিনতে হয় না. আবার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা রোজ কতরকমভাবে যে এই ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার করি তা বোধকরি আমাদের কারও খেয়াল থাকে না। শহর অঞ্চলে প্রচুর ছোট ছোট "ইউনিট" আছে, যাঁরা কিছু না কিছু ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার তৈরী করেন। আবার তাঁরাই শহরের চাহিদা মিটিয়ে আমাদের অর্থাৎ আমরা যারা মহানগর থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকি সেখানে যোগান দিচ্ছেন। আর এই যাওয়া আসার জন্য যে বাড়তি খরচটুকু লাগছে তা আমরাই যোগাচ্ছি। অথচ আমরা অনেকেই একথা জানি না যে, কোন কারণে শহর ছাড়া গ্রামে এই শিল্প গড়লে আরও কম খরচায় বেটার কোয়ালিটি ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার পাওয়া যেতে পারে। কি কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে সে বিষয়ে পরে আলোচনার চেষ্টা করছি।

সত্যিকার মেসিন বলতে আমরা যা বুঝি সেরকম কিছু একটা দরকার হয় না। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারলে বিশেষ কিছুই কিনতে হয় না। তবুও সুবিধার জন্য একটা লিষ্ট দিচ্ছি। (১) বয়লার (কয়লা চালিত), (২) কন্‌ডেনসার, (৩) ১০০ ফুট লোহার পাইপ, (৪) জল রাখার লোহার ট্যাঙ্ক একটি, (৫) হস্তচালিত পাম্প একটি, (৬) ৪০-৫০

ফুট তামার পাইপ, (৭) ৭০-৮০টি পলিথিনের বড় জার। প্রতি ঘণ্টায় যদি দশ গ্যালন করে ডিস্টিল্ড ওয়াটার করা যায় তবে প্রথমে চালু করতে মোট খরচ পড়ে ছয় থেকে আট হাজার টাকা। অবশ্য আরও ছোট করে প্ল্যান্ট করে ও তার উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে কাজ চালাতে পারা যায়। এতে প্রথম দিকে খরচ কমে গিয়ে তিন থেকে চার হাজার দাঁড়াবে, কিন্তু তাতে লাভ অনেক কমে যাবে। একটু বড় করে করলে যেখানে মাসে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে লাভ থাকত আটশো টাকার ম'ত সে জায়গায় কমে গিয়ে দাঁড়াবে মাসে ৩০০ টাকার মধ্যে। এবার পাঠক স্থির করবেন তাঁর নিজের আর্থিক সঙ্গতি বুঝে। এই শিল্পের আরও একটা মজার জিনিষ হলো কাঁচামালের জন্য কোন খরচের প্রয়োজন হয় না। সব জায়গায় প্রায় বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। কেবল বয়লার চালাতে যা কিছু সামান্য কয়লার দরকার হয়। দুজন মাত্র লোক লাগে, আবার নিজেরা একটু দেখাশোনা করলে প্রথম দিকে মাত্র একজন লোক রাখলেই চলে যাবে।

আগেই বলেছি কলকাতা ছাড়া গ্রামে বা আধা শহরে এই শিল্প গড়লে লাভ থাকবে একটু বেশী। কারণ গ্রাম অঞ্চলে পুকুরের অভাব নেই। আর পুকুরের জল সব থেকে ভাল। অবশ্য যে পুকুরে বার মাস জল থাকে। পাতকুয়া বা টিউবওয়েলের জলে নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ মিশে থাকে। ফলে বয়লার তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। অথচ পুকুরের জলে ঐসব খনিজ পদার্থ থাকে না, যদিও থাকে তা খুব সামান্য। তাতে বয়লারের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ অনেকদিন এক জায়গায় আবদ্ধ থাকার ফলে জলের মধ্যে দ্রবীভূত ঐসব খনিজ পদার্থ থিতিয়ে মাটিতে বসে যায়। এই একটি লাভের দিক। আবার মহানগর থেকে বয়ে নিয়ে আসার যে খরচা সেটাও লাগে না। এটাও একটা লাভের দিক।

মোটামুটিভাবে ডিস্টিল্ড ওয়াটার সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা পরিচয় হয়ে গেল। এবার দেখা যাক এটা কিসে ব্যবহার হয়। (১) গ্রাম বা শহরের কোন স্কুল বা কলেজের লেবরেটরীতে, (২) পেট্রোল পাম্পে, (৩) হাসপাতালে, (৪) প্রত্যেকটি ঔষধের দোকানে, (৫) রেলওয়েতে, (৬) ছোট, বড় কলকারখানায় বিশেষ করে যেখানে ঔষধ তৈরী হচ্ছে। যদি রেলওয়েতে বা ঐরকম কোন একটিমাত্র কারখানায় সাপ্লাই করতে পারা যায় তবে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। কলকাতা ছাড়া বর্ধমানে, দুর্গাপুরে, হুগলীতে

সমেত খরচ পড়বে প্রায় ৬০,০০০ হাজার টাকা। মেসিনগুলির এখন তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। (১) এস্-এস্-ভ্যাট, (২) রিয়্যাকশন ভ্যাট, (৩) এস্ এস্-কন্‌সেন্‌ট্রেটর, (৪) এস্-এস্-ক্রিস্টালাইজেশন—প্যান্, (৫) এস্-এস্-সেন্টিফিউজ, (৬) ইলেকট্রিক—ড্রায়ার, (৭) অ্যালিউমিনিয়াম-ট্রে দশটি (৮) পলিথিলিন ভ্যাট দু'টি। আর যা টুকিটাকি জিনিষ লাগবে তা স্কীমেতে লিখে দেওয়া হবে। অবশ্য লেবরেটরী করার খরচ এখানে ধরা হয়নি। মেসিন বসানোর খরচ, জল ও বিদ্যুৎ আনার খরচ নিয়ে ৬০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে।

যে সমস্ত মেসিনগুলির নাম করা হ'ল সেগুলি বসাতে গেলে শেড্ দিয়ে ঘেরা জায়গার দরকার হবে প্রায় চার কাঠার কাছাকাছি। আর সমস্ত কারখানার জন্য ছয় কাঠা জমি যথেষ্ট। অবশ্য পাঁচ কাঠায় হয়। তবে ছয় কাঠা হলেই ভাল হয় মেসিনগুলি চালাতে বিদ্যুৎ শক্তি লাগবে 15 H.P থেকে 18 H.P মধ্যে। তাই যেখানে এই পরিমান বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাবে সেইখানে জমি ঠিক করা উচিত। জলও দরকার, তবে একটি টিউব ওয়েল করে ইলেকট্রিক মোটর বসিয়ে যে জল পাওয়া যাবে সেটাই যথেষ্ট। এবার দেখা যাক কি কি কাঁচামাল লাগে। সোডিয়াম—স্যালিসাইলেট তৈরী করতে দুটি মাত্র কাঁচামাল দরকার হয়, (১) সোডা অ্যাশ্, (২) স্যালিসাইলিক এ্যাসিড। ১নং মালটি তৈরী করে ফস্‌পেট কোম্পানি, রিষড়াতে। টাটাও তৈরী করে। প্রতি কেজির দাম পড়ে একটকা করে। ২নং মালটি তৈরী হয় বোম্বেতে, আলতা কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড। পাঁচ থেকে ছয় টাকা প্রতি কেজির দাম পড়ে। আবার অ্যাম্‌মোনিয়াম—মোলিবডেট জন্যও দুটি কাঁচামাল লাগে। (১) Molybdenium Trioxide, (২) লিকার—অ্যামমোনিয়া। প্রথমটি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এরজন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাতে হবে। প্রথমে সরকারের তরফ থেকে ইন্‌স্‌পেক্‌শন হয়, এরপর প্রয়োজন অনুসারে যে ব্যক্তি কারখানা করছেন তাঁকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আরও জানার থাকলে নিউ সেক্রেটারিয়েটে দশতলায় ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গেলেই সব কিছু জানতে পারা যাবে। আমি প্রতি কেজি হিসাবে রসায়নটির দাম দিয়ে দিচ্ছি। তবে দরটা সব সময় এক থাকে না, সামান্য বাড়তে বা কমতে পারে। সাধারণভাবে দেখা যায় ৩৫ টাকা থেকে

৪৫ টাকার মধ্যে থাকে। ২নং মালটি পাওয়া যায় কলকাতায়। তিন-চারটি কোম্পানি তৈরী করে। আমি একটি কোম্পানির নাম দিয়ে দিচ্ছি। ক্যেমিক্যাল কর্পোরেশন অফ্ বেঙ্গল, কলিকাতা। কেজি প্রতি দাম পড়ে ২ টাকা করে।

যদি পাঁচ কেজি করে রোজ অ্যাম্মোনিয়াম মোলিবডেট উৎপাদন করা যায় তবে বছরে ১,৫০০ কেজি মাল তৈরী হয়। বাজারে এখন বিক্রী হচ্ছে প্রতি কেজি ৭০ টাকা করে। আর সোডিয়াম স্যালিসাইলেট তৈরী হবে ৯,০০০ হাজার কেজি করে। বাজারে বিক্রীর দর কেজি প্রতি ১১ টাকা থেকে ১২ টাকা করে। এবার হিসাব করলে দেখা যাবে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে প্রতি মাসে লাভ থাকে ২,০০০ হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী।

এই সব আলোচনার পর একটি মাত্র বিষয় বাকী থাকে তা হ'ল তৈরী করার পদ্ধতি। এমন কতকগুলি রসায়ন আছে যা সামান্য কথায় লিখে বলা বা বোঝান যায় না। প্রত্যেকটি মেশিনে খুব সাবধানে ধাপে ধাপে তৈরী করতে হয়। সামান্য গোলমাল হয়ে গেলে গোটা চার্জটাই খারাপ হয়ে যায়। তবুও এই বিষয়টি নিয়ে আমার আলোচনার একমাত্র কারণ যে, অনেকের মূলধন থাকা সত্ত্বেও খানিকটা জ্ঞান বা ধারণা না থাকার ফলে কোন ভাল বৈজ্ঞানিক বা রসায়নবিদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন না। একটা ধারণা থাকলে অনেক সুবিধা হয়। তাছাড়া লেবরেটরীতে তৈরী করার পর গুণাগুণ টেস্ট্ করে তবেই বড় করে কারখানা চালাতে পারা যেতে পারে।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF SODIUM SALICYLATE (C.P) & AMMONIUM MOLYBDATE (C.P.)

30 kg/day and 5 kg/day respectively

BASIS : 1 SHIFT/DAY

A. Non-Recurring Expenditure — **Rs. 60,000/-**

1.	*Land*	5 Cottahs.		Rental
2.	*Covered area*	1200 Sft.		Rental
2.	*Machinery & Equipment*			Rs. 40,000/-
(i)	Alkali Dissolution Vat S.S. 20 gallons capacity		1 No.	Rs. 2,000/-

(ii) Reaction Vats, S.S. 20 gallons capacity, with S.S. Stirrer & Motor (1.5 H.P) 2. Nos. Rs. 8,000/-

(iii) Jacketted S.T. Concentrator, 30 gal. cap, steam-heated completed with M. S- Steam Pot (oil-heated, 4 KW), Vacuum Pump and Motor (2 P.H) with arrangements for the production of distilled water 2 Nos. Rs. 18,000/-

(iv) S-S. Pans for crystallization $2\frac{1}{2}'$ dia $\times$ 1′ depth 2 Nos. Rs. 2,000/-

(v) Centrifuge, S-S-Bowl, 12″ Dia, complete with Motor (1.5 H-P) 1 No. Rs. 5,000/-

(vi) Electric Drier, with 10 Aluminium Trays, 36″ × 18″ × 2″, complete with thermostatic control (4 KW) 1 No. Rs. 5,000/-

4. *Misc Equipment* like Weighing Scale, Polythylene Vats (2 Nos), S.S. Laddles etc. Rs. 2,000/-
5. *Installation charges* Rs. 5,000/-
6. *Laboratory Equipment* Rs. 3,000/-
7. *Water & Power line connections* Rs. 6,500/-
8 Furniture & Fixture Rs. 3,500/-

Total Non recurring Expenditure Rs. 60,000/-

B. Recurring Expenditure/ P.M. Rs. 13,000/

(1) *Raw materials* Rs. 8,500/-

(*i*) *For Ammonium Molybdate (125 kg.)*

Molybdenium Trioxide 100 kg. @ Rs. 35/kg. Rs. 3,500/-

Liquor Ammonia 75 kg. @ Rs 2/kg. Rs. 150/-

Rs. 3,650/-

(ii) *For Sodium Salicylate (750 kg)* Rs. 4,850/-

Salicylic Acid (Tech) 700 kg.
@ Rs. 6,50/kg Rs. 4,550/-

Soda Ash (Tech) 300 kg.
@ Rs. 1,00/kg. Rs 300/-

Rs. 4,850/-
Total Rs. 8,500/-

2. *Salaries & Wages* Rs 2,200/-

Manager-cum-Chemist	One	Rs. 800/-
Assistant Chemist	One	Rs. 400/-
Workers	Four	Rs. 400/-
Office Assistants	Two	Rs. 500/-
Darwan	One	Rs 100/-
		Rs. 2,200/-

3. *Electricity, Rent & Taxes* Rs. 700/-
4. *Misc Contingencies including packing* Rs. 1,500/-

Total Recurring Expenditure
per month Rs. 12,900/-
Say Rs. 13,000/-

C. *Total Capital Outlay :*

=A+3B
=Rs. 60,000/-+Rs.39,000/-
=Rs. 99,000/-
Say=Rs. 1,00,000/-

D. Tentative profit and loss account P. A.

By sale of : 1,500 kg. of Amm. Molybdate @ Rs. 70/kg. Rs 1,05,000/- 9,000kg of Sod. Salicylate @Rs. 11/kg. Rs 99,000/-	Recurring expenditure Rs. 1,56,000/- Depreciation on Plant & Equipment @ 20% P. A. (on Rs. 40,000/-) Rs. 8,000/- Depreciation on other non recurring heads @ 10%P. A. (on Rs. 20,000/-) Rs. 2,000/- Interest on Capital outlay @ 10% P. A. (on Rs. 1,00,000/-) Rs. 10,000/- Profit (Un-Taxed) Rs. 28 000-/
Rs. 2,04,000/-	Rs. 2.04,000/-

বিটা ন্যাফথল

একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষে যত রকমের শিল্প গড়ে উঠেছে তার মধ্যে আমাদের দেশে রসায়ন শিল্পের ভবিষ্যৎ বর্তমানে অনেক ভাল।· এমন একদিন ছিল যখন সামান্য একটা ছুঁচের জন্য বিদেশের মুখপানে চেয়ে বসে থাকতে হোত। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়ার পর সেদিক দিয়ে দেশের অবস্থা অনেক পালটে গেছে। ছোট বড় ও মাঝারি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মোটামুটিভাবে এখন যা উৎপাদন হচ্ছে তাতে দেশের চাহিদা মিটে যাচ্ছে। কিন্তু সেই পরিমাণে রসায়ন শিল্প কিছুই এগিয়ে যেতে পারে নি। আজ তাই অতি মূল্যবান রসায়ন থেকে সাধারণ রসায়ন পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি করে কোন রকমে দেশের চাহিদা মেটান হচ্ছে। তার ফলে ঐ সব আমদানি রসায়নের ওপর নির্ভর করে যে সব শিল্প গড়ে উঠেছে তার উৎপাদন খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। অথচ দেশের শিল্পপতিরা যদি এইদিকে নজর দেন তবে দেশের চাহিদাও মেটে আর সেই সঙ্গে তাঁরও লোকসান খাবার কোন চিন্তা থাকে না। "বিটা ন্যাফথল" এই রকম একটি রসায়ন যা আজও সারা ভারতে বছরে চার থেকে পাঁচ মেট্রিক টন করে জার্মানী থেকে আমদানী হয়ে আমাদের দেশে আসে।

এর সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে বেশ কিছু বছর আগে। তখন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে তার ঢেউ এসে লেগেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ একে একে উধাও হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় বিজ্ঞানী মহল এই "বিটা ন্যাফথল"কে ব্যবহার করল সিনথেটিক রবার উৎপাদনের কাজে। রবারের বিকল্প হিসাবে সেদিন যা সাময়িকভাবে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাল তা আরও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় মিশে গেল। তাই আজও সিনথেটিক রবার উৎপাদন করতে শতকরা ষাট ভাগ ও বাকীটা ডাইস স্টাফে ব্যবহার হচ্ছে এই "বিটা ন্যাফথল"। ১৯৬৬ সালে ভারত সিনথেটিক রবার উৎপাদন করেছে ১৫,৬০৪ (লং টন)। যতদিন যাচ্ছে এর চাহিদা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে ন্যাচারাল রবারের উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

এটি তৈরী করতে যেসব কাঁচামাল লাগে তার সব কটি ভারতেই পাওয়া যায়। তবে একটি জিনিষের আমাদের দেশে সামান্য অভাব আছে তা হলো ন্যাফথালিন। আগে অবশ্য একেবারেই কম ছিল তখন মাত্র ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী তৈরী করত। কিন্তু এখন দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড ও ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের দুই একটি ইউনিট ন্যাফথালিন উৎপাদন করছেন। হয়তো আরও দু-একটা ছোটখাটো উৎপাদনকারী থাকতে পারে। তবে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য নয়। মোট কথা যেখানেই "কোক আভ্‌ন্" প্ল্যাণ্ট আছে সেইখানেই ন্যাফথ্যালিন উৎপাদন হবে। অবশ্য আমাদের ব্যবহারের জন্য লাগবে হট—প্রেস্ড—ন্যাফথলিন। এতো গেল একটি কাঁচামালের কথা। আর বাকী গুলো হচ্ছে সালফিউরিক এ্যাসিড, সোডিয়াম কার্বনেট, কষ্টিক সোডা ও টুকিটাকি সামান্য কিছু রসায়ন, অবশ্য এর সাথে সল্ট ও কয়লাকে ধরে নিয়ে। ন্যাফথ্যালিন কোথায় পাওয়া যাবে তা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। এখন বাকীগুলো যথাক্রমে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের যে কোন ইউনিটে এবং শেষের দুটি টাটা কোম্পানীতে পাওয়া যাবে।

এটি কিন্তু ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। বরঞ্চ যত রকমের বৃহৎ শিল্প আছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। খুব ছোট্ট করে একটি কারখানা করতে গেলে প্রায় তিন লাখ টাকার ম'ত খরচা পড়ে। আর এটি চালু রাখতে গেলে লোক লাগবে জনা চল্লিশের কাছাকাছি। সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ পড়ে তিন টাকার কাছাকাছি। আর বাজারে বিক্রয় হয় ছয় টাকার ওপরে। অবশ্য মনে রাখতে হবে জারমানি থেকে আমদানি হয়ে যেটা আসে তার বাজার দরটা জানাচ্ছি। এই দরটা অবশ্য কোন দিনই বাজারে বজায় থাকে না। বর্তমানে এর দর উঠেছে ত্রিশ টাকার কাছাকাছি। যখন বাজার সাধারণ অবস্থায় থাকে তখন খুব সস্তা হলেও দশ টাকার নিচে নামে না। বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছে এই রসায়নের অভাব। যদি কেউ বিদেশে রপ্তানি করতে চান তারও বিরাট বাজার রয়েছে। এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে গেলে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে পত্র লিখে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিটা ন্যাফথল সম্বন্ধে আরও একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। দেখতে অনেকটা ফিকে চকলেট রংয়ের। আকারে হবে ছোট মাছের আঁশের মত। অর্থাৎ

ইংরাজিতে যাকে আমরা "ফ্লেক্" বলে থাকি। তাই প্যাকিংয়ের দিক দিয়ে বিশেষ একটা অসুবিধা হয় না। প্রথমে পলেথিনের প্যাকেটে মুড়ে পরে মোটা কাগজের প্যাকিং হলেই কাজ চলে যাবে। অবশ্য বিদেশ থেকে ঠিক এই ভাবেই প্যাকিং হয়ে আসে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় কি কি মেসিন লাগে ও কতটা জমির দরকার হয়। মোট তিন বিঘে জমি হলেই ভাল হয়। তার মধ্যে সমস্ত জমিতে শেড দরকার হবে না। বয়লার ঘর নিয়ে মোট চার হাজার পাঁচশো স্কোয়ার ফিট জায়গা শেড দিলেই কাজ চলে যাবে। রোজ যদি ১·৫০ মেট্রিক টন করে উৎপাদন করা যায় তবে এই সব মেশিনগুলো লাগবেই। (১) বয়লার, (কয়লা চালিত) (২) নিউট্রালাইজার, (৩) টানেল ড্রায়ার, (৪) ভ্যাকিউয়াম ফিল্টারেশন, (৫) ফিল্টার প্রেস, (৬) ফিল্টার প্রেস ওয়াসিং টাইপ, (৭) সেটেলিং আউট ট্যাঙ্ক, (৮) ফিউসান কেটেল, (৯) কোয়েন চিং বাক্স, (১০) ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। এছাড়াও চাই সালফিউরিক এ্যাসিড রাখার ট্যাঙ্ক। তিন চারটি ছাড়া প্রায় সবগুলি মেসিন বিদ্যুৎ শক্তিতে চালিত হবে। তাই জল ও বিদ্যুৎ শক্তি যেখানে পাওয়া যাবে সেই রকম স্থানেই এই শিল্প গড়তে হবে।

সর্বশেষ যে বক্তব্যটি পাঠকের সামনে রাখছি তাহলো আমার সম্পূর্ণ নিজের কথা। দেশে বহু বেকার ইঞ্জিনীয়ার বসে আছেন। "বিটা ন্যাফথল" তৈরী করতে যা বিরাট খরচ তা বোধ হয় একলা কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। আবার কারও হয়তো ক্ষমতা থাকলে এত বিরাট টাকার ঝুকি নিতে সহসা মন চাইবে না তাই যদি প্রথমে নিজেদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট টাকার অঙ্ক শেয়ারের মাধ্যমে তুলে পরে ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণের কাছে টাকা নিয়েও শেয়ার বিক্রী করে কোঅপারেটিভের মাধ্যমে করা সম্ভব হয় একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

নাইট্রোবেনজিন

স্যার পি. সি রায় যখন বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার তখন আক্ষেপ করে একবার বলেছিলেন, "বাংলা দেশে এমন কেউ নেই, যে একটা নাইট্রো-বেনজিনের কারখানা গড়ে তুলতে পারে?" দেশ তখন ছিল বৃটিশের অধীনে। এরপর আমরা স্বাধীন হয়েছি। দীর্ঘ ছাব্বিশটা বছরকে পেছনে ফেলে আজও তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারিনি। যদিও নাইট্রেবেনজিন বৃহৎ শিল্পের

পর্যায়ে পড়ে, তবুও বিজ্ঞান সাধকের কথা স্মরণ করে পশ্চিমবাংলা সহ ভারতবর্ষে এই রসায়ন শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

নাইট্রোবেনজিনের বিপুল চাহিদার কথা বললে সবটা কিন্তু বলা হয় না। চাহিদা তো আছেই সেই সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় রসায়ন শিল্পে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সারা বছরে ভারতে প্রায় কুড়ি হাজার টনেরও বেশী নাইট্রোবেনজিনের দরকার হয়। আর আমাদের চাহিদার সবটাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় "স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনে"র মারফত। মোটামুটি ভাবে এটি তৈরী করার জন্য প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। যথা—(ক) কাঁচামাল, (খ) মেসিন পত্র, (গ) জমি, (ঘ) বিক্রয় বাজার, (ঙ) মূলধন।

(ক) **কাঁচামাল**—যদিও নাইট্রোবেনজিন নিজে একটি মূল্যবান রসায়ন কিন্তু তৈরী করতে মাত্র তিন রকমের কাঁচামাল লাগে। (১) বেনজিন (২) নাইট্রিক অ্যাসিড (৩) সালফিউরিক অ্যাসিড। এটা আনন্দের কথা সবকটি কাঁচামাল এখন ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে। প্রথমটি উৎপাদন করছেন দুর্গাপুর প্রজেক্ট ও হিন্দুস্থান স্টীল ও বাকী দুটি যথাক্রমে (কলকাতার অনেক ছোট কোম্পানী সমেত) বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্টি-লাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার সিঁন্দ্রি ইউনিট।

(খ) **মেসিন পত্র**—ঠিক প্রয়োজনমত মেসিন একেবারে সোজাসুজি বাজারে পাওয়া যায় না। তাই নিজের সুবিধামত কিছুটা অদল বদল করিয়ে নিতে হয়। এটা অবশ্য নির্ভর করে যিঁনি কারখানাটি করছেন তাঁর ইচ্ছের ওপর। কারণ রোজ কতখানি করে উৎপাদন হবে তার হিসেবটা জানা না থাকলে আগে থেকে সঠিক ভাবে কিছু বলা যায় না। তবে কি কি মেসিন লাগবে তার একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে। (১) নাইট্রেটার, (২) সেপারেটার, (৩) বয়লার (তেল বা কয়লা চালিত), (৪) গ্যাস অ্যাবসরবার, (৫) এ্যাসিড ট্যাঙ্ক, (৬) স্টীম ডিসটিলেশন সেট, (৭) ভ্যাকিউয়াম ডিসটিলেশন সেট প্রভৃতি। মোটামুটিভাবে এই সব মেসিন হোলেই কাজ চলে যাবে।

(গ) **জমি**—এটি কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে না, আবার বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্তও নয়। তবে মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব ছোট করে কোরলেও এর জন্য এক বিঘে জমি হলেই ভাল

হয়। সেই সঙ্গে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কারখানা যেখানে গড়ে উঠবে তার চারপাশ যেন একটু ফাঁকা থাকে ও জল নিকাশের ব্যবস্থার কোন অসুবিধা না ঘটে। অবশ্য এই এক বিঘে জমিতে শেড দিতে হবে না। কেবল কাঠা চারেক জমিতে টিনের বা টালির শেড দিলেই চলবে। আর একটা পাম্প ঘর করতে হবে; তার মাপ হবে "কুড়ি ফুট বাই পনের ফুট"। এই ঘরে মধ্যে নয় ফুট ছেড়ে দিয়ে পাঁচ ইঞ্চির একটা দেওয়াল তুলে দিলে এক ভাগে অফিস ঘর ও অন্যদিকে একটা ছোট্ট লেবরেটরী করা যাবে। কারণ একটা অফিস ঘর ও লেবরেটরী কারখানার মধ্যে দরকার।

(ঘ) **বিক্রয় বাজার**—আগেই এ নিয়ে খানিকটা আলোচনা হয়ে গেছে। তবুও সঠিকভাবে জানা থাকলে সোজাসুজি গিয়ে বিক্রয় বাজারে যোগাযোগ করার সুবিধা হয়। প্রায় সব বড় বড় রসায়ন শিল্পে, বিশেষ করে ডাইস স্টাফে পিগমেণ্টে, সলভেণ্ট হিসেবে ও রবার শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার। আবার অনেক প্রয়োজনীয় রসায়ন তৈরী করতে নাইট্রোবেনজিনের দরকার হয়। যথা—(১) বেনজিডিন, (২) মেটারনিলিক এ্যাসিড, (৩) অ্যানিলিন, (৪) ডাই মিথাইল অ্যানিলিন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঠিক কি রকম চাহিদা তা পাঠকের অনুমান করার সুবিধার জন্য ভারত সরকারের পরিচালনায় একটি সংস্থার সারা বছরের চাহিদার কথা জানাচ্ছি। গত ইং ৫-১০-৭০ তারিখের স্টেটসম্যান কাগজটি দেখলেই বোঝা যাবে। তাতে বছরে "নয় হাজার তিনশত" টন নাট্রোবেনজিনের জন্য ভারত সরকারের পরিচালনায় "হিন্দুস্থান অরগ্যানিক কেমিক্যাল লিঃ" টেণ্ডার আহ্বান করেছেন। আশা করি এর বেশী আর লেখার দরকার নেই। আবার নাইট্রোবেনজিনের "বাই প্রোডাক্ট" হিসেবে সোডিয়াম নাইট্রাইট একটি মূল্যবান রসায়ন। আজও বিদেশ থেকে সোডিয়াম নাট্রাইট আমাদের দেশে আসছে। অথচ নাইট্রো-বেনজিন তৈরী করলেই আর সামান্য খরচে ও একই মেসিনপত্রে সোডিয়াম নাইট্রাইট আমরা পেয়ে যাচ্ছি।

(ঙ) **মূলধন** - রোজ একটন করে উৎপাদন করতে গেলে প্রায় তিন লক্ষ টাকার ম'ত খরচ পড়বে। যদি ঠিক ভাবে চালাতে পারা যায় তবে খুব কম করে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়েও মাসে কুড়ি হাজার টাকার ম'ত লাভ হবেই। টাকা থাকলেও অনেকের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ অর্থভার একসাথে বহন করা সত্যাই অসুবিধাজনক। তবুও যদি কেউ নিজস্ব জমি ও মেসিন পত্রের টাকাটা

জোগাড় করতে পারেন তবে যে কোন রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাঙ্ক থেকে ঐ জমি, শেড ও মেসিন পত্র বন্ধক রেখে বাকী টাকাটা ঋণ হিসেবে নিশ্চয় পাবেন। যতদূর জানি অন্যান্য রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাঙ্ক থেকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সব থেকে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাঙ্ক বৃহৎ থেকে একেবারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারের জন্য বিশেষভাবে এগিয়ে আসছেন। তাই অন্য কোন ব্যাঙ্কে যাবার আগে অন্ততঃ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা অফিসে বা কলকাতার হেড অফিসে "অ্যাডভান্স ডিপাটমেণ্টের" যে কোন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে অনুরোধ করছি।

রবার ব্লোইং এজেণ্ট

আমদানী রসায়ন ভালকাসিন (বি, এন)-এর বিকল্প

শিল্পবহুল এই পশ্চিমবাংলা। এর বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ছোট বড় ও মাঝারি ধরনের কল-কারখানা। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন প্রদেশের লোক এসে ঐ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করছেন। আর আমরা নিজেদের অস্তিত্বটুকু ভুলে গিয়ে বড় বড় বুলিসার ফাঁকা রাজনৈতিক আন্দোলনের শিকার হয়ে হয় কেরানী, না হয় শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছি। আজ এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? আমার মনে হয় আমরা নিজেরা সাহস করে নিজে কিছু করার যে মনোবল তা হারিয়েছি অনেক দিন আগেই। ফলে, বাংলার আজ সব কিছু থেকেও সে সর্বহারার দলে মিশে গেছে। আমার এই লেখা পাঠ করে যদি পশ্চিমবাংলা সমেত অন্যান্য রাজ্য থেকেও অল্প কিছু লোক উৎসাহ পেয়ে নিজে সাহস করে কিছু করেন, তবেই জানব আমার এই লেখা সার্থক হয়েছে। এতে আর কিছু না হোক নিজেদের প্রয়োজন সময় ম'ত মিটবে, আর কিছু লোকেরও অন্নের সংস্থান হবে। থাক ওসব কথা। এবার আসাযাক আমদানি রসায়ন ভালকাসিন (বি, এন) কি?

আমরা যে হাউই চপ্পল পায়ে দিই, সাধারণত রবার থেকে প্রস্তুত হয়। কিন্তু নরম হয় কেন? ঐ ভালকাসিন (বি, এন) মেশানোর জন্য। ডানলোপপিলোর কথাই ধরা যাক। ঠিক ঐ জাতীয় জিনিষের প্রয়োজন হয়। মোট কথা রবারকে ফোলানোর জন্য এই বিশেষ জিনিসটির প্রয়োজন হয়।

দেশে এখন এর চাহিদা প্রচুর। সারা ভারতবর্ষে মাত্র একটি ফ্যাক্টরী আছে। সেটা কানপুরে। তার মাসে উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র "দু" মেট্রিক টন করে। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি আরও চার পাঁচটি কারখানা করা যায়, আর উৎপাদন ক্ষমতা ওর থেকে যদি দ্বিগুণ হয় তবেই কিছুটা চাহিদা মিটতে পারে। তাই বলছিলাম, যা কানপুরে গড়ে উঠেছে তা আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় কেন গড়ে উঠতে পারবে না, তাছাড়া বাটা, ডানলপ সমেত অসংখ্য ছোট-বড় রবারের কারখানা যখন এই দেশেই রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এ শিল্প শুধু দেশের চাহিদা মেটাবে না, দেবে সম্মান, বৃদ্ধি করবে বাংলার গৌরব। কারণ বিদেশের বাজার থেকে আমদানি করা ঐ রসায়নের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে রবার ব্লোইং এজেন্ট।

এই শিল্প গড়ে তুলতে মোট জমির প্রয়োজন হবে ১,৮০০ স্কোয়ার ফিট। আর সমস্ত জায়গাটায় শেড্ দিয়ে ঘিরতে হবে। যদি প্রতিমাসে দুই মেট্রিক টন করে উৎপাদন করতে হয় তবে আশি হাজার টাকার কাছাকাছি খরচ পড়ে যাবে। অবশ্য মেসিনারীতে লাগবে সত্তর হাজার টাকা, বাকীটা কাঁচামাল কেনার জন্য। গড়ে হিসেব করে দেখা গেছে ঐ কাঁচামাল কিনতে প্রতি মাসে লাগবে বার হাজার টাকা বা অল্প কিছু বেশী। এর মেসিন পত্র কিন্তু সোজাসুজি বাজারে পাওয়া যায় না। বিশেষ ভাবে অর্ডার দিয়ে না করালে হবে না।

এবার দেখা যাক কি কি মেসিন লাগে। (ক) একটি স্পেশাল টাইপের পালভারাইজার, (খ) সেন্ট্রিফিউজ একটি, (গ) স্পেশাল ড্রায়ার, (ঘ) ছোট বয়লার একটি, (তেল চালিত হলে ভাল হয়) ঙ) দুটি রাসায়নিক পরীক্ষাগার। বিদ্যুৎ শক্তি ও জল এই শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পাঠকের যাতে বুঝতে সুবিধে হয় তাই একটা হিসেব দিয়ে দিচ্ছি। যে-সব মেসিনের নাম উল্লেখ করা হলো, তাঁর জন্য বৈদ্যুতিক মটর লাগবে মোট ১৫—H. P। আর জলের দরকার হবে ৪০০ গ্যালন। অবশ্য এটা সামান্য কম বা বেশী হতে পারে।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে এটি একটি বিরাট শিল্প বলে মনে হবে। এক দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বিরাট বটে, কিন্তু যদি কাঁচামাল ও শিল্প পরিচালনার জন্য যে লোকের প্রয়োজন হবে তা ভাবতেই পারা যায় না। মাত্র তিন রকমের কাঁচামাল হলেই চলে যাবে। (১) হেকস্যামিন, (২) এ্যাসিড,

(৩) সোডিয়াম নাইট্রেট। এর মধ্যে ১নং ও ২নং কাঁচামাল ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়, আর তা অতি সহজেই। কেবল ৩নং মালটি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। অবশ্য আবেদন করলে ভারত সরকার তারজন্য লাইসেন্স দেন। এবার দেখুন কেবল সাতজন লোক হোলেই এই শিল্প চালু রাখা যায়। তার মধ্যে পাঁচজন শ্রমিক ও বাকী দু-জনের মধ্যে একজন কেমিষ্ট ও একজন সুপারভাইজার।

এবার পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই শিল্পের কতখানি আমাদের দেশে প্রয়োজন। তবু আজও দেশের মানুষ এগিয়ে আসেননি এই ধরনের শিল্প গড়তে। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এখনও এর উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় মূল্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি।

সেদিকে দিয়েও এর সমকক্ষ মেলা ভার। সমস্ত কিছু খরচ খরচা বাদ দিয়ে কেজি প্রতি এর উৎপাদন খরচ পড়ে আটটাকা আর বাজারে বিক্রয় হয় প্রতি কেজি পনের টাকা করে। এ সম্পর্কে আরও কিছু খবর পাঠকের জানার ইচ্ছে থাকে তবে বাটানগরে গিয়ে "বাটা সু কোম্পানী"তে একটু খোঁজ খবর করলেই আরও পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে। এছাড়াও কলকাতার বাইরে যাঁরা থাকেন তাঁরা Dunlop'ও যোগাযোগ করতে পারেন।

ATENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF RUBBER BLOWING AGENT 2 M. T./P. M.

A. Non-Recurring Expenditure Rs. 72,000/-

(1) Land 1800 sft

(2) Covered Area 1400 sft

Plant and Equipment Rs. 50,000/-

(1)	Reactor (low temp.)	Rs. 10,000/-
(2)	Special Drier	Rs. 20,000/-
(3)	Special Pulveriser	Rs. 17,000/-
(4)	S. S. Hydro extractor	Rs. 2,500/-
(5)	S. S. Sieves	Rs. 500/-
		Rs. 50,000/-

অ্যামোনিয়াম পার সালফেট

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় প্রত্যেকটি অনগ্রসর দেশের মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। আর সেইজন্য প্রয়োজন, কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক ও মূলধন। প্রথমটির পুরোপুরি অভাব না হলেও দ্বিতীয়টির অভাব আমরা মেটাতে পারিনি। বিশেষ করে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। তাই আজও বিদেশের বাজারে আমাদের হাত পেতে থাকতে হয় সামান্য জিনিষের প্রয়োজন মেটাতে। অথচ সম্পদের অভাব আমাদের নেই। কিন্তু দেশের স্বার্থে ঐ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে একবারও আমরা ভেবে দেখি না। এ দোষ অবশ্য সবটা আমাদের নয়। ঠিক এই বিষয়ে ভালভাবে নজর দিয়ে সরকারের তরফ থেকে কোন চেষ্টা হয়নি। তাঁরা কেবল অভাব মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করার অনুমতি পত্র দিয়েই হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। তাও আবার সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানোর জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুও ভেবে দেখেন না। ফলে কিছু অসাধু লোক অভাবের সুযোগ নিয়ে আরও কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দু-পয়সা মুনাফা করে নিচ্ছে। এই দুটি জিনিষের মাঝখানে পড়ে ভারতের রসায়ন শিল্পের বিশেষ একটা উন্নতি ঘটেনি। অ্যামোনিয়াম পার সালফেট ঠিক এই রকম একটি রসায়ন যার ব্যবহার অনেক, অথচ তৈরী করতে গেলে সবকটি কাঁচামাল সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা তুলে দিচ্ছি হয় পশ্চিম জারমানি না হয় ব্রিটেনকে এই রসায়নটি আমদানি করতে।

এবার দেখা যাক ঐ আমদানি রসায়নটি কি? অ্যামোনিয়াম পার সালফেট নামটা বিরাট হোলেও জিনিষটি অতি সাধারণ ধরনের। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এরসাথে আমাদের পরিচয় নেই বটে অথচ এমন অনেকগুলো শিল্প রয়েছে যা চালাতে গেলে অ্যামোনিয়াম পার সালফেট একান্তভাবে দরকার। দেখতে সাদা বা সামান্য হোল্‌দেটে, ঠিক বড় দানা চিনির ম'ত। ভাবতে অবাক লাগে বিদেশ থেকে আনতে প্রতি কেজি খরচ পড়ে জিনিসের গুণাগুণ অনুসারে আঠার টাকা থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত। আর ভারতবর্ষে যদি তৈরী করা যায় তবে খরচ পড়বে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা থেকে আট টাকা পর্য্যন্ত। অথচ কোয়ালিটির দিক থেকে দেশের উৎপন্ন জিনিষ কোন অংশে খারাপ হবে

না। এবার তাহলে ভেবে দেখুন কত বেশী টাকা দিয়ে সামান্য একটি জিনিষের অভাব আমাদের মেটাতে হচ্ছে।

চাহিদা সম্বন্ধে বলতে গেলে এটুকু বলা চলে যে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে এর চাহিদা, বিশেষ করে কয়েকটি বড় এবং ভারি শিল্পে। এমন কতকগুলি শিল্প ভারতে রয়েছে যা চালতে গেলে অ্যামোনিয়াম পার সালফেট একান্তভাবে দরকার। ঐ শিল্পগুলি যত বিস্তার লাভ করবে এর চাহিদা সেই অনুপাতে আরও বেড়ে যাবে। প্রধান চাহিদার মধ্যে (১) ব্লিচিং এজেন্ট হিসাবে, (২) অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবে, (৩) ফটোগ্রাফিতে, (৪) সিনথেটিক ফাইবার ওয়াশিংয়ে, (৫) ইলেকট্রো প্লেটিংয়ে, (৬) অ্যানেলিং ডাইতে, (৭) অয়েল ব্লিচিংয়ে, (৮) ব্যাটারী তৈরীতে, (৯) ট্রিটমেণ্ট অফ ইষ্টে। এ ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে এর ব্যবহার আছে। তবে সেগুলিতে খুব একটা বেশী পরিমাণে দরকার লাগে না। আবার সহজে পাওয়া যায় না বলে, অনেকে দ্বিগুন দাম দিয়ে কিনতে চান না, কারণ পড়তায় পোষায় না বলে। যদি সহজে পাওয়া যায় ও দামটা কম পড়ে তবে তাঁরাও নিশ্চয় ব্যবহার করবেন। এইভাবে চাহিদাও ধীরে ধীরে বেড়ে যাবে।

এই শিল্প গড়ে তুলতে মোট জমির প্রয়োজন হবে দুইশত স্কোয়ারফিট। অবশ্য এ সাথে সামান্য কিছুটা ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার। মোটামুটিভাবে এইখানে গড়ে কুড়ি কেজি থেকে বাইশ কেজি পর্যন্ত মাল তৈরী করা যাবে। এই পর্যায়ে উৎপাদন হার বজায় রাখতে গেলে প্রথম দিকে বসানোর খরচ সমেত লাগবে বাইশ হাজার টাকা বা সামান্য কিছু বেশী। আর প্রতি মাসে ফ্যাক্টারী চালাতে ও কাঁচামাল কিনতে খুব বেশী যদি টাকা লাগে তবে পাঁচ হাজরের উপরে যাবে না। মাত্র চারজন লোক লাগবে এটি চালু রাখতে। তবে মনে রাখতে হবে এই চারজন লোকে দৈনিক উৎপাদনের যে হারটা দেওয়া হোল সেটির ওপর হিসেব করে। এই চারজনের মধ্যে দু-জন সাধারণ শ্রমিক ও বাকী দু-জন ইলেকট্রিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ হওয়া চাই। আবার এর কাঁচামাল লাগে দু রকমের। (১) অ্যামোনিয়াম সালফেট, (২) সালফিউরিক এ্যাসিড। প্রথম কাঁচামালটি এখন প্রচুর ভাবে তৈরী করছেন ফার্টিলাইজার করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া। এর যে কোন একটি ইউনিটে গিয়ে খবরা খবর নিলেই জানতে পারা যাবে। আর দ্বিতীয় জিনিষটি কোথায় পাওয়া যাবে ও এক মেট্রিক টনের কত দাম লাগবে তা নিয়ে

আগে যে সব শিল্প বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাতেই লেখা হয়ে গেছে। একটু ভাল ভাবে দেখলেই পাঠক নিশ্চয় খুঁজে পাবেন।

আমার মনে হয় একটা সাধারণ ধারণা পাঠক নিশ্চয় করতে পেরেছেন। এখন এটা তৈরী করা কি ভাবে যেতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখানে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ সমস্ত প্রসেসটাই হবে ইলেক্‌ট্রোলিক প্রসেসে। এতে একদিকে কোয়ালিটি যেমন ভাল হবে. অন্যদিকে উৎপাদন খরচও অনেক কম পড়বে। তাই যেখানে এটি তৈরী করা হবে সেটা যেন একটু শহরের মধ্যে হয়। কারণ পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও জল এই তিনটি সুবিধা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। আর কারখানায় শেডের বদলে পাকা গাঁথুনির ঘর হলে ভাল হয়।

ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্ সিলিকা

এখনও পর্য্যন্ত যতগুলি রসায়ন ভারতবর্ষে আমদানী হয় তার মধ্যে ক্রম্যাটোগ্রাফিক সিলিকা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় রসায়ন। দেশে শিল্প ও বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে এর প্রয়োজন ততো বেড়ে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে আনতে কেজি প্রতি খরচ পড়ে ৫০ টাকার কাছাকাছি। আবার সময় সময় বাজার একটু টান থাকলে দু তিন হাত ঘুরে সেই মাল ৮০ টাকা থেকে ৯০ টাকা পর্য্যন্ত বাজারে দাম বেড়ে যায়। এটা অবশ্য ভারতীয় ব্যবসাদারদের বৈশিষ্ট। তবে যাই হোক ৫০ টাকার নিচে কোনদিন বাজারে বিক্রী হয় না।

দেখতে অনেকটা সাদা পাউডারের ম'ত। তবে পাউডারের থেকে আরও বেশী মিহি। ঠিক বিজ্ঞানের ভাষায় ৩৮০ মেশের কাছাকাছি। প্রথমে পলেথিনের ব্যাগে প্যাক্ করে পরে লোহার ড্রামে প্যাক্ করতে হয়। পলেথিনের ব্যাগে প্রথমে প্যাক্ করার প্রধান কারণ হাওয়া লাগলে খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ বাতাসের সঙ্গে যে সব জলকণা থাকে তা শুষে ফেলে। আরও একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। বর্ষাকালে চিনি বা খাবার লবণ যেমন খোলা জায়গায় রাখলে ভিজে উঠে, শেষে জল কেটে যায়। কারণ বাতাসের সঙ্গে যে সব জলকণা থাকে তা চিনি ও লবণ শুষে ফেলে। এটা ওদের ধর্ম। ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্-সিলিকা বাতাস থেকে জলকণা সম্পূর্ণ রূপে

শুষে নিতে পারে। এটাও ওর ধর্ম। অনেক সময় বাতাসের জল মুক্ত করতে ক্রম্যাটোগ্রাফিক্—সিলিকা ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এ ছাড়াও আরও অনেক ব্যবহার আছে। পরে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান ব্যবহারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

আমি যেটুকু জানি তা দিয়ে বলতে পারি ভারতবর্ষে এর একটিও কারখানা নেই। তবে গত অক্টোবর মাসে ইং ১৯৭০ সালে কলকাতার বাইরে দিনে ১০ কেজি থেকে ১৫ কেজি কেপ্যাসিটির একটি কারখানা হয়েছে। যেখানে কেবল পশ্চিম বাংলায় এর চারগুণ মাল দরকার সেখানে ঐ একটি কারখানা কতটুকু চাহিদা মেটাবে? এর সব থেকে ভাল বাজার বোম্বেতে। এক কথায় বলতে গেলে ভারতের বড় বড় শহরে যেখানে সরকারী বা বেসরকারী লেবরেটরী আছে সেখানে ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্ অ্যানালিসিস করতে গেলে দরকার লাগবেই। আর লাগে খাদ্য ও ঔষধ পরীক্ষা করতে, মহাকাশ গবেষনায়, পেট্রোলিয়াম তেল বিশুদ্ধ করতে, ক্যাটালিষ্ট হিসাবে পেট্রো কেমিক্যাল রিয়্যাক্শনে ও রবার শিল্পে। আরও অনেক ছোটখাট প্রয়োজনে এর ব্যবহার আছে। তবে যেগুলি বলা হ'ল সেগুলি প্রধান।

বাজারে কত দামে বিক্রী হয় তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়ে গেছে। তৈরী করতে গেলে সমস্ত খরচ খরচা ধরে নিয়ে প্রতি কেজি খরচ পড়ে ১৫ টাকা থেকে ১৬ টাকার মধ্যে। মাত্র দু-রকমের কাঁচা মাল লাগে এটি করার জন্য। (১) সোডিয়াম সিলিকেট, (২) স্যাল্ফিউরিক এ্যাসিড। স্যাল্ফিউরিক এ্যাসিড কোথায় পাওয়া যাবে তা নিয়ে অনেক আগেই আলোচনা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক সোডিয়াম সিলিকেট কোথায় পাওয়া যাবে। এটিও নতুন জিনিষ নয়। যাঁরা সাবান তৈরী করেন তাদের নিশ্চয় জানা আছে। তবুও জানিয়ে রাখি সোদা কেমিক্যাল্, হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন সমেত অনেক কোম্পানি আছে, তাঁরা প্রচুর পরিমানে উৎপাদন করছেন। তবে আমাদের লাগবে হোয়াইট্ ট্রান্স্পেরেণ্ট কোয়ালিটি আর এ্যাসিড হবে সি, পি, কোয়ালিটি। অর্থাৎ যাকে আমরা বলি কেমিক্যালি পিওর্।

রোজ যদি ২০ কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে মেসিন পত্র নিয়ে মোট খরচ পড়বে প্রায় পনের হাজার টাকার কাছাকাছি। আর এটি চালাতে প্রতি মাসে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা লাগবে। এখন দেখা যাক্ কি

আগে যে সব শিল্প বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাতেই লেখা হয়ে গেছে। একটু ভাল ভাবে দেখলেই পাঠক নিশ্চয় খুঁজে পাবেন।

আমার মনে হয় একটা সাধারণ ধারণা পাঠক নিশ্চয় করতে পেরেছেন। এখন এটা তৈরী করা কি ভাবে যেতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখানে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ সমস্ত প্রসেসটাই হবে ইলেক্ট্রোলিক প্রসেসে। এতে একদিকে কোয়ালিটি যেমন ভাল হবে. অন্যদিকে উৎপাদন খরচও অনেক কম পড়বে। তাই যেখানে এটি তৈরী করা হবে সেটা যেন একটু শহরের মধ্যে হয়। কারণ পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও জল এই তিনটি সুবিধা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। আর কারখানায় শেডের বদলে পাকা গাঁথুনির ঘর হলে ভাল হয়।

ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্ সিলিকা

এখনও পর্য্যন্ত যতগুলি রসায়ন ভারতবর্ষে আমদানী হয় তার মধ্যে ক্রম্যাটোগ্রাফিক্ সিলিকা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় রসায়ন। দেশে শিল্প ও বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে এর প্রয়োজন ততো বেড়ে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে আনতে কেজি প্রতি খরচ পড়ে ৫০ টাকার কাছাকাছি। আবার সময় সময় বাজার একটু টান থাকলে দু তিন হাত ঘুরে সেই মাল ৮০ টাকা থেকে ৯০ টাকা পর্য্যন্ত বাজারে দাম বেড়ে যায়। এটা অবশ্য ভারতীয় ব্যবসাদারদের বৈশিষ্ট। তবে যাই হোক ৫০ টাকার নিচে কোনদিন বাজারে বিক্রী হয় না।

দেখতে অনেকটা সাদা পাউডারের ম'ত। তবে পাউডারের থেকে আরও বেশী মিহি। ঠিক বিজ্ঞানের ভাষায় ৩৮০ মেশের কাছাকাছি। প্রথমে পলেথিনের ব্যাগে প্যাক্ করে পরে লোহার ড্রামে প্যাক্ করতে হয়। পলেথিনের ব্যাগে প্রথমে প্যাক্ করার প্রধান কারণ হাওয়া লাগলে খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ বাতাসের সঙ্গে যে সব জলকণা থাকে তা শুষে ফেলে। আরও একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। বর্ষাকালে চিনি বা খাবার লবণ যেমন খোলা জায়গায় রাখলে ভিজে উঠে, শেষে জল কেটে যায়। কারণ বাতাসের সঙ্গে যে সব জলকণা থাকে তা চিনি ও লবণ শুষে ফেলে। এটা ওদের ধর্ম। ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্-সিলিকা বাতাস থেকে জলকণা সম্পূর্ণ রূপে

শুষে নিতে পারে। এটাও ওর ধর্ম। অনেক সময় বাতাসের জল মুক্ত করতে ক্রম্যাটোগ্রাফিক্—সিলিকা ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এ ছাড়াও আরও অনেক ব্যবহার আছে। পরে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান ব্যবহারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

আমি যেটুকু জানি তা দিয়ে বলতে পারি ভারতবর্ষে এর একটিও কারখানা নেই। তবে গত অক্টোবর মাসে ইং ১৯৭০ সালে কলকাতার বাইরে দিনে ১০ কেজি থেকে ১৫ কেজি কেপ্যাসিটির একটি কারখানা হয়েছে। যেখানে কেবল পশ্চিম বাংলায় এর চারগুণ মাল দরকার সেখানে ঐ একটি কারখানা কতটুকু চাহিদা মেটাবে? এর সব থেকে ভাল বাজার বোম্বেতে। এক কথায় বলতে গেলে ভারতের বড় বড় শহরে যেখানে সরকারী বা বেসরকারী লেবরেটরী আছে সেখানে ক্রম্যাটোগ্র্যাফিক্ অ্যানালিসিস করতে গেলে দরকার লাগবেই। আর লাগে খাদ্য ও ঔষধ পরীক্ষা করতে, মহাকাশ গবেষনায়, পেট্রোলিয়াম তেল বিশুদ্ধ করতে, ক্যাটালিষ্ট হিসাবে পেট্রো কেমিক্যাল রিয়্যাক্‌শনে ও রবার শিল্পে। আরও অনেক ছোটখাট প্রয়োজনে এর ব্যবহার আছে। তবে যেগুলি বলা হ'ল সেগুলি প্রধান।

বাজারে কত দামে বিক্রী হয় তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়ে গেছে। তৈরী করতে গেলে সমস্ত খরচ খরচা ধরে নিয়ে প্রতি কেজি খরচ পড়ে ১৫ টাকা থেকে ১৬ টাকার মধ্যে। মাত্র দু-রকমের কাঁচা মাল লাগে এটি করার জন্য। (১) সোডিয়াম সিলিকেট, (২) স্যাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড। স্যাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড কোথায় পাওয়া যাবে তা নিয়ে অনেক আগেই আলোচনা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক সোডিয়াম সিলিকেট কোথায় পাওয়া যাবে। এটিও নতুন জিনিষ নয়। যাঁরা সাবান তৈরী করেন তাদের নিশ্চয় জানা আছে। তবুও জানিয়ে রাখি সোদা কেমিক্যাল্‌, হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন সমেত অনেক কোম্পানি আছে, তাঁরা প্রচুর পরিমানে উৎপাদন করছেন। তবে আমাদের লাগবে হোয়াইট্ ট্র্যান্‌স্‌পেরেণ্ট কোয়ালিটি আর এ্যাসিড হবে সি, পি, কোয়ালিটি। অর্থাৎ যাকে আমরা বলি কেমিক্যালি পিওর্।

রোজ যদি ২০ কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে মেসিন পত্র নিয়ে মোট খরচ পড়বে প্রায় পনের হাজার টাকার কাছাকাছি। আর এটি চালাতে প্রতি মাসে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা লাগবে। এখন দেখা যাক্ কি

কি মেসিন লাগবে। (১) ড্রায়ার, (২) এস্, এস্, ভ্যাট আটটি, (৩) এস্ এস্, ট্রে ২৫টি, (৪) বেবি রেমণ্ড মিল একটি। ১ নং মেসিনটি হবে ওপেন্, ২৫টি ট্রে যাতে ধরে সেই রকম কেপ্যাসিটির হবে। আর তিনশত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত তাপ ওঠা চাই। চার নং মেসিনটির দাম পড়বে চার হাজার টাকা। এটি আর কিছুই নয়। আমরা বাজারে যে গম পেশাই করার চাকি কল দেখি,-সেই জিনিষ। তবে একটু অদল বদল করিয়ে নিতে হয়। বাকি ২ নং ও ৩নং জিনিষগুলি যে কোন কারখানায় গেলেই তারা মাপ দেখে নিয়ে করে দিতে পারবেন। এ বিষয়ে হাওড়া অথবা লিলুয়ার যে কোন একটি বড় কারখানায় গিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

মেসিন ও কাঁচামাল সম্বন্ধে পাঠকের নিশ্চয় একটা ধারণা হয়ে গেছে। এই কারখানা করতে মোট জমির দরকার হবে ২ কাঠা। তবে তার মধ্যে এক কাঠায় শেড দিয়ে নিতে হবে। আর লোক লাগবে দু'জন। বিদ্যুৎ ও প্রচুর জল পাওয়ার যাতে ব্যবস্থা থাকে সেই রকম জায়গায় এই কারখানা করা উচিত। সেই সঙ্গে জল বেরিয়ে যাবারও ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার। সে রকম প্রয়োজন হলে গভীর নল কূপ বসিয়ে বৈদ্যুতিক মটরের সাহায্যে পাম্প করে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সোডিয়াম সিলিকেট ও এ্যাসিড মিশিয়ে যে জিনিষটি পাব সেটা বার ঘণ্টা বাদে প্রায় তিনদিন ধরে ধুতে হবে। এই ভাবে ধোওয়ার পর দেখতে হবে মালটি সম্পূর্ণ ভাবে এ্যাসিড মুক্ত হয়েছে কিনা। যদি এ্যাসিড মুক্ত হয়ে যায় তবে ভাল, তা না হলে আরও ১২ ঘণ্টা ধরে ধুতে হবে। তবে দেখা যায় তিন দিন ধরে ধোওয়ার পর আর তাতে কোন রকম এ্যাসিড থাকে না। এ্যাসিড সম্পূর্ণ ভাবে গেল কিনা তা দেখার একটা পদ্ধতি আছে। সাধারণ ভাবে তিন দিন বাদে জিবে একটু স্পর্শ করালেই বুঝতে পারা যায়। তবে একেবারে প্রথম দিকে, মানে এক দিন বা দুদিন বাদে ঐ ভাবে পরীক্ষা করা উচিত নয়। এতে জিব পুড়ে যেতে পারে।

এখন দেখা যাক ক্রম্যাটোগ্রাফিক্ সিলিকা কিভাবে তৈরী করা হয়। প্রথমে ১০০ গ্রাম সোডিয়াম সিলিকেটের সঙ্গে ১৫০ গ্রাম জল মিশিয়ে একটা আলাদা জায়গায় রেখে দিতে হবে। এরপর অন্য একটা পাত্রে ২৬ সি. সি. এ্যাসিড নিয়ে এর সাথে ৭৪ সিঃ সিঃ জল মেশাতে হবে। জল ও এ্যাসিড মেশাবার সময় একটু সাবধান হওয়া দরকার। প্রথমে ফরমুলা অনুসারে

এ্যাসিড মেপে নিয়ে একটা পাত্রে রাখতে হবে। এর পর পরিমাণ ম'ত জল নিয়ে এ্যাসিডে ধীরে ধীরে ঢালতে হবে। জল ও এ্যাসিড ভালভাবে মিশে গেলে, সোডিয়াম সিলিকেট মিশ্রিত জলে ঐ অ্যাসিড জল আস্তে আস্তে ঢালতে হবে। এই সময় খুব তাড়াতাড়ি নাড়তে হবে যেন জমে না যায়। এটিকে বলা যেতে পারে প্রথমপর্যায়ের কাজ।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে কাজ শুরু করার আগে ঐ মিশ্রনকে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা সময় দিতে হবে। এখন ঐ মিশ্রনকে দেখতে পাব তলায় একটা সাদা স্তর পড়েছে আর ওপরে জল রয়েছে। এবার কোন পাইপের সাহায্যে ক্রমাগত জল, ওর ওপরে ফেলে এ্যাসিড মুক্ত করতে হবে। সর্বশেষ একবার ডিসটিল্ড ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এ্যাসিড আছে কিনা, তা কি ভাবে পরীক্ষা করতে হবে আগেই আলোচনা করা হয়ে গেছে। ঘণ্টা দুই বাদে যখন সম্পূর্ণ থিতেয়ে যাবে তখন ওপরের জল আস্তে আস্তে ফেলে দিয়ে ট্রের মধ্যে ঢেলে দিয়ে ড্রায়ারে দিতে হবে। ড্রায়ারের উত্তাপ 0°C থেকে ধীরে ধীরে ১৫০°C—২০০°C পর্য্যন্ত উঠবে। যখন সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে তখন ড্রায়ার থেকে ট্রে বার করে নিয়ে রেমণ্ড মিলে ভাল ভাবে গুড়ো করে নিতে হবে। তা হলেই ক্রম্যাটোগ্রাফিক্ সিলিকা তৈরী হয়ে যাবে।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF CHROMATOGRAPHIC SILICA 10 kg/DAY

	Item	Detail	Amount
A.	Non-Recurring expenditure		Rs. 16,000/
1.	Land	3 cottahs	Rental/own
2.	Covered Area	600 sft.	" "
3.	Machinery And Equipment		Rs. 13,000/-
	Drier	Rs. 5,000/-	
	Distilled water Plant	Rs. 3,000/-	
	Wooden vats (6)	Rs. 1,500/-	
	Pulveriser	Rs. 2,500/-	
	S. S Tray (6)	Rs. 1000/-	
		Rs. 13,000/-	
4.	Installation charge	Rs. 500/-	
5.	Misc. Equipment & weighing Scale etc.	Rs. 500/-	
6.	Chemical Lab.	Rs. 500/-	
7.	Water & power line Connections	Rs. 1500/-	
		Rs. 3,000/-	

B. Recurring Expenditure/P.M. Rs 4,000/-

(i) **Raw materials** Rs. 2,500/-

Sodium silicate Rs. 1500/-

Acid Sulphuric Rs. 600/-

Misc. Chemicals Rs. 400/-

Rs. 2500/-

(ii) **Salaries & wages** Rs. 500/-

Chemist cum-Manager (1) Rs. 200/-

Workers (3) Rs. 300/-

(iii) Rents, Electricity, packing etc. Rs. 1000/-

Rs. 1,500/-

C. Anticipated Capital outlay A+B

Rs. 16,000/-+Rs. 12,000/-

Rs. 28,000/-

D. Tentative profit and Loss A/c P.A.

By sale of 3000 kg. of chromatographic Silica @ Rs. 30/kg.	Recurring Expenditure	Rs. 48,000/-
	Depreciation on Machinery @ 15% P.A. (on Rs 13,000/-)	Rs. 1,950/-
	Depreciation on other Non-Recurring heads @ 10% P.A. (on Rs. 3000/-)	Rs. 300/-
	Interest on Capital out lay @ 10% P.A. (on Rs. 28,000/-	Rs 2,800/-
	Profit (un taxed)	Rs. 36,950/-
Rs. 90,000/-		Rs. 90,000/-

থ্যালো—শাইনাইন—ব্লু

ভারতবর্ষে আমদানির তালিকায় যতগুলি রসায়ন আছে তারমধ্যে "থ্যালো—ব্লু" একটি মূল্যবান রসায়ন। তবে ভারতবর্ষে একেবারেই যে এর কারখানা নেই সে কথা বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হোল না। ক্ষুদ্র শিল্পের আকারে দুটি ফার্ম বোম্বেতে এটি তৈরী করছেন। কিন্তু সারা পূর্বাঞ্চল জুড়ে এর একটিও কারখানা নেই। যেখানে কলকাতায় প্রতিমাসে দু-মেট্রিক টন করে সব সময় চাহিদা রয়েছে সেখানে সারা ভারতবর্ষে কতটা চাহিদা হতে পারে একবার চিন্তা করে দেখুন। তাই দেশে উৎপাদন হলেও চাহিদা থেকেই যাচ্ছে। আর এই চাহিদা মেটাতে হচ্ছে কোটি কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা খরচ করে। এইখানেই কিন্তু শেষ নয়। সময়মত মাল না পাওয়ার ফলে ব্যবসায়ে অনেক সময় ক্ষতি হয়ে যায়।

যতগুলি ভাল ভাল শিল্প আছে, অর্থাৎ যেগুলি আমরা নিত্য ব্যবহার করি সেই ধরণের শিল্পে এটি একান্ত দরকার। সর্বপ্রথম নাম উল্লেখ করা যেতে পারে রং শিল্পে। আমরা যে লাল, নীল রং এর বৈদ্যুতিক বাতিগুলি দেখতে পাই তাতে বিশেষ করে নীল রং করার জন্য "থ্যালো—শাইনাইন—ব্লু" দরকার হয়। এছাড়া লাগে প্ল্যাষ্টিক্ শিল্পে, ও ছাপার কালী তৈরী করতে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যক্ষ ভাবে কয়েকটি শিল্পে এটি একান্ত দরকার। আবার রসায়নবিদগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই "থ্যালো—ব্লু" থেকে সবুজ রংও করা যায়। তাই এখন বলা যেতে পারে পরোক্ষভাবে অন্য একটি শিল্পেও এটির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

দশ থেকে বার কাঠার ম'ত জায়গার দরকার হয় এই শিল্পটি গড়তে। একটু ফাঁকা জায়গায় করতে পারলে ভাল হয়। কারণ তৈরী করার সময় একটা উগ্র গন্ধ বার হয়। কারখানার কাছাকাছি বসত বাড়ী থাকলে কিছুদিন বাদে হয়তো ঝামেলা হতে পারে। তাই প্রথম দিকেই একটু সাবধান হওয়া দরকার। যতখানি জায়গার কথা বলা হ'ল, সবটায় শেড দিতে পারলে ভাল হয়। কারণ মেসিনপত্র সমেত অন্যান্য জিনিষ রোদ ও জল থেকে বাঁচাতেই হবে। তাই ঘেরা জায়গা একটু বেশী থাকলেই ভাল।

রোজ যদি ত্রিশ কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে কেবল মেসিন কিনতে ও বসানোর খরচ নিয়ে পড়ে যাবে প্রায় ষাট হাজার টাকার কাছাকাছি। এর

থেকে আর কম টাকায় করা যাবে না। মেসিনের নামগুলোও দিয়ে দিচ্ছি (১) অয়েল হিটেড রিয়্যাক্টর, (২) ক্রুসিবল্, (৩) সল্‌ভেণ্ট্ রিকাভারি ইউনিট ওয়াশার, (৪) ফিল্টার প্রেস্, (৫) বলমিল, (৬) পালভারাইজার, (৭) ছাঁকুনি, (৮) কাঠের ভ্যাট প্রভৃতি। যদি আট ঘণ্টা হিসেবে এক শিফট করে চালান যায় তবে কম করে দশজন লোকের দরকার হবে। যদি এই হারে উৎপাদন রাখা যায় তবে প্রতি মাসে কাঁচামাল কেনার জন্য প্রায় আট হাজার টাকা লাগবে। এটা সময় সময় বাড়তে পারে, তবে দশ হাজারের বেশী কখনও হবে না। এর কারণ ইউরিয়াটা সময় সময় বাজারে পাওয়া যায় না বলে। বেশ কিছু দিন আগে হলে আরও অভাব ছিল। তখন জাপান থেকে আনতে হোত। এখন ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার ট্রম্বে ইউনিট তৈরী করছেন। তাই সারা বছরের মধ্যে দুই একটি মাস ছাড়া প্রায় সব সময়েই প্রচুর ভাবে পাওয়া যায়।

সমস্ত খরচ খরচা ধরে নিয়ে প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ পড়ে ৩০ টাকার মধ্যে। বাজারে বিক্রী হয় কেজি প্রতি ৫৫ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত দরে। পাঁচ টাকার তফাৎ হয় জিনিষের গুণাগুণ অনুসারে। জল ও বিদ্যুৎ শক্তি এই শিল্পে একান্ত ভাবে দরকার। উৎপাদনের যে হার দেওয়া হ'ল তাতে আট ঘণ্টায় জলের দরকার হবে প্রায় ৪০০ গ্যালন। আর মেসিন পত্র চালাতে সব সমেত মোটর ২০—H. P. দরকার হবে। তাই যেখানে কারখানা হবে সেখানে ঐ পরিমাণ যাতে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেটাও আগে থাকতে লক্ষ্য রাখা উচিত।

এখন দেখা যাক কি কি কাঁচামাল লাগে এটি তৈরী করতে। (১) থ্যালিক অ্যান্‌হাইড্রাইড, (২) সল্‌ভেণ্ট, (৩) ইউরিয়া, (৪) ক্যাট্যালিষ্ট। সবগুলি এখন ভারতে পাওয়া যাচ্ছে। কেবল ৩নং মালটি যোগাড় করার যা একটু অসুবিধা আছে। এ নিয়ে অবশ্য আমি আগেই আলোচনা করেছি। আরও একটা কথা পাঠকের জানা দরকার। কাঁচামাল থেকে আরম্ভ করে যখন বাজারে বিক্রীর জন্য ফিনিশ প্রডাক্ট্ হয়ে বেরিয়ে আসছে তখন প্রতিটি ধাপে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে। তা না হলে সমস্ত মাল খারাপ হয়ে যাবে। একটা মাঝারি ধরনের রসায়নিক পরীক্ষাগার ও অভিজ্ঞ রসায়নবিদ্ চাই। আমার মনে হয় কলকাতায় বা এর কাছাকাছি কোন জায়গায় এই শিল্পটি গড়লে বিক্রীর জন্য পশ্চিম বাংলার বাইরে কোথাও যেতে হবে না।

A TENTATIVE SCHEME ON THE MANUFACTURE OF THALO BLUE 20 kg./DAY

Non recurring expenditure Rs. 55,000/-

(1) Land 15 Cottahs—own/Rental

(2) Covered Area 600 sft " "

(3) *Machinery and Equipment* Rs. 40,000/-

Oil Heated Reactor

Crusible

Solvent Recovery Unit washer Type

Filter Press

Ball-Mill

Pulveriser

S. S Sieves

Wooden Vats

4.	Installation Charge	Rs. 3,000/-
5.	Misc. Equipment	Rs. 1,000/-
6.	Chemical Lab.	Rs. 3,000/-
7.	Water & Power line Connections	Rs. 6,000/-
8.	Furniture etc.	Rs. 2,000/-
		Rs. 55,000/-

B. *Recurring Expenditure/P.M,* Rs. 10,400/-

(1) Raw materials Rs. 6,000/-

Thalik Anhidrade

Solvent

Urea

Catalyst

Misc. chemicals.

(ii) *Salaries and wages* Rs. 2000/-

Chemist-Cum-Manager	(1)	Rs. 800/-
Supervisor	(1)	Rs. 400/-
Workers	(4)	Rs. 400/-
Office Assistants	(2)	Rs. 400/-
		Rs. 2000/-

(iii) Electricity/Fuel, Rents & Taxes Rs. 1,400/-

(iv) Packing etc. Rs. 1,000/-

C. Anticipated capital outlay A+B=(for – 3months)
=Rs. 55,000/-+Rs. 31,200/-
=Rs. 86,200/-
Say Rs. 87,500/-

D. Tentative profit and loss A/C P. A.

By sale of 4,800 kg. of Thalo Blue @ Rs. 40/- per kg.	Recurring expenditure Rs. 1,24,800/- Depreciation on Machinery @ 15%P. A (On Rs 40,000/-) Rs. 6,000/- Depreciation on other Non recurring heads @ 10% P. A. (on Rs. 32,000/-) Rs. 3,200/ Interest on Capital Out lay @ 10% P.A. (on Rs. 88,000/-) Rs. 8,800/- Profit (Un-Taxed) Rs. 49,200/-
মোট Rs. 1,92,000/-	Rs. 1,92 000/-

ক্ষুদ্র শিল্প—কাটিং অয়েল

আজ সকলেই একথা স্বীকার করবেন যে, কেবল শহরকে কেন্দ্র করে যদি বড় এবং মাঝারী শিল্প গড়ে ওঠে তবে তাতে দেশের মানুষের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসে না। শহরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে বা শহর থেকে কিছু দূরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে গ্রামের মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে শহরে এসে ভীড় করবে। এর ফলে সেখানকার কল-কারখানায় চাপ পড়বে ভীষণ। একথা যে কতখানি সত্য তা কলকাতার দিকে একটু তাকালেই বেশ ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। এর জন্য দায়ী আমরাই। দীর্ঘ বাইশ বছর পরেও এখনও বহু গ্রামের বিদ্যুতের মুখ পর্য্যন্ত দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তাই মনে হয়, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও গ্রাম বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু একটা পরিবর্তন দেখাতে পারে নি। তাই পাঠকের কাছে এমন একটি ক্ষুদ্র শিল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যাতে কোন বৈদ্যুতিক শক্তির দরকার হয় না। আগের লেখা শিল্পগুলির তুলনায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় অনেক কম। ঠিক এইরকম ক্ষুদ্র শিল্প কাটিং অয়েল।

এবার আসাযাক কাটিং অয়েল কি? অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, প্রায় প্রত্যেকটি বড় বড় কারখানায় বিশেষ করে যেখানে লোহা কাটার কাজ হচ্ছে সেখানে দুধের ম'ত একপ্রকার তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ঐ সাদা তরল পদার্থের নাম কাটিং অয়েল, বা চলতি কথায় লোহা কাটা তেল। অবশ্য কাটিং অয়েল দেখতে ঘন বাদামী রংয়ের। কিন্তু ব্যবহার করার সময় জল মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। আর ঐ জল মেশানোর ফলে সাদা হয়ে ওঠে।

সাধারণভাবে কাটিং অয়েল তৈরী করতে গেলে জমি দরকার হবে প্রায় এক কাঠার কাছাকাছি। তবে সমস্ত জায়গাটা শেড দিয়ে নিতে হবে। যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁরা চারপাশে কাদার গাঁথুনি দিয়ে ঘিরে নিতে পারেন। অবশ্য প্রথম দিকে বেশী খরচ না করাই ভাল। আর একজন মাত্র শ্রমিক হলেই কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে। যদি খালি জায়গা না পাওয়া যায় তবে একখানা ঘর খালি পেলেও হবে।

এখন দেখা যাক মোট কত টাকা প্রথম দিকে খরচ করলে প্রতি মাসে লাভের পরিমাণটা কি রকম দাঁড়াবে। প্রথমেই বলে রাখি এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে, যিনি এটি উৎপাদন করবেন তাঁর ওপর। কারণ এতে "ব্লক ক্যাপিটেলের" বিশেষ একটা দরকার হয় না। দুটো বড় দেখে ঢালাই করা লোহার কড়াই ও দুটি বড় দেখে খুন্তি। কড়ায়ের দাম পড়বে, (অবশ্য কলকাতা থেকে কিনতে পারলে) ১২০'০০ টাকার মধ্যে, কিছু বেশীও লাগতে পারে। এখন যে পরিমাণ কাঁচামাল কেনা হবে সেই রকম উৎপাদন হবে। তবে একসঙ্গে একটু বেশী করে কাঁচামাল কিনলে দামে বেশ সুবিধা হয়। তাতে উৎপাদন খরচাও কমে যায়। যদি রোজ ত্রিশ কেজির ম'ত উৎপাদন করা যায় তবে মাসে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে "নেট প্রফিট" দাঁড়াবে প্রায় আটশো থেকে হাজার টাকার কাছাকাছি। এর জন্য কাঁচামাল কিনতে খরচ পড়বে ৬০০'০০ টাকা থেকে ৮০০'০০ টাকার ভেতর। অবশ্য যদি দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা আরও একটু কমিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ কুড়ি কেজি করে করা যায় তবে মাসে চার-পাঁচশো টাকা গড়ে লাভ থাকবেই। কারণ প্রতি কেজিতে এর উৎপাদন খরচা হয় এক টাকা ত্রিশ পয়সার কাছাকাছি আর বাজারে বিক্রয় হয় প্রতি কেজি "দু" টাকা পঞ্চাশ পয়সা বা সামান্য কিছু বেশী। বাজারে CALTEX কোম্পানি যে কোয়ালিটি কাটিং অয়েল বিক্রী করেন ঠিক সেই কোয়ালিটি কাটিং অয়েল তৈরী করতে যে সব কাঁচামাল দরকার হয় তার একটা তালিকা দিয়ে দিচ্ছি।

(১) ক্যাস্টর অয়েল, (২) রোজিন, (৩) কষ্টিক সোডা, (৪) ট্রাই-এথিনল-অ্যামিন, (৫) অলেয়িক এ্যাসিড, (৬) ব্যাচিং অয়েল, (৭) পাইন অয়েল। এই সব কাঁচামাল কলকাতার চীনাবাজারে বা বাগরী মার্কেটে অতি সহজেই পাওয়া যাবে। কেবল ক্যাস্টর অয়েল কেনার সময় বড়বাজারে যাঁরা তেলের পাইকারী ব্যবসা করেন তাঁদের কাছ থেকে কেনা ভাল। ক্যাস্টর অয়েল রিফাইন কোয়ালিটি না হলেও চলবে। আর অলেয়িক এ্যাসিড ক্যালকাটা কেমিক্যাল থেকে কেনা যায়। কারণ ক্যালকাটা কেমিক্যাল খুব ভাল তৈরী করে। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, যদি ট্রাইএথিনল—অ্যামিন—ওলিয়েট, নিজেরা তৈরী করে নিতে পারা যায় তবে উৎপাদন খরচ আরও অনেকটা কমিয়ে আনা যায়।

এটা তৈরী করার বিষয়ে বলতে গেলে এটুকু বলাচলে, যে ভাবে

ফিনাইল তৈরী হয় এও ঠিক সেই ভাবে তৈরী হবে। প্রথমে ক্যাস্টর অয়েল, রোজিন, ও কষ্টিক সোডা দিয়ে সাবান করে নিতে হয়। এরপর পরিমাণ ম'ত জল ও ব্যাচিং অয়েল মিশিয়ে দিলেই কাটিং অয়েল হয়ে গেল।

মনে হয় কাটিং অয়েল সম্বন্ধে একটা ধারণা পাঠককে দিতে পেরেছি। তবু অনেকের মনে এর চাহিদা ও বাজার সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে পারে। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে এর চাহিদা, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে। তবে পশ্চিম বাংলায় ও পাঞ্জাবে এর চাহিদা খুব বেশী। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি, যত দিন যাবে চাহিদা আরও বেড়ে যাবে।

কাটিং অয়েল তৈরী করার ফরমুলা

ক্যাস্টর অয়েল—	৩০ গ্রাম
রোজিন—	৭০ গ্রাম
কষ্টিক সোডা—	১৬ গ্রাম
জল—	৭৫ সি, সি

দ্বিতীয় পর্য্যায়

ট্রাই এথিলিন অ্যামিন ওলিয়েট—	২৪ গ্রাম
ব্যাচিং অয়েল—	৩২৫ সি, সি

শিল মোহর (গালা)

একশত টাকা মূলধন নিয়ে গ্রামে বা শহর অঞ্চলে এই ব্যবসা আরম্ভ করা যেতে পারে। আর লাভও থাকে যথেষ্ট। তাই অল্প মূলধনের যতগুলি ব্যবসা আছে তারমধ্যে শিল মোহর করার গালা একটি ভাল ব্যবসা। মাঝারি সাইজের লোহার কড়াই একটি, ও পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সাইজের ১০০টি কাঠের ছাঁচ হলেই চলে যাবে।

এখন দেখা যাক কি কি জিনিষ লাগে এটি তৈরী করতে ? (১) শেলাক ওয়াক্স, (২) রজন, (৩) টারপেনটাইন অয়েল ও (৪) রং।

গালা জিনিষটি কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এক প্রকার গাছের আঠা। পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়াতে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। এটির সঙ্গে শতকরা ছয় ভাগ হিসাবে মোম মিশিয়ে শেলাক ওয়াক্স তৈরী করা হয়।

রজনও বাজারে অনেক রকমের পাওয়া যায়। তবে শিলিং ওয়াক্স তৈরী করার সময় এন্-গ্রেড্ রজন ব্যবহার করা ভাল। কারণ এতে ময়লার ভাগ অনেক কম থাকে। আর টারপেনটাইন ১নং হলেই ভাল হয়। ঘোর লাল বা গোলাপি এর মধ্যে যে কোন একটি রং ব্যবহার করা চলে। আলতার প্রসঙ্গে রঙ এর বিষয় নিয়ে বিষদভাবে লেখা হয়ে গেছে। প্রয়োজন মনে করলে পাঠক এটি দেখে নিতে পারবেন।

ফরমূলা—

রজন	২ গ্রাম
শেলাক ওয়াক্স	৮ গ্রাম
টারপেনটাইন অয়েল	২০ সি. সি.
রং	১ গ্রাম

তৈরী করার নিয়ম। প্রথমে শেলাক ওয়াক্স ও রজন লোহার কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে উনানে চাপিয়ে দিতে হবে। ঐ দুটি জিনিষ যখন সম্পূর্ণ গলে যাবে তখন কড়াই নামিয়ে নিয়ে রং ও টারপেনটাইন ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে ছাঁচে ঢেলে দিলেই শিলিং ওয়াক্স তৈরী হয়ে যাবে।

এয়ার—পিউরিফায়ার

নামটা বিদেশী হলেও সম্পূর্ণ দেশী প্রথায় ও ভারতবর্ষেই এটি তৈরী হচ্ছে। বেশ কয়েক মাস আগে পশ্চিম বাংলার বড় বড় শহরে অবশ্য কলকাতাকে ধরে নিয়ে এটি প্রথম দেখা গেল। আমরা সাধারণতঃ ঘরে যে ধুপ কাঠি জ্বালি এটিও ঠিক ঐ ধরণের। ধুপ বাতি জ্বালাতে আগুণের দরকার হয়, তবেই গন্ধ বার হয়। কিন্তু এটির জন্য কোন রকম আগুন জ্বালাবার দরকার হয় না। নিজের থেকেই সু-গন্ধ বার হয়। আরও দু তিনটি কাজ এয়ার-পিউরিফায়ারে হয়। (১) দুর্গন্ধ ময় বাতাসকে সুগন্ধ যুক্ত করে (২) মশার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

এসব কথা জানার পর অনেকেই হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন এত টাকা খরচ করে এয়ার-পিউরিফায়ার কেনার কি দরকার? ঘরেতে অল্প পরিমানে ভাল আতর অথবা সেণ্ট দিলেই তো কাজ চলে যাবে। আমার প্রশ্ন হ'ল সে গন্ধ কদিন থাকবে? মাত্র দু-দিন কি তিন দিন বাদেই সমস্ত গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এয়ার-পিউরিফায়ার প্রায় দুই-থেকে তিন মাস ঘরেতে থাকবে।

দেখতে সাদা ও সু পলিসের কৌটার ম'ত গোল, আর মোটা ঐ রকমই হবে। বেশ শক্ত-হয়। একটি আধারের মধ্যে রাখতে হয়। মজার জিনিষ হ'ল, গন্ধ বার হবার সঙ্গে সঙ্গে এয়ার-পিউরিফায়ার একটু একটু করে খইতে আরম্ভ করে। শেষে কেবল কাগজের আধারটি পড়ে থাকে, বাকী সব উপে যায়। এখন তা হলে বুঝতে পারা গেল এমন জিনিষ দিয়ে এটি তৈরী, যা সহজে বাতাসের সঙ্গে উপে যেতে পারে। পশ্চিম বাংলার বা কলকাতায় এখনও কেউ এ জিনিষ তৈরী করেন নি। কেবল বোম্বের একটি কোম্পানি এটি তৈরী করছেন। এক পিসের এখানে দাম পড়ে ২'৫০ পঃ। বিভিন্ন ধরণের গন্ধ যুক্ত এয়ার পিউরিফায়ার বাজারে পাওয়া যায়। যদি কেউ এটি করতে উৎসাহ পেয়ে থাকেন তবে বাজার থেকে এক পিস কিনে নিয়ে এর আকার বা ওজন সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে পারেন।

একটু ভাল ভাবে চালাতে গেলে প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার কাছাকাছি খরচ পড়ে। একটা ছোট সাইজের ঘর পেলে এই শিল্প গড়তে পারা যায়। আর লোক লাগে মাত্র দু-জন। এর মধ্যে একজন Salesman কে ধরে নিয়ে। কোথায় এর ব্যবহার হয় তাও জানিয়ে দিচ্ছি। ঘরেতে, পাইখানায়, ও বড় বড় অফিসে অফিসারদের চেম্বারে এর প্রচলনটা খুব বেশী। একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে পশ্চিম বাংলায় ধূপের বিকল্প হিসাবে এই রকমের কারখানা প্রথম হবে। আর এর ব্যবহারটা অনেকে জেনে গেছেন বলে প্রচার করতে বিশেষ একটা অসুবিধা হবে না। প্রথম দিকে এটি যাঁরা তৈরী করবেন তাঁরা বেশ কয়েক বছর পশ্চিম বাংলা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যেও ভাল মার্কেট পাবেন। এটি তৈরী করতে যে সমস্ত জিনিষ দরকার হবে সেই সমস্ত জিনিষগুলির নাম ও ফরমূলা দিচ্ছি।

ফরমূলা ঃ—

ন্যাফ্থ্যালিন্	৮০ গ্রাম
পাইন অয়েল	৮ সি. সি
মাইক্র—ক্রিস্ট্যালাইন্—ওয়াক্স	৯ গ্রাম
ইয়ারা-ইয়ারা	১ গ্রাম
স্পাইক ল্যাভিণ্ডার	২ সি. সি
	১০০

প্রস্তুত প্রণালী—এয়ার-পিউরিফায়ার প্রস্তুত করতে হলে ওয়াটার বাথের সাহায্য গ্রহণ করা ভাল। প্রথমে ন্যাফ্থ্যালিন্‌কে গুঁড়া করে সম্পূর্ণ রূপে গলিয়ে নিতে হবে। এরপর মাইক্র-ক্রিস্ট্যালাইন্—ওয়াক্স, ইয়ারা-ইয়ারা ও পাইন অয়েল একত্রে ঐ গলিত ন্যাফ্থ্যালিন্‌য়ে ঢেলে দিতে হবে। সমস্ত জিনিষগুলো যখন ভালভাবে মিশে যাবে তখন ওয়াটার বাথ থেকে পাত্রটি নামিয়ে ঠিক ঠাণ্ডা হওয়ার মুখে স্পাইক ল্যাভিণ্ডার পরিমান ম'ত মিশ্রিত করে ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে।

এই জিনিষটি যিনি তৈরী করবেন তাঁর তিনটি জিনিষের প্রতি খেয়াল রাখা বিশেষ দরকার। (১) যে পাত্রটি ওয়াটার বাথে বসান হবে অর্থাৎ যাতে এয়ার-পিউরিউফায়ার তৈরী করা হচ্ছে সেই পাত্রটি যেন লোহার না হয়। সব থেকে ভাল হয় যদি ষ্টেনলেস্ ষ্টীলের হয়। তা নাহলে এনামেলের পাত্রও চলতে পারে। (২) ছাঁচে ঢালার পর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা দিয়ে ফেলতে হবে। নতুবা গন্ধ সব উপে যাবে। যদি কেউ ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেতে চান সেই কারণে একটি ছোট্ট স্কীম দিয়ে দিচ্ছি। ঐ স্কীম নিয়ে ব্যাঙ্কের কোথায় এবং কার সঙ্গে দেখা করতে হবে সে কথা আগেই আলোচনা হয়ে গেছে। পাঠক দেখে নিয়ে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। (৩) এয়ার-পিউরিউফায়ার বা ওডনিল নামটা কিন্তু দেওয়া চলবে না। আইনের দিক থেকে বাধা আছে। যে কোন একটি ভাল দেখে নাম দেওয়া চলতে পারে।

AIR—PURIFIER 50 Pcs./DAY

A. Non-recurring Expenditure — Rs. 2,500/

1. Land		2 Cottah own/Rental	
2. *Covered Area*		1 „ „ „	
3. *Machinery and Equipment*			Rs. 2,500/-
(*a*) S. S. Pan	1	Rs. 1,000/-	
(*b*) Iron Pan	1	Rs. 100/-	
(*c*) S. S Stirrer	2	Rs. 50/-	
(*d*) Weighing Scale	(1)	Rs. 350/-	
(*e*) Lab. Equipment		Rs. 200/-	
(*f*) Wooden Die		Rs. 600/-	
(*g*) Mugs, Tubs, Storage tanks etc.		Rs. 200/-	
		Rs. 2,500/-	

B. Recurring Expenditure P/M. Rs. 2,300/-

1. Raw Materials Rs. 1,500/-
   (a) Napthaline
   (b) Pine oil
   (c) Micro crystalline wax
   (d) Yeara-Yeara
   (e) Spike Lavender

2. Salaries & wages Rs. 730/-

(a) Worker	(2)	Rs.	180/-
(b) Salesman	(1)	Rs.	150/-
(c) Rents & Taxes		Rs.	100/-
(d) Packing		Rs.	300/-
		Rs.	730/-

Total Rs. 2,230/-
Ray Rs. 2,300-/

C. Anticipated Capital outlay = Non recurring + Recurring Expenditure for 3 months
Rs. 2,500/- + Rs. 6,900/-
= Rs. 9,400/-
Say Rs. 9,500/-

D. Tentative profit and Loss A/C P. A.

By sale of 18,000 Pcs. of Air-Purifier @ Rs. 2,00/Pcs.	Recurring Expenditure Rs. 27,600/-
	Depreciation on Machinery @ 15% P.A. (on Rs. 2,500/-) Rs. 375/-
	Interest on Capital out lay @ 10%P.A. (on Rs. 9,500/-) Rs. 950/-
	Profit (un-taxed) Rs. 7,075/-
Rs. 36,000/-	Rs. 36,000/-

মোমবাতি

যখন আমাদের দেশে বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না তখন প্রতি ঘরে রাত্রে হয় তেলের প্রদীপ না হয় মোমবাতি ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে সেই জায়গায় বৈদ্যুতিক বাতি স্থান দখল করে নিয়েছে। তবুও বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতের সকল সম্প্রদায় বারমাস মোমবাতি ব্যবহার করে থাকেন। বিভিন্ন সাইজের মোমবাতি বাজারে চলে। এটা নির্ভর করে ছাঁচের মাপ অনুসারে। সম্পূর্ণভাবে হাতে, কাঠের ছাঁচে তৈরী করা যায়। তবে তাতে একটু অসুবিধা আছে। মোমবাতির সূতা বা পলিতা ঠিক মাঝখানে দেওয়া যায় না। সেই কারণে একটি মেসিনের দরকার হয়। একটু ভাল দেখে অর্থাৎ লোহার ছাঁচ নিতে গেলে ৫,০০০ টাকা পড়ে যায়। অবশ্য অনেকদিন চলে। এর থেকেও একটু কম দামে ছাঁচের মেসিন হয়, সেটি মোটা টিনের পাতে তৈরী। এই মেসিনগুলিতে সূতা পরাতে খুব সুবিধা। ৩০ মিনিটের মধ্যে ১০০টি মোম বাতি তৈরী করা যায়। আমার মতে অল্প দামের তিন চারটি বিভিন্ন সাইজের মেসিন কেনা ভাল। তাতে সুবিধা হয় যে বাজারে সব রকম সাইজের মাল দিতে পারা যায়। তিনটি ফরমুলা এখানে দেওয়া হচ্ছে। ১নংটি ভাল কোয়ালিটির মাল তৈরী করা যাবে। আর ২নংটি মাঝারি কোয়ালিটির হবে। দামটাও অনেক কম পড়বে।

ফরমুলা—১

প্যারাফিন ওয়াক্স	৭০ গ্রাম
বীজ-ওয়াক্স	৫ গ্রাম
চর্ব্বি	২৫ গ্রাম
	১০০ গ্রাম

ফরমুলা—২

প্যারাফিন ওয়াক্স	৭০ গ্রাম
ষ্টিয়ারিক এ্যাসিড	৩০ গ্রাম
	১০০ গ্রাম

ফরমুলা—৩

প্যারাফিন ওয়াক্স (১৩৫°—১৪০°)	৫৫ গ্রাম
হাইড্রোজিনেটেড ভেজিটেবেল অয়েল	৪৫ গ্রাম
	১০০ গ্রাম

ফরমূলা জানার পর এবার যে প্রশ্নটি আসে তা হ'ল ছাঁচ। এই প্রসঙ্গে আগেই কিছু বলা হয়েছে। তবু কিছুটা আলোচনা করলে পাঠকের সুবিধে হবে। সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন বাজারে বিভিন্ন সাইজের মোমবাতি বিক্রী হয়। এটা নির্ভর করে ছাঁচের মাপ অনুসারে। সম্পূর্ণ হাতে তৈরী কাঠের ছাঁচেও তৈরী করা যায়। তবে তাতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। মোমবাতির সুতো বা পলতে ঠিক মাঝখানে দিতে পারা যায় না। সেই কারণে বাজার থেকে কিনতে হয়। প্রথম দিকে বাজারে আসতে গেলে খুব কম করে ছ' রকম ছাঁচের দরকার। এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী ছাঁচ যেমন হালকা হয় তেমনি দামের দিক থেকেও বেশ কম পড়ে। বিভিন্ন সাইজের ও একসঙ্গে যত বেশী করা যাবে তার ওপর নির্ভর করছে দাম।

একসঙ্গে যতগুলো তৈরী হবে	মোমবাতির বাজারে আনুমানিক মূল্য	মোমবাতির সাইজ	ছাঁচের দাম
৬৪	৪পঃ	৩'১/২" × ১/৪"	৯৫'০০
৫০	৫পঃ	৪" × ৫/১৬"	১১০'০০
৫০	৬পঃ	৫'১/২" × ৩/৮"	১২৫'০০
৩৬	২০পঃ	৭.১/৪" × ১/২"	১৫০'০০
২৪	২৫পঃ	৮" × ৫/৮"	২০০'০০
২৪	৪০পঃ	৯" × ৫/৮"	২২৫'০০

এই যে তালিকাটি দেওয়া হ'ল তার একমাত্র কারণ পাঠক যাতে ছাঁচ ও মোমবাতির সাইজ সহ দামের একটা ধারণা করতে পারেন। তবে আমার অনুরোধ, কোন মেসিন পত্র তৈরী করার কোম্পানীতে গিয়ে এই দরদাম নিয়ে তর্ক করবেন না। কারণ আজকাল বাজারের যা অবস্থা তাতে কোন জিনিষ এক সপ্তাহের জন্যেও একভাবে থাকে না। কাজেই ছাঁচের দাম অনুসারে কোথাও ২৫ টাকা থেকে আরম্ভ করে প্রায় ১০০ টাকা পর্যন্ত কম বা বেশী হতে পারে।

কিভাবে তৈরী করতে হবে

তৈরী করার বিষয়ে এইটুকু বলা চলতে পারে, একটি বড় দেখে লোহার কড়াই লাগবে। কারণ সমস্ত জিনিষ একসঙ্গে মিশিয়ে গালান দরকার। আর

ঐ গলিত মিশ্রনকে কড়াই থেকে তুলতে হাতার প্রয়োজন। ছাঁচে ঢালতে যাতে সুবিধে হয় সেই কারণে পলেথিনের অথবা এ্যালুমিনিয়ামের বড় মগ হলেই সবথেকে ভাল। আরও একটি বিষয়ে ভালভাবে নজর রাখা দরকার। যাতে মোম পুড়ে না যায়। যদি পুড়ে যায়, বা কড়ায়ের তলা ধরে যায় তবে বাতি খারাপ হয়ে যাবে ও যতগুলো বাতি তৈরী হবার কথা তার থেকে সংখ্যায় অনেক কমে যাবে। কাজেই উনানের আঁচ খুব ঢিমা হবে। যদি দেখা যায় যে আঁচ খুব বেশী রয়েছে তখন কড়াই নামিয়ে নিয়ে তবেই ছাঁচে ঢালা দরকার। আসল কথা, আঁচে যখন কড়াই থাকবে তখন যেন মোমে ফুট না ধরে। অনেকে অবার সামান্য হলুদ রং মিশিয়ে দেন। এতে বিশেষ কোন উপকার না পেলেও বাজারে বিক্রী করার সময় খানিকটা সুবিধে হয়। কারণ বীজ ওয়াক্স দেখতে সামান্য হলদে। কাজেই নকল রং করে বলা হয় মৌমাছির মোম বা বীজ ওয়াক্স মেশান হয়েছে। অর্থাৎ একেবারে খাঁটি জিনিষ। ঠিক ছাঁচে ঢালার আগেই রং মেশান হয়।

দাঁত মাজার পেস্ট

রোজ সকালে মুখ ধোয়ার সময় যেটি আমাদের ব্যবহার করতে হয় তা হ'ল দাঁত মাজার মাজন বা পেস্ট। বাজারে অনেক বড় বড় কোম্পানি রয়েছে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের মাজন বা পেস্ট তৈরী করে বাজারে চালাচ্ছেন। কিন্তু এই মাজন বা পেস্ট যদি কয়েকটি বিশেষ ধরণের দাঁতের রোগের উপযোগী করে তৈরী হয় তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম অর্জন করা যায়। খুব সহজে দাঁতের যে সমস্ত রোগগুলি দেখা যায় তা হ'ল, দাঁতের মাড়ি ফোলা, দাঁত ব্যথা করা প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। এখানে যে ফরমূলার উল্লেখ করা হচ্ছে, তাতে একদিকে যেমন দাঁত পরিষ্কার হবে আবার যে দুটি রোগের কথা বলা হ'ল সেগুলিও ভাল হয়ে যাবে। বড় করে করার আগে বাড়ীতে প্রথমে ছোট্ট একটি চার্জ করে দেখে নিতে পারা যায়।

কাঠা দেড়কের ম'ত জায়গা পেলে এই শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায়। তার মধ্যে মাত্র এককাঠা জায়গায় শেড্ দিলেই হবে। আবার যাদের খালি জায়গা নেই অথচ দুটি মাঝারি ঘর খালি পড়ে আছে, সেখানেও এই শিল্প গড়ে তোলার কোন অসুবিধা হয় না। তবে সামান্য বিদ্যুৎ শক্তির

প্রয়োজন হয়। আর দুই-থেকে তিনজন মাত্র লোক লাগে এই কারখানা চালাতে।

এবার দেখা যাক কি কি কাঁচামাল লাগে এটা তৈরী করতে। (১) প্রেসিপিটেড চক্, (২) পিপারমেণ্ট অয়েল, (৩) ট্রাগাকান্থ গঁদ (৪) নিউট্রাল সোপ পাউডার, (৫) গ্লিসারিণ, (৬) স্যাকারিণ, (৭) লবঙ্গের তেল। সমস্ত কাঁচামালগুলি কেমিক্যাল মার্কেটে পাওয়া যায়। কেবল একটি জিনিষ এখন পাওয়া খুব শক্ত। কারণ বাজারে দামটা বেশ চড়ে গেছে। সেটি ৭নং কাঁচামাল। তবে যদি একান্ত না পাওয়া যায় লাইট ম্যাগকার্ব ব্যবহার করা চলে। আবার ৩নং মালটির বদলে একটি কোম্পানি নতুন জিনিষ পেস্টে ব্যবহার করছেন। মাত্র ৫—৬ মাস আগে ব্যবহার শুরু হয়েছে। যারা পেস্ট এখন তৈরী করছেন তাঁরাই হয়তো জানেন না। নামটা জানিয়ে দিচ্ছি। সোডিয়াম—লরিল—সালফেট, একটি চার্জে অর্থাৎ যে ফরমুলা দেওয়া হচ্ছে তাতে ২% অর্থাৎ শতকরা হিসাবে ২ ভাগ ব্যবহার করতে হয়। এখানে বিভিন্ন কাঁচামাল নিয়ে আলোচনা করা হ'ল। এবার যিনি এই শিল্পটি গড়বেন একটা standard ঠিক করে নিয়ে তবেই বাজারে চালু করবেন।

রোজ যদি ১০ কেজি করে উৎপাদন করা যায় তবে দুটি মাত্র মেসিনে কাজ চলে যাবে। বসানোর খরচ সমেত পড়বে প্রথম মেসিনটি ৭,০০০ হাজার টাকা। নাম—প্রাগিং মিল বা পাগ মিল, তবে ষ্টেন-লেস-ষ্টীলের হওয়া দরকার। কেপ্যাসিটি হবে ২ ঘণ্টায় ১০ কেজি করে মাল তৈরী করতে পারবে। হিসেবটা দেওয়া হচ্ছে যদি এক শিফ্‌ট্‌ ৮ ঘণ্টা করে কারখানা চালান যায়। আর লাগবে টুথ্‌পেস্ট, টিউবে ভরার মেসিন। এটিরও দাম প্রায় ৬,০০০ হাজার টাকা পড়ে যাবে।

ফরমুলা—১

প্রেসিপিটেড চক্	৫০০ গ্রাম
পিপারমেণ্ট অয়েল	১'৫ সি.সি.
ট্রাগাকান্থ গঁদ	৫০ গ্রাম
নিউট্রাল সোপ পাউডার	৭৫ গ্রাম
গ্লিসারিণ	১০০ সি.সি.

ফরমুলা (২)

প্রেসিপিটেড চক্	৪৫০ গ্রাম
পিপারমেণ্ট অয়েল	১.৫ সি.সি.
ট্রাগাকান্থ গঁদ	৫০ গ্রাম
সোডিয়াম—লরিল—সালফেট	১৫ গ্রাম
লাইট—ম্যাগ—কার্বনেট	৫০ গ্রাম
লবঙ্গের তেল	২৫ ফোঁটা
স্যাকারিণ ট্যাবলেট	৪টি

এখানে দুটি ফরমূলা দেওয়া হ'ল। একই ধরনের কাঁচামাল দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তবে ২নং ফরমূলায় স্যাকারিণ ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে। ১নং ফরমূলাতেও দিতে পারা যায়। এর প্রধান কাজ সমস্ত পেস্টটিকে একটু মিষ্টি করা। ফরমূলায় যাই থাক, নিজেদের ঠিক করে নিয়ে দেখতে হবে যাতে বাজারে আর পাঁচটা কোম্পানীর সঙ্গে দাম ঠিক রেখে চালাতে পারা যায়। টুথপেস্ট যাতে থাকে, তার নাম "পেস্ট টিউব।" এটি কিন্তু বাজারে পাওয়া যাবে না। কলকাতায় তিনটি কোম্পানি তৈরী করেন। (১) Metal-box, (২) Indian Aluminium Company, (৩) Jewan Lal। এঁদের কাছে একসঙ্গে ২৫ থেকে ৫০ হাজার পিসের অর্ডার দিতে হয়। তা নাহলে ঐ সব কোম্পানী অর্ডার নিতে চায় না। বেশী মাল একসঙ্গে করতে দিলে দামের দিক থেকে একটু কম পড়ে।

কিভাবে তৈরী করা হবে?

ফরমূলায় যে সমস্ত কাঁচামালগুলি দেওয়া আছে, সবগুলিকে ভালভাবে ওজন করে নিয়ে ১নং মেসিনে দিয়ে দিতে হবে। কেবল গ্লিসারিণ প্রথমে অর্ধেকটি মিশিয়ে বাকী অর্ধেকটি আলাদা জায়গায় রেখে দিতে হবে। একঘণ্টা মেসিনে ভালভাবে মিশে যাবার পর ধীরে ধীরে বাকী গ্লিসারিণ মেশাতে হবে। যদি দেখা যায় ঠিক পেস্টের ম'ত হয়নি তবে আরও খানিকটা গ্লিসারিণ মেশাতে পারা যায়। টুথ পেস্ট তৈরী হয়ে গেলে ২নং মেসিনের সাহায্যে পেস্ট, টিউবে ভরে ফেলতে হবে। যদি কোন কারণে টিউবে ভরা না হয় তবে আলাদা

একটা কাচের পাত্রে অথবা এনামেলের পাত্রে ভালভাবে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। যদি খুলে রেখে দেওয়া যায় তবে পেস্টে ময়লা লেগে রং খারাপ হয়ে যেতে পারে অথবা ধুলা-বালি পড়ে দাঁত মাজার সময় অসুবিধা হতে পারে।

দাঁত মাজার মাজন

দাঁত মাজবার পেস্টের ম'ত মাজনেরও বিরাট চাহিদা রয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে শতকরা প্রায় ৬০ জন লোক মাজন বা ঐ জাতীয় কোন টুথ পাউডার ব্যবহার করেন। সামান্য জায়গা পেলেই এই শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায়। যাদের মাঝারি সাইজের একখানা খালি ঘর আছে সেখানেও কারখানা করা চলবে। তাছাড়া বাড়ীর ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে এই কাজে সাহায্য করতে পারে। কারণ এটা সম্পূর্ণ গৃহ শিল্পের পর্যায়ে পড়ছে।

ফরমুলা (১)

প্রেসিপিটেড চক	৫০০ গ্রাম
লাইট ম্যাগ কার্বনেট	৫০০ গ্রাম
ফিটকিরি	২০ গ্রাম
পিপারমেণ্ট অয়েল	৮ সি.সি.
স্যাকারিণ	৫ গ্রাম
কারমাইন রং	৫ গ্রাম

এই ফরমূলায় তৈরী মাজন খুব সাধারণ ধরণের হবে। আর খরচও কম পড়বে। প্রথমে ফিটকিরিকে ভাল ভাবে গুঁড়ো করে নিয়ে তারপর পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। শেষে একটা কলাই করা গামলা অথবা পলেথিনের কোন টবে সমস্ত জিনিষ একসঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে কৌটা অথবা শিশিতে প্যাক করে ফেলতে হবে। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে অনেকে ফিটকিরি সোজাসুজি ব্যবহার করেন। তবে আমার মতে সেটা না করাই ভাল। ফিটকিরিকে কোন লোহার চাটুতে ভেজে নিয়ে তারপর গুঁড়ো করে নিয়ে মাজনে ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে ফিটকিরি উত্তাপ পেলেই গলে গিয়ে গাঢ় আঠার ম'ত দেখাবে ও বড় বড় ফুট উঠতে থাকবে। শেষে এক সময় শুকিয়ে গিয়ে হাল্কা খৈ এর ম'ত হলেই নামিয়ে ফেলতে হবে। এরপর গুঁড়িয়ে ও শেষে ছেঁকে নিয়ে তবে মাজনে ব্যবহার করা চলবে।

ফরমুলা (২)

(১)	প্রেসিপিটেড চক্	৫০০ গ্রাম
(২)	লাইট ম্যাগ কার্বনেট	৫০০ গ্রাম
(৩)	ফিটকিরির খৈ	১২ গ্রাম
(৪)	অকর করাহা	১০ গ্রাম
(৫)	মাজুফল	১০ গ্রাম
(৬)	লবঙ্গ	১০ গ্রাম
(৭)	সোঁঠ	১০ গ্রাম
(৮)	গোলমরিচ	১০ গ্রাম
(৯)	কর্পূর	১০ গ্রাম
(১০)	সৈন্ধব লবণ	১০০ গ্রাম
(১১)	পিপারমেণ্ট অয়েল	৫ সি.সি

সাধারণ দাঁতের রোগ এই মাজনে নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে দাঁত সাদা ধপধপে হয়। পাওরিয়া, অকালে দাঁতনড়া, পুঁজপড়া, মাড়িফুলে ব্যথা করা ইত্যাদি রোগগুলো নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। ফিটকিরি আগের ম'ত ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করার পর কাজ করতে হবে। বাকী ৪নং থেকে ১০ নং পর্যন্ত সমস্ত জিনিষ ভালভাবে গুঁড়ো করে তারপর পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে হবে। তৈরী করার খরচ সামান্য বেশী পড়লেও এই মাজন বাজারে ছাড়লে যথেষ্ট সুনাম পাওয়া যাবে।

ফরমুলা—(৩)

প্রেসিপিটেড চক	৮০ গ্রাম
চীনেমাটি	২০ গ্রাম
নীমের পাতা (শুকনো)	১০ গ্রাম
পিপারমেণ্ট	৩ গ্রাম
কর্পূর	৩ গ্রাম
সবুজ রং	৫ গ্রাম

৩নং ফরমুলায় তৈরী হবে নীমের মাজন। বহুলোকের নীমের মাজনের প্রতি আলাদা একটা বিশ্বাস আছে। তাই বার মাসই এর চাহিদা রয়ে গেছে।

পাউডার জাতীয় জিনিষগুলো ছাড়া বাকী সমস্ত ভালভাবে গুঁড়ো করে নিয়ে সেই একই পদ্ধতিতে একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেই নীমের মাজন তৈরী হয়ে যাবে।

ফরমুলা—(৪)

প্রেসিপিটেড চক্	৬০ গ্রাম
লেকটোজ	৪০ গ্রাম
ক্রীম টার্টার	১০ গ্রাম
অয়েল রোজ	½ সি.সি
অয়েল জেরেনিয়ম	½ সি.সি
কার্বলিক এ্যাসিড (দানা)	২ গ্রাম
কারমাইন রং	১½ গ্রাম

ফরমূলা দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এর থেকে যে মাজন তৈরী করা হবে তাকে কার্বলিক মাজন বলা চলতে পারে। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে এই মাজন বিশেষ সাহায্য করে এ ছাড়াও দাঁতে পোকা লাগলে নিয়মিত এই মাজন ব্যবহার করলে নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। আগের মাজনগুলো যেভাবে তৈরী করতে বলা হয়েছে এটিও ঠিক একই ভাবে তৈরী করতে হবে।

ফরমুলা—(৫)

লবঙ্গ	১০ গ্রাম
মস্তগী	১০ গ্রাম
গোল মরিচ	১০ গ্রাম
শোঁঠ	১০ গ্রাম
কর্পূর কচুরী	১০ গ্রাম
সুগন্ধ বালা	১০ গ্রাম
জোয়ান	৩ গ্রাম
কর্পূর	৩ গ্রাম
ফিটকিরির খৈ	১০ গ্রাম
দারু চিনি	৫ গ্রাম
সাদা জিরে	১০ গ্রাম
চক্	১৫০ গ্রাম

এই মাজনকে বলা হয় দেশী মাজন। অথবা কবিরাজী মাজনও বলে বিক্রী করা চলে। রোজ ব্যবহার করলে দাঁতের কোন রোগ হয় না।

সুগন্ধি জল

সুগন্ধি জল বলতে গেলে আমরা দু-রকম জলকে বুঝি। (১) গোলাপ জল, (২) কেওড়া জল। বিভিন্ন জিনিষে ও সরবৎ তৈরী করতে একান্ত দরকার। এই দুটি সুগন্ধি জল দুভাবে তৈরী করা যায়। বিভিন্ন প্রকারের রসায়নিক গন্ধদ্রব্য ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটারে মিশিয়ে অথবা ফুলের পাপড়ী থেকে নির্যাস বার করে অর্থাৎ ষ্টীম ডিষ্টিলেশনের সাহায্যে। নকল গোলাপ জল অর্থাৎ বিভিন্ন সুগন্ধ মিশিয়ে তৈরী করার ফরমূলা।

এসেন্স অফ্ রোজ	৩ সি সি.
জেরেনিয়াম অয়েল	১ সি.সি.
রেক্‌টিফাইড স্পিরিট	১৬ সি.সি.

সমস্ত জিনিষগুলি একটি কাচের বোতলে ভালভাবে মিশিয়ে ৪-৫ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ৩০০ সি, সি. ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটারে ১.৫ সি. সি. এসেন্স অফ্ রোজ মিশ্রণ ঢেলে দিলেই নকল গোলাপ জল তৈরী হয়ে যাবে। ফরমূলায় জেরেনিয়াম অয়েল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। খরচ কম করতে হলে এই জিনিষটি বাদ দিয়ে তৈরী করতে পারা যায়। ভাগ একই রেখে এসেন্স অফ রোজের বদলে এসেন্স অফ কেওড়া ব্যবহার করে নকল কেওড়ার জল তৈরী করা যায়।

নকল কেওড়ার জল ও নকল গোলাপ জল কিভাবে তৈরী করা হয় তা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। এখন দেখা যাক কিভাবে আসল সুগন্ধি জল তৈরী করা হয়। আমি আগেই বলেছি ষ্টীম ডিষ্টিলেসনের সাহায্যে তৈরী করা সব থেকে ভাল উপায়। ভাল বলতে, জিনিষের গুণাগুণের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে দুটি ফরমূলা দিয়ে দিচ্ছি। ১নং ফরমূলায় গোলাপ জল তৈরী হবে। কিন্তু তৈরী করার পদ্ধতি সব সময় একই থাকবে।

ফরমূলা—(১)

গোলাপ ফুলের পাপড়ি	২ কেজি
জল	১ কেজি

ফরমূলা—(২)

কেওড়া ফুলের পাপড়ি	৩ কেজি
জল	১'৫০০০ গ্রাম

স্কুল বা কলেজের লেবরেটরীতে যে ভাবে ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার তৈরী করা হয়, অনেকটা সেইভাবে তৈরী করতে হবে। তবে কাচের জিনিষপত্রের বদলে লোহার পাত্র আর কাচের নলের বদলে তামার পাইপ ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে একটি লোহার কেটলিতে (যার সব দিক বন্ধ) সাধারণ জল দিয়ে তাপ দিতে হবে, অর্থাৎ জল ফুটে যাতে বাষ্প হয়। কেটলির সঙ্গে লাগান তামার পাইপের সাহায্যে ঐ বাষ্পকে অন্য একটি লোহার কেটলিতে নিয়ে যেতে হবে। ঐ কেটলিতে জল ও ফুলের পাপড়ি আগে থাকতে মিশিয়ে রাখতে হবে। ঐ বাষ্প পাপড়ি মিশ্রিত জলকে গরম করে অন্য একটি তামার পাইপের সাহায্যে বাষ্প মিশ্রিত গোলাপ বা কেওড়া জল জমা হবে। রোজ আট ঘণ্টা করে যদি চালান যায় তবে চার থেকে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে সুগন্ধি জল তৈরী করা যেতে পারে।

টাটকা ফুলের পাপড়ী থেকে প্রথম তিন, চার ঘণ্টায় যে জল পাওয়া যাবে ঐ জল আলাদা বোতলে সরিয়ে রেখে দিলে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। অনেকে গোলাপ বা কেওড়া নির্যাস বলে বাজারে বিক্রী করেন।

সেণ্টটেড্ হেয়ার অয়েল

কেশ তৈল উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গের একটি অতি পুরাতন কুটীর শিল্প বা গৃহ শিল্প। বাড়ির মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ করেও অবসর সময়ে রোজ ১০০ বোতল বা তারও বেশী কেশ তৈল উৎপাদন করতে পারেন। সুগন্ধ যুক্ত কেশ তৈল দু'টি ভাগে বিভক্ত। (১) কবিরাজী পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের দেশীয় উদ্ভিদ্ সহযোগে, (২) বৈজ্ঞানিক উপায়ে নকল সুগন্ধি বা এসেন্স সহযোগে। কবিরাজী মতে যে তেল তৈরী করা হয় তা যদি গুণাগুণের দিক থেকে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে শরীর এবং মাথার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যে তেল তৈরী করা হয় তা দেখতে এবং গন্ধের দিক দিয়ে খানিকটা ভাল হয় বটে তবে মাথা ও শরীরের দিক থেকে কোন উপকার পাওয়া যায়

না। সময় সময় দেখা যায় উগ্র-গন্ধে মাথা ধরে ও অকালে চুল পেকে যায়, না হয় ধীরে ধীরে উঠে যায়।

এই শিল্পে কি কি জিনিষ দরকার পড়ে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। (১) তেল, (২) গন্ধ দ্রব্য, (৩) শিশি, (৪) রং, (৫) লেবেল ও (৬) প্যাকিং।

(১) তেল—বিভিন্ন রকমের তেল দিয়ে হেয়ার অয়েল তৈরী করা যায়। তার মধ্যে কাস্টর অয়েল, কোকোনাট অয়েল, গ্রাউণ্ড-নাট-অয়েল তিল অয়েল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে আবার ভেজাল হিসাবে একটু দামে সস্তা, হোয়াইট অয়েল ব্যবহার করেন। যদি পড়তায় আসে ও বাজার ধরে যায় তবে আমার মতে ভেজাল মেশান উচিত নয়। হেয়ার অয়েল তৈরী করতে গেলে পরিষ্কার ও গন্ধমুক্ত তেল ব্যবহার করা দরকার। যদি দেখা যায় তেলে সামান্য খারাপ গন্ধ রয়েছে তবে পাঁচ কেজি তেলের সাথে প্রথমে দু-গ্রাম ইয়ারা-ইয়ারা ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। যদি তাতেও সামান্য গন্ধ থাকে তবে আরও এক গ্রাম ইয়ারা-ইয়ারা-মিশিয়ে দিলেই তেলের খারাপ গন্ধ একেবারেই চলে যাবে। ইয়ারা-ইয়ারা কলকাতার এজরা ষ্ট্রীটে যে কোন গন্ধ দ্রব্যের দোকানে পাওয়া যায়। দেখতে অনেকটা ভূষির ম'ত। বর্তমানে এর দাম খুব বেড়ে গেছে। এক কেজি ৩০ টাকা থেকে ৩৫ টাকায় বিক্রী হচ্ছে।

(২) গন্ধ দ্রব্য—প্রথমেই বলেছি হেয়ার অয়েলে সুগন্ধ করা হয় দু-রকম ভাবে, (১) দেশীয় উদ্ভিদ সহযোগে ও (২) নকল এসেন্স মিশ্রিত করে। বিভিন্ন তেলে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও এসেন্স মেশাতে হয় তাই আগে থাকতে কোন কম্পাউণ্ড দেওয়া সম্ভব নয়।

(৩) শিশি, লেবেল ও প্যাকিং—বাজারে সব সময় স্ট্যাণ্ডার্ড হেয়ার অয়েলের শিশি পাওয়া যায়। তবে এই তিনটি জিনিষ খুব আকর্ষণীয় হওয়া চাই। দু-রকম সাইজের শিশি ও বোতল মার্কেটে চলে। ১০০ মিঃ লিঃ মাপে, ছোট শিশি ও (২) ৪০০ মিঃ লিঃ মাপে বড় বোতল। প্রথমে এই ব্যবসা চালাতে গেলে ১০০ মিঃ লিঃ মাপে ছোট শিশিতে বিক্রী করা ভাল। পরে ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে ৪০০ মিঃ লিঃ মাপে বোতল বাজারে ছাড়া চলতে পারে।

(৪) রং—হেয়ার অয়েল সাধারণত দু-রকম রং-এর হয়। (১) ঘোর-লাল, (২) সবুজ রংএর। তবে ফিকে হলদে রংও বাজারে চলে। তেল তৈরী করার জন্য বিশেষ রং বাজারে পাওয়া যায়। তবে বেনেদের দোকানে রতন জোত নামে একরকম পাতা পাওয়া যায়। ঐ পাতাকে তেলের সঙ্গে যদি দুদিন ভিজিয়ে রাখা যায় তবে তেলের রং লাল হয়ে যায়। কেবলমাত্র কবিরাজী মতে এই রংটি করা যায়। অন্য রংগুলি কিন্তু হবে না।

আমলা তেল—(১)

কাস্টর অয়েল অথবা তিল অয়েল	২'৫০০ গ্রাম
শুকনো আমলকী গুঁড়ো	৩০০ গ্রাম
এসেন্স জেরেনিয়ম	৬ সি. সি.
মাস্ক টিংচার	৩ সি সি.

যে ফরমূলাটি দেওয়া হ'ল তা কবিরাজী মতে। এইভাবে প্রস্তুত তেল মাথার পক্ষে খুব ভাল কাজ করে। প্রথমে আমলকীকে অল্প গুঁড়ো করে নিয়ে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কাচের বোতলে ছিপি বন্ধ অবস্থায় ২০ থেকে ২৫ দিন রৌদ্রে রেখে দিতে হবে। এই অবস্থায় রোজ কম করে দুবার বোতলটি ঝাঁকানি দিতে হবে। এবার তেল মোটা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে সমস্ত গন্ধ দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে শিশিতে বা বোতলে বিক্রীর জন্য প্যাকে করা দরকার। এই তেলে সবুজ রং ছাড়া আর অন্য কোন রং চলে না। তাই যখন গন্ধ দ্রব্য মেশান হবে তখন রং মিশিয়ে দিতে হয়।

আমলা তেল—(২)

কোকোনাট অয়েল	২'৫০০ গ্রাম
আমলা এসেন্স	৫ সি. সি.
স্পাইক ল্যাভেণ্ডার	২০ ফোঁটা
অয়েল পম্পিয়া	১০ ফোঁটা
সবুজ রং	সামান্য

পদ্ধতি একই। তেলের সঙ্গে রং ও গন্ধদ্রব্যগুলি সব একসঙ্গে মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়লেই নকল আমলা তেল তৈরী হয়ে যাবে।

ক্যান্থারাইডিন-হেয়ার-অয়েল

কাস্টর অয়েল অথবা কোকোনাট-অয়েল	২.৫০০ গ্রাম
টিংচার ক্যান্থারাইডিন্	২০ সি. সি.
অয়েল ল্যাভেণ্ডার	২৫ ফোঁটা
রোজমেরী অয়েল	২০ ফোঁটা
জেরেনিয়ম অয়েল	১০ ফোঁটা

সবগুলি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রায় একমাস একটি বোতলে রেখে দিতে হবে। তবে প্রতিদিন বেশ কিছুক্ষণ নাড়া দরকার। শেষ কালে একটা কাপড়ে অথবা ফিল্টার পেপারে তেল ছেঁকে নিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

যে দু'টি তেলের ফরমূলা এখানে দেওয়া হ'ল তা বাজারে অনেক দিন ধরে চলে আসছে। তাছাড়া দুটি নামকরা কোম্পানি তেলগুলি তৈরী করছেন। তাই নতুন কোন কোম্পানি ঐ তেল নিয়ে বাজারে গেলে সহসা প্রতিষ্ঠা পাওয়া খুব শক্ত। তাই তৈরী করার পদ্ধতি একই রেখে একটি নতুন ধরনের গোলাপের গন্ধযুক্ত তেলের ফরমূলা দিচ্ছি। একেবারে নতুন অবস্থায় যাঁরা বাজারে নামবেন তাঁদের বিক্রী করতে সুবিধা হবে।

ফরমূলা—

কোকোনাট অয়েল	২.৫০০ গ্রাম
কাস্টর অয়েল	৫০০ গ্রাম
অয়েল জেসমিন	১০ সিঃ সিঃ
ভেনিলা অয়েল	৫ সিঃ সিঃ
এ্যাম্বার অয়েল	২ সিঃ সিঃ
রোজ অয়েল	২ সিঃ সিঃ
স্পাইক ল্যাভেণ্ডার	১ সিঃ সিঃ
লাল রং	সামান্য

কালি

আজকের দিনে লেখার কাজ কিছু করতে গেলে প্রথমেই ফাউণ্টেন পেনের কথা মনে আসে। কিন্তু শুধু পেনে তো লেখা যায় না, তাই পেনে লেখার কালিও চাই। পনের বা কুড়ি বছর আগে কিন্তু এই রকম ছিল না। তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র বা ছাত্রীদের মধ্যে ফাউণ্টেন পেনের ব্যবহার ছিল। বর্তমানে একেবারে নিচু ক্লাচের ছাত্র ছাত্রী থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকলেই লেখার জন্য ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করেন। কাজেই যত দিন যাচ্ছে পেনের কালির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে।

প্রয়োজন বা চাহিদা দেশে রয়েছে একথা হয়তো অনেকে মেনে নেবেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাঁরা আমায় করতে পারেন, বাজারে যখন নামকরা একটি কোম্পানি রয়েছে সেখানে একই ধরনের জিনিষ তৈরী করে বাজারে দাঁড়াতে পারা যাবে? কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু ঐ বিখ্যাত কোম্পানিটি যখন কালির কারখানা করেছিলেন তখন দু তিনটি দেশী কোম্পানি সমেত বিদেশী কোম্পানির কালি বাজারে চালু ছিল। সেই রকম অবস্থার মধ্যে ঐ কোম্পানি যদি দাঁড়াতে পারে, তবে নতুন কোন কোম্পানি কেন দাঁড়াতে পারবে না? অবশ্য আমি কোন তর্কের মধ্যে যেতে চাই না। নিছক আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটা কথা এসে গেল। কোন কিছু জিনিষ উৎপাদন করে তা বিক্রী করা মানেই দু পয়সা লাভ করা। বিশেষ করে কয়েকটি রসায়ন শিল্পে দেখা যায় যা উৎপাদন খরচ তার ডবল দামে বাজারে বিক্রী হচ্ছে। ফাউণ্টেন পেনের কালি এই রকম একটি লাভজনক ব্যবসা। যাঁরা সত্য সত্যই মাঝারি ধরণের একটি কারখানা করতে চান, তাঁরা হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে প্রথম দিকে শুরু করতে পারেন। যদি স্কুল কলেজে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে একটু ভালভাবে প্রচার করা যায় তবে ধীরে ধীরে একদিন প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় আসবে।

কালি জিনিষটি কি? এক কথায় বলতে গেলে জলের সঙ্গে রং গুলে যে জিনিষটি পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় কালি। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ গুণ, কালির মধ্যে থাকা দরকার। (১) দোয়াতের বা বোতলের তলাতে তলানী না জমে। (২) অনেকদিন একভাবে থাকার পর কালির ওপরে সর না পড়ে। (৩) এ্যাসিডের পরিমাণ এমন হওয়া দরকার যাতে নিবের কোন ক্ষতি না হয়। (৪) লেখার পর কালির রং যাতে খারাপ না হয়। সাধারণ ভাবে এই চারটি গুণ থাকলেই আমাদের কাজ চলে যাবে। কিন্তু রাজ্য

সরকার যখন তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য কালি ক্রয় করেন তখন ঐ চারটি গুণ ছাড়াও আরও একটি জিনিষ পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় তা কালির রং স্থায়ী কিনা। অর্থাৎ রৌদ্রে বা জলে কালির রং-এর বিশেষ একটা ক্ষতি না হয়। তাই এই কালিকে Govt. specification ink বলা হয়।

সাধারণভাবে তিন রকমের কালি তৈরী করা যায়। (১) পাউডার বা গুঁড়া কালি, (২) বড়ি বা ট্যাবলেট কালি, (৩) তরল আকারে দোয়াত বা বোতলের কালি। আবার এইগুলি বিভিন্ন রংএর হয়। বাজারে আজকাল ১নং ও ২নং কালির চাহিদা একেবারে নেই বললেই হয়। তাই তরল আকারে Royal Blue ও Blue Black এই দু-রকমের কালি বাজারে বিক্রী হয় বেশী। তাছাড়া ফাউণ্টেন পেনে ব্যবহারের জন্য দু-রকম কালি বিশেষভাবে উপযুক্ত। এবার দেখা যাক কালি তৈরী করতে গেলে কি কি জিনিষ লাগে। (১) ট্যানিক এ্যাসিড, (২) গ্যালিক এ্যাসিড, (৩) ফেরাস্ সালফেট, (৪) হাইড্রো—ক্লোরিক—এ্যাসিড, (৫) কার্বলিক এ্যাসিড, (৬) ইঙ্ক ব্লু, (৭) ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটার।

(১) ট্যানিক এ্যাসিড—কালি যাতে কেটে না যায় সেই কারণে ট্যানিক এ্যাসিড মেশাতে হয়। কালিতেও সামান্য কাল রং করতে সাহায্য করে। কলকাতার কেমিক্যাল মার্কেটে পাউডারের আকারে বিক্রী হয়।

(২) গ্যালিক এ্যাসিড—আগে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হ'ত। বর্তমানে স্বদেশেই পাওয়া যাচ্ছে। কালি তৈরী করতে যত রকমের জিনিষ লাগে তার মধ্যে গ্যালিক এ্যাসিডের দাম বেশী। কেবলমাত্র ফাউণ্টেন পেনের কালি তৈরী করার সময় ব্যবহার করা হয়। এটিও পাউডারের আকারে বিক্রী হয়। ট্যানিক এ্যাসিডের ম'ত এটিও কালীতে সামান্য কালো রং করতে সাহায্য করে। তবে দাম বেশী হওয়ার জন্য সামান্য পরিমাণে কালিতে ব্যবহার করা হয়।

(৩) ফেরাস সালফেট—এটিকে বাংলায় হীরাকস বলা হয়। ফিকে নীল রংয়ের ডেলার আকারে বাজারে বিক্রী হয়। আগের দিকে হীরাকস নিয়ে বিষদভাবে লেখা হয়ে গেছে। পাঠক ইচ্ছে করলে দেখে নিতে পারেন। কালিকে Permanent করতে গেলে এই জিনিষটি একান্তভাবে প্রয়োজন।

(৪+৫) হাইড্রো-ক্লোরিক-এ্যাসিড—কালির রং যাতে খারাপ না হয়ে যায় তাই নানা প্রকার এ্যাসিড মেশান হয়ে থাকে। এখানে একটি

এ্যাসিডের নাম দেওয়া হ'ল। অনেকে বোরিক এ্যাসিড, সালফিউরিক এ্যাসিড বা কার্বলিক এ্যাসিড মিশিয়ে থাকেন। তবে এখানে যে ফরমূলা দেওয়া হচ্ছে তাতে হাইড্রো-ক্লোরিক এ্যাসিড বা কার্বলিক এ্যাসিড, এই দু'টি একসঙ্গে দিলে ভাল হয়। জল মিশ্রিত এ্যাসিড দেওয়া উচিত নয়।

(৬) রং—কালি যে রংএর হবে সেই রং মেশাতে হয়। তবে ফাউণ্টেন পেনের কালির জন্য যে ফরমূলা দেওয়া হচ্ছে তাতে সলিবল—ব্লু অথবা ইঙ্ক ব্লু মেশাতে পারা যায়। আরও ২-৩টি ব্লু রং আছে, সেগুলি মেশান চলবে না। চাইনিজ ব্লু বা মেথিলিন ব্লু অন্য ফরমূলায় ব্যবহার করা হয়।

(৭) ডিস্‌টিল্ড-ওয়াটার—বড়ি কালি বা পাউডার কালি তৈরী করার সময় কলের জল বা কুয়ার জল ব্যবহার করা চলতে পারে। কিন্তু যখন ফাউণ্টেন পেনের কালি তৈরী করা হয় তখন ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার ছাড়া অন্য কোন জল ব্যবহার করা ঠিক নয়। তবে বর্ষাকালে কোন একটি কাচের পাত্রে বৃষ্টির জল ধরে রেখে কাজ চালাতে পারা যায়। যাঁরা বড় দেখে এই কারখানা করবেন তারা যদি ছোট দেখে একটি ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার তৈরী করার Plant করে নেন, তবে কালি তৈরী করার খরচ একটু কমে যেতে পারে।

ফরমূলা—১ (ফাউণ্টেন পেনের কালি)

ট্যানিক এ্যাসিড	১০ গ্রাম
গ্যালিক এ্যাসিড	২½ গ্রাম
ফেরাস সালফেট	৫ গ্রাম
হাইড্রো-ক্লোরিক-এ্যাসিড	৫ সি. সি.
কার্বলিক এ্যাসিড	১ সি. সি.
ইঙ্ক-ব্লু	৪-৫ গ্রাম

তৈরী করার নিয়ম

কালি তৈরী করার আগে একটি কথা জানা দরকার যে, যাতে কালি তৈরী করা হবে সেই সমস্ত পাত্রগুলি হয় কাচের না হয় এ্যানামেলের হবে। আবার তৈরী কালিও কাচের পাত্র, না হয় এ্যানামেলের পাত্রে

রাখতে হয়। প্রথমে একটি পাত্রে ২৫০ সি. সি. ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার সামান্য গরম করে নিয়ে তাতে ট্যানিক এ্যাসিড ও গ্যালিক এ্যাসিড একসঙ্গে মিশিয়ে একটা সলুশন করে রেখে দিতে হবে। এই কাজটিকে ধরা যাক প্রথম ভাগের কাজ।

দ্বিতীয় ভাগে, ২৫০ সিঃ সিঃ ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার গরম করে নিয়ে অন্য একটি পাত্রে ফেরাস সালফেট বা হীরাকস সলুশন করে নিতে হবে। যদি দেখা যায় যে ফেরাস সালফেট সলুশন সামান্য গোলাপি বা ঘোলা হয়েছে তবে ঐ সলুশনে ২-৩ ফোঁটা সালফিউরিক এ্যাসিড দিয়ে ঘোলাভাব পরিষ্কার করে নিতে পারা যায়।

তৃতীয় ভাগে ৫০ সি. সি. ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার গরম করে নিয়ে আলাদা একটি কাচের পাত্রে রং ভালভাবে গুলে ফেলতে হবে।

এবার একটি বড় পাত্রে ঐ তিনটি ভাগের জিনিষগুলি একসঙ্গে ঢেলে দিতে হবে ও ১৫ মিঃ ধরে নাড়া দরকার। এখন হাইড্রো-ক্লোরিক-এ্যাসিড মিশিয়ে ২৫০ সিঃ সিঃ জল দিয়ে আবার ১০ মিঃ নাড়া দরকার। সর্বশেষ কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে আরও ৫ মিঃ নাড়ার পর ২০০ সিঃ সিঃ জল মিশিয়ে দিলে কালি তৈরী হয়ে যাবে। এই অবস্থায় কিন্তু বোতলে বা দোয়াতে প্যাক্ করে বিক্রী করা উচিত নয়। কারণ এতে কালির গাদ বা ময়লা চলে আসতে পারে। তাই খুব কমকরে ২০ দিন বাদে ধীরে ধীরে ওপর থেকে সমস্ত কালি আলাদা করে নিয়ে তবেই বাজারে বিক্রীর জন্য ছাড়া উচিত।

ফরমুলা—২(Gov. Standard)

ট্যানিক এ্যাসিড	১১ গ্রাম
গ্যালিক এ্যাসিড	২'৮ গ্রাম
ফেরাস সালফেট	১২ গ্রাম
হাইড্রো-ক্লোরিক এ্যাসিড	৮'৫ গ্রাম
কার্বলিক এ্যাসিড	১ সি. সি.
ইঙ্ক ব্লু	৪-৫ গ্রাম

১ নং ফরমূলায় যে ভাবে কালি তৈরী করার কথা বলা হয়েছে ঠিক ঐ ভাবেই ২নং ফরমূলার কালি তৈরী করা যাবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে ইঙ্ক ব্লু ব্যবহার না করে ন্যাপ্‌থল ব্ল্যাক বা নিগ্রোসিন ব্যবহার করতে পারেন।

সস্তা দামের বোতল কালি

ফরমুলা—৩

গঁদ	৫ গ্রাম
ইঙ্ক ব্লু	৫ গ্রাম
বোরিক এ্যাসিড	২ গ্রাম
ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার	১০০০ সিঃ সিঃ

সমস্ত জিনিষগুলি ভালভাবে মিশিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিতে হবে। এবার অন্য একটি পাত্রে ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার সামান্য গরম করে ঐ মিশ্রণ ঢেলে ১০ থেকে ১৫ মিঃ নাড়ার পর ভালভাবে ঢেকে রাখতে হয়। এইভাবে ১০ দিন থাকার পর কালি ফিল্টার পেপারে ছেঁকে বাজারে বিক্রী করা যাবে। বোরিক এ্যাসিড থাকার ফলে এই কালি ফাউণ্টেন পেনে ব্যবহার করা চলবে না।

ফরমুলা—৪ (ষ্ট্যাম্প ইঙ্ক)

মেথিল ভায়োলেট	৮৫ গ্রাম
মেথিলিন ব্লু	১৫ গ্রাম
বোরিক এ্যাসিড	৫ গ্রাম
জল (বৃষ্টির)	৫০০ সিঃ সিঃ
গ্লিসারিণ	৪ কেজি

এই কালি বাজারে ২৫ অথবা ৩০ সিঃ সিঃ প্যাকিংয়ে বিক্রী হয়। আর যত রকমের কালি আছে তার মধ্যে এই কালি তৈরী করা সবচেয়ে সহজ। কাচের, এ্যানামেলের অথবা চিনা মাটির পাত্রে ফরমুলার মাপ অনুসারে জল গরম করে পরে মেথিল ভায়োলেট ও মেথিলিন ব্লু রং গুলে নিতে হবে। এবার অন্য একটি পাত্রে বোরিক এ্যাসিড ও গ্লিসারিণ মিশিয়ে রেখে আগের রং মিশ্রিত জলে ঢালা উচিত। এই ভাবে এক সপ্তাহ রাখার পর আগের ম'ত ওপর থেকে ধীরে ধীরে কালি অন্য একটি পাত্রে ঢেলে নিতে হয়। তলার গাদ এই ভাবে পৃথক করে শিশিতে বা বোতলে প্যাক্ করে বাজারে বিক্রী করা চলতে পারে।

সু-পলিস

যাঁরা চামড়ার জুতা পায়ে দেন, বুট পলিস বা সু পলিস তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন। সাধারণ ভাবে জুতাকে চকচকে করার জন্য এই পলিস লাগান হয়। এ ছাড়াও আরও কতকগুলি গুণ আছে যা জুতার পক্ষে একান্ত দরকার। (১) পলিস লাগাবার ফলে চামড়া নরম থাকবে, জল বা শিশিরে কোন ক্ষতি হবে না। (২) পলিস করার পর যেন জুতায় বেশী ধূলো না জমে, অর্থাৎ এমন দ্রব্য যেন মিশ্রিত না থাকে যা ধূলো ধরে রাখতে পারে। (৩) বুট পলিস এমন ভাবে প্রস্তুত করা উচিত যেন চামড়ার কোন ক্ষতি না হয়। (৪) পলিস লাগাবার পর কাপড় অথবা ব্রুশ দিয়ে সামান্য ঘসলে যেন ভাল গ্লেজ হয় বা চামড়ার উজ্জ্বলতা বাড়ে।

আমাদের দেশে এখন অনেকগুলি কোম্পানি সু-পালিস তৈরী করছেন। সবগুলি এখন প্রায় বাজারে চালু। দশ বার বছর আগেও এই সব পলিস বিদেশ থেকে আসত। তবুও বলতে পারা যায় আরও যদি দু-চারটি কোম্পানি বাজারে আসেন তবে তার থেকে নিশ্চয় কিছু করে খেতে পারবেন। কারণ এ ব্যবসায় লাভ খুব বেশী, আর মূলধনও লাগে সামান্য। মাত্র চার পাঁচশো টাকা নিয়েই প্রথম দিকে ভালভাবে চালাতে পারা যায়। ইচ্ছে করলে একজন মাত্র লোক রাখতে পারা যায়। তবে নিজে একটু খাটলে তাও দরকার পড়ে না।

কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পে যে সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন হয়, দেখা যায় বাজারে চলতি মালগুলি অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নয়। এমন কি তার থেকে উন্নত মানেরও হয়েছে। কিন্তু সে ব্যবসা উঠে যায় প্রচার বা এডভার্টাইজমেণ্ট করার ম'ত অর্থ থাকে না বলে। আজকের যুগ প্রচারের যুগ। যদি কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ভালভাবে প্রচারের মাধ্যমে বাজারে চালুকরা যায় তবে মাত্র এক বছরে সে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। তা বলে একথাও ঠিক নয় যে প্রতিষ্ঠা না পেলে একেবারে মার খেতে হবে। উৎসাহ থাকলে পরে ছোট খাট ব্যবসার মাধ্যমে একটা পরিবার পালন করার ম'ত আয় নিশ্চয় করা যায়। তবে তাতে নিষ্ঠা থাকা চাই।

সুপলিস তৈরী করার প্রধান কাঁচামালগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। (১) শেলাক ওয়াক্স, (২) বীজ্ ওয়াক্স, (৩) কার্নবা ওয়াক্স, (৪) হাড

প্যারাফিন, (৫) সল্‌ভেন্ট, (৬) রং। সবগুলি কেমিক্যাল মার্কেটে কিনতে পারা যায়। অবশ্য কলকাতার কথা এখানে বলা হচ্ছে।

১। শেলাক ওয়াক্স—দেখতে হলদে রংয়ের, ডেলার আকারে পাওয়া যায়। শতকরা হিসেবে ৬ ভাগ গালা থাকে আর বাকীটা মোম। এর প্রধান গুণ জল ও শিশির থেকে চামড়াকে রক্ষা করে।

২। বীজ ওয়াক্স—হলদে ও সাদা রংয়ের হয়। ডেলার আকারে হোলেও বেশ নরম। চলতি কথায় মৌমাছির মোম নামে পরিচিত। চামড়াকে নরম রাখা এর প্রধান কাজ।

৩। কারনবা ওয়াক্স—এই জিনিসটি আমাদের দেশে একেবারেই পাওয়া যায় না। যেটুকু হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। তাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ব্রেজিল দেশে একরকম গাছ আছে, দেখতে অনেকটা আমাদের তালগাছের ম'ত। তার থেকেই পাওয়া যায় কারনবা ওয়াক্স। জুতোকে চক্‌চকে করতে এটির প্রয়োজন হয়। পরিমানের বেশী কারনবা মেশালে চামড়ায় টান ধরে, ফলে কেটে যায় তাই পলিসে ব্যবহারের সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

আবার আসল কারনবার বদলে অনেকে আজকাল নকল কারনবা ব্যবহার করেন। ফলে কালির উৎপাদন খরচ অনেক কম পড়ে। কিন্তু আসল কারনবার ম'ত নকল কারনবা ব্যবহারে জুতোর পলিস সেরকম ভাল হয় না। ফরমূলা, ও কি করে প্রস্তুত করতে হয় তা পাঠককে জানিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছে করলে কাজে লাগাতে পারেন।

ফরমূলা

শেলাক্ ওয়াক্স	৮৫ গ্রাম
মৌমাছির মোম	১০ গ্রাম
ধুনা	৫ গ্রাম
	১০০ গ্রাম

একটি লোহার কড়ায়ে শেলাক্ ওয়াক্স ও মৌমাছির মোম দিয়ে গলিয়ে নিতে হবে। সম্পূর্ণ গলে গেলে কড়া নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হলে ধুনাগুলি ভালভাবে গুঁড়িয়ে নিয়ে ঐ কড়ায়ে ঢেলে দিতে হবে। বেশী গরম অবস্থায় ধুনা গুড়া দিলে উড়ে যেতে পারে, তাই একটু ঠাণ্ডা হলে দেওয়া ভাল। তবে

ঠাণ্ডা করার সময় বীজ ওয়াক্স ও শেলাক্ ওয়াক্স মিশ্রণ যেন জমে না যায়। সমস্ত ফেনা যখন মরে যাবে তখন গরম অবস্থাতেই একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে অন্য একটি পাত্রে ঢেলে রাখতে হবে। ঘণ্টা দুই বাদে যখন জমে যাবে তখন নকল কারনবা ওয়াক্সয়ের বদলে ব্যবহার করা চলতে পারে।

৪। হার্ডপ্যারাফিন—দেখতে একেবারে সাদা। মুদিখানার দোকানে মিছরির যে রকম চাক পাওয়া যায় সেই রকম ভাবে বাজারে বিক্রয় হয়। পালিস যাতে আঠার ম'ত না হয় অর্থাৎ ধূলো যাতে না বসতে পারে সেটাই হোল এর প্রধান কাজ।

৫। সল্‌ভেণ্ট—এই জিনিষটি বাড়ীতে তৈরী করে নিতে হয়। (১) টারপেনটাইন তেল, (২) নাইট্রোবনজিন। এই দুটি একটি কাচের বোতলে ভালভাবে মিশিয়ে নিয়ে কাজ করতে হয়। ভাগটাও দিয়ে দিচ্ছি। টারপেনটাইন তেল—১ নং ৯৯ সি. সি. ও নাইট্রোবেনজিন ১ সি. সি.। এই দুটির মিশ্রণ ঘটালেই সল্‌ভেণ্ট হয়ে যাবে। এর কাজ, সমস্ত পালিসকে নরম রাখে।

৬। রং—বাজারে বহু রকমের রং পাওয়া যায়। এর মধ্যে সচরাচর যে রংগুলি চলে তার নামগুলি দেওয়া হচ্ছে। **কালো রং করার জন্য** (১) ওয়াক্সোলাইন ব্লাক্—এন্ ডি (২) ওয়াক্সোলাইন নাইগ্রোসিন জি. এস.— (৩) ওয়াক্সোলাইন ব্লাক্ বি. এ. ল্যাম্পস্। **ডার্ক ব্রাউন রং করার জন্য—** (১) ওয়াক্সোলইন মেহগ্নি—এস্. এস্। **হলুদে রং করার জন্য**—(১) ওয়াক্সোলাইন ইওলো—আই, এস্।

কতকগুলি ফরমূলা দেওয়া হচ্ছে। যেটি সহজ ও দামের দিক থেকে কম বলে মনে হবে সেটি দিয়ে কাজ চালাতে পারেন।

১নং ফরমূলা

শেলাক ওয়াক্স	৬ গ্রাম
বীজ ওয়াক্স	২ গ্রাম
কারনবা ওয়াক্স	১ গ্রাম
হার্ড প্যারাফিন	১ গ্রাম
রং	১ গ্রাম
সল্‌ভেণ্ট	২৮ সি. সি.

২নং ফরমূলা

শেলাক ওয়াক্স	৪ গ্রাম
বীজ ওয়াক্স	২ গ্রাম
কারনবা ওয়াক্স	২ গ্রাম
হার্ড প্যারাফিন	২ গ্রাম
রং	১ গ্রাম
সলভেণ্ট	২৮ সি. সি.

৩নং ফরমূলা

শেলাক ওয়াক্স	৪ গ্রাম
বীজ ওয়াক্স	১ গ্রাম
কারনবা ওয়াক্স	২ গ্রাম
হার্ড প্যারাফিন	৩ গ্রাম
রং	১ গ্রাম
সল্‌ভেণ্ট	২৮ সি. সি.

৪নং ফরমূলা

শেলাক ওয়াক্স	২ গ্রাম
বীজ ওয়াক্স	২ গ্রাম
কারনবা ওয়াক্স	৩ গ্রাম
হার্ড প্যারাফিন	৩ গ্রাম
রং	১ গ্রাম
সল্‌ভেণ্ট	২৮ সি. সি.

তৈরী করার পদ্ধতি :

সল্‌ভেণ্ট ও রং বাদ দিয়ে বাকী জিনিষগুলি ফরমূলা অনুসারে ওজন করে নিয়ে ওয়াটার বাথে একসঙ্গে গালিয়ে নিতে হবে। এবার অর্ধেক সল্‌ভেণ্টয়ের সঙ্গে সমস্ত রং ভালভাবে মিশিয়ে ঐ কড়ায়ে ঢেলে দিয়ে মেশাবার সময় নাড়তে হবে। এবার কডাই নামিয়ে নিয়ে বাকী অর্ধেক সল্‌ভেণ্ট মিশিয়ে দিলেই সু-পালিশ তৈরী হয়ে যাবে। আরও সুবিধা হয় সু-পালিসের কৌটাগুলি যদি সাজিয়ে রাখা যায় তবে গরম কড়াই নামিয়ে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে একটি হাতার সাহায্যে ঐ কৌটাগুলিতে ঢেলে দেওয়া যায় তবে খরচ কম পড়ে ও পালিসের ওপরের অংশ চক্‌চকে থাকে।

রং শিল্প

১৯০২ সালের কথা। পশ্চিমবাংলার হাওড়া জেলায় গোয়াবেরিয়াতে প্রথম রং-এর কারখানা স্থাপন করা হোল। নাম, শালিমার পেইণ্ট কলার ভার্নিসেস কোম্পানি লিমিটেড। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত এই একটি মাত্র কারখানা ভারতের চাহিদা মেটাতে লাগল। দেশের চাহিদা যত বাড়তে লাগল কারখানার সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়তে লাগল। ১৯৭০ সালে সর্বশেষ হিসেবে দেখা যায় এই সংখ্যা ছোট এবং বড় কোম্পানি মিলিয়ে দাঁড়াল প্রায় ২২৫টির কাছাকাছি।

যদিও ১৯০২ সালে ভারতবর্ষে একটি বিদেশী কোম্পানি রংএর কারখানা স্থাপন করে ছিল তবুও ভারতবর্ষের মানুষ প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে এর ব্যবহার জানত। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় যে সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছি তার থেকে জানতে পারা যায় যে সে সময়ও রঙ এর প্রচলন ছিল। রং শিল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তার আগের ইতিহাস আলোচনা করার অর্থ হোল পাঠক বা যিনি এই শিল্পটি করবেন একটা ভাল ধারণা যাতে হয় এবং সবকিছু ভাল ভাবে জেনে শুনে যাতে আরও উন্নত ভাবে শিল্পটি চালাতে পারেন।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে রং হয় তিন রকমের। (১) জল রং, (২) তেল রং, (৩) বার্নিশ। বিভিন্ন বর্ণের পিগমেণ্ট থেকে বিভিন্ন রং তৈরী করা হয়। পিগমেণ্ট হচ্ছে রং। ধরা যাক লাল রং তৈরী করতে হবে। এখন লাল বর্ণের পিগমেণ্টকে রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট তরলে মিশিয়ে একটি মণ্ড তৈরী করতে হবে। পরে ঐ মণ্ডকে আরও একটু পাতলা করে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই জল রং হয়ে যাবে।

রঙ-এর প্রধান কাজ, যে বস্তুর গায়ে লাগান হয় তার উপর একটি আবরণ সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে রোদ, জল ও অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে ঐ বস্তুটিকে রক্ষা করা। অবশ্য এর কার্য্যকারিতা খুব একটা বেশী দিন থাকে না। তিন চার বছর বাদেই আবার ঐ বস্তুটির গায়ে রঙ লাগাতে হয়।

মোটামুটিভাবে রঙ তৈরীর কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে পিগমেণ্টকে তরল মাধ্যমে মিশিয়ে একটা মণ্ড তৈরী করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ মণ্ডকে আরও ভালভাবে মেসিনের সাহায্যে মেশাতে হবে ও পাতলা নরম করতে হবে। এরপর পরিমাণ ম'ত রং মিশিয়ে বর্ণ Standard

করা হয়। সর্বশেষ মেসিনের সাহায্যে ময়লা পরিষ্কার করে আসল রঙ বার করে নিতে হবে। মোটামুটিভাবে এই রকম ধাপে ধাপে রঙ তৈয়ারী হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়।

মাঝারি আকারে একটি রঙ-এর কারখানা গড়তে গেলে প্রায় এক লাখ টাকার কাছাকাছি খরচ পড়ে যাবে। আর জায়গা লাগবে এক বিঘে। বার থেকে পনের কাঠার ম'ত জায়গায় শেড় দিতে হবে। কম করে গোটা কুড়ি জন লোক লাগবেই। যদিও বিক্রীর বাজারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা রয়েছে তবুও বলা যায় সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে মাসে পাঁচ হাজার টাকা লাভ থাকবেই।

যে সমস্ত মেসিনগুলি না হলে কাজ চলবে না তাদের নাম দেওয়া হচ্ছে: (১) এস্, এস্ ট্যাঙ্ক, (২) ফিলট্রেশন, মেসিন, (৩) বল মিল, (৪) ট্রিপল রোল মেসিন, (৫) সিংগল রোল মেসিন, (৬) রি-অ্যাক্শন্-কেটল প্রভৃতি। মোটামুটিভাবে এই কটি মেসিন হলেই কাজ চালাতে পারা যাবে।

বিদ্যুৎ শক্তি এ শিল্পে একান্তভাবে দরকার। কারণ যে সমস্ত মেসিনগুলির নাম উল্লেখ করা গেল প্রায় সবগুলিকে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চালাতে হবে।

শেষ করার আগে কয়েকটি তথ্য জানান বিশেষ প্রয়োজন। রঙ এর ব্যবহার আজকাল ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। মোটামুটিভাবে জানালা দরজায়, মটর গাড়ীতে, ঘরের দেওয়ালে ব্যবহার করা হয়। তাই বড় বড় কোম্পানি-গুলি রঙ তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধরণের কাজের জন্য উপযোগী করে রং তৈরী করেছেন। ফলে সাধারণ বাজারে রং তো বিক্রী হচ্ছে সেই সঙ্গে বিশেষ গুণ থাকার ফলে আলাদাভাবে চাহিদার সৃষ্টি করতে পারছেন। তাই এই শিল্পটি যাঁরা গড়বেন আমার কথাগুলি ভেবে দেখতে পারেন।

জর্দা শিল্প

বাজারে অনেক প্রকারের জর্দা পাওয়া যায়। তারমধ্যে (১) পাতা জর্দা ও (২) গুলি জর্দা প্রধান। অনেকে আজকাল নানা ধরণের রং ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে চালাচ্ছেন, অথচ ফরমূলা ও অন্যান্য জিনিষ প্রায় একই থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এর যথেষ্ট ভাল বাজার রয়েছে। বিশেষ করে

পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যায় পানের সঙ্গে জর্দার বদলে দোক্তা বা গুণ্ডি ব্যবহার করেন, তবুও একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে এখনও ক্ষুদ্র শিল্পের আকারে কিছু জর্দার কারখানা চালান যেতে পারে। শহরেই যে এই শিল্প গড়তে হবে তার কোন মানে নেই। শহরে, আধা শহরে, এমন কি গ্রামের মধ্যেও এই কারখানা করা চলতে পারে।

সব থেকে বড় কথা এই শিল্প গড়তে গেলে বিদ্যুৎ শক্তি, জল, বা কোন মেসিন পত্রের দরকার হয় না। সত্যি কথা বলতে কি জর্দার ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। ১০০ টাকার মাল উৎপন্ন করলে দেখা যায় প্রায় ১০০ টাকাই লাভ থাকে। খুব ছোট্ট করে করলে প্রথমে ৫০০ টাকা নিয়ে আরম্ভ করতে পারা যায়। অবশ্য আরও একটু বেশী টাকা নিয়ে আরম্ভ করতে পারলে ভাল হয়। একটু বড় করে কারখানা করলে তিন জন মাত্র লোক লাগবে। আর যদি একেবারে ছোট করে করা হয় তবে দু জন লোক হলেই হবে। একখানি মাঝারি সাইজের ঘর হলেই যথেষ্ট। জিনিষ পত্রের মধ্যে লাগবে দুটি কলাইয়ের গামলা ও বড় কাচের জার দশ বারটি। কারণ জর্দা তৈরী হয়ে গেল কাচের জারে ভালভাবে বন্ধ করে না রাখলে গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে।

এবার আলোচনা করা যাক জর্দা তৈরী করতে কি কি জিনিষ লাগে। (১) তামাক পাতা—বাজারে যে বিড়ি বিক্রী হয় তার ভেতর যে তামাক থাকে ঐ তামাক পাতা জর্দা তৈরী করতে দরকার হয়। এর মধ্যে মতিহারী তামাক সবথেকে ভাল, তবে হিংলী তামাকেও কাজ চলে যাবে। মতিহারীর তামাক পাতা খুব কড়া তাই বাজার ধরার সময় অর্থাৎ প্রথম দিকে মতিহারীর তামাক পাতা দিয়ে কাজ করা ভাল। (২) গন্ধদ্রব্য—তামাক পাতার সঙ্গে ভাল সুগন্ধ মেশান জর্দা বাজারে চালু করার পক্ষে একটি বিশেষ অঙ্গ। সাধারণ ভাবে সিনামন লিফ্—অয়েল, লবঙ্গের তেল, জেসমিন, রোজ, মাস্ক, অটো কেওড়া, অটো হেনা ও নখের চুয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইগুলি কোথায় পাওয়া যাবে তা নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে লেখা হয়ে গেছে। (৩) ওরক—এটির কাজ জর্দার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা। মিষ্টির দোকানেও সন্দেশে এর ব্যবহার হয়। একে রংতা পাতা বা রৌপ্যপাত বলা হয়। পশ্চিম বাংলায় এর কারখানা নেই বললেই চলে। উত্তর প্রদেশের বারাণসী লক্ষ্নৌতে এর অনেকগুলি ছোট

বড় কারখানা আছে। (৪) গ্লিসারিণ—খুব অল্পই লাগে। জর্দার পাতাকে নরম করার জন্য ও নরম রাখার জন্য গ্লিসারিণ ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ওরক বা রৌপ্যপাত, গ্লিসারিণ না থাকলে ঠিকমত জর্দায় মিশবে না। (৫) কেশর—দেখতে লাল অথবা কমলা লেবু রঙ-এর কাছাকাছি। সরু সুতোর ম'ত, খেতে সামান্য ঝাল লাগে। কাশ্মীর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় কেশর উৎপন্ন হয়। অনেকে আবার একে জাফরাণ বলে থাকেন। বর্ত্তমান বাজারে অনেক নকল কেশর পাওয়া যায়। দাম প্রচুর সস্তা। জর্দায় এই নকল কেশর মেশানোর জন্য উৎপাদন খরচ অনেক কম পড়ে। (৬) রং—যে সব রং খাবারের দোকানে বা সিরাপ তৈরী করতে ব্যবহার করা হয় ঐ রকম রং জর্দায় লাগে। দুটি রংয়ের নাম এখানে উল্লেখ করছি, (১) আর্থারজিন, (২) টারট্রাজিন প্রভৃতি ব্যবহার করা চলতে পারে।

মোটামুটি ভাবে জর্দা তৈরী করতে যে সব কাঁচামাল লাগে তা নিয়ে বিষদভাবে আলোচনা হয়ে গেল। এখন পাতা জর্দা তৈরী করার একটা ফরমুলা দিয়ে দিচ্ছি।

বিড়ির তামাক পাতা	—	২৫০ × ২ = ৫০০ গ্রাম
জেসমিন	—	৪ × ২ = ৮ ফোঁটা
গ্লিসারিণ	—	৪৫ × ২ = ৯০ ফোঁটা
রং (আর্থারজিন)	—	১ গ্রাম
মাস্ক	—	১২ ফোঁটা
অটো হেনা	—	২ ফোঁটা
নখের চুয়া	—	৬ ফোঁটা
ওরক (৬ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি) সাইজ		৮ পিস্

কি করে তৈরী করতে হয় ?

প্রথমে তামাক পাতাকে কাগজ পেতে তার উপর বিছিয়ে দিতে হবে। এবার হাতে করে কাটি, ময়লা বা অন্যান্য বাজে জিনিষ বেছে ফেলতে হবে। এই কাজটি খুব ভাল করে করা দরকার। পরে আটাচালা চালুনী দিয়ে তামাক পাতা থেকে গুঁড়ো চেলে বার করে দিতে হবে। যখন গুঁড়ো আর থাকবে না তখন সামান্য জলেতে রংগুলে নিয়ে ঐ তামাক পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। এমনভাবে রং ও জল মেশাতে হবে যেন পাতা বেশী

ভিজে না যায়। তামাক পাতা যখন শুকান হবে তখন যেন রৌদ্রে দেওয়া না হয়। কারণ এতে রং খারাপ হয়ে যাবে। তাই যেখানে ছায়া আছে অথচ রৌদ্রের ঝাঁজ লাগে ঐ রকম জায়গায় শুকিয়ে নেওয়া ভাল। তবে এই সময় একটা পাতলা পরিষ্কার কাপড় ঢাকা দেওয়া উচিত। এতে ধূলো বা বালি পড়বে না।

এই ভাবে রেখে দেওয়ার পর যখন তামাক পাতা একেবারে শুকিয়ে যাবে তখন সমস্ত গন্ধদ্রব্যগুলি একটি কাচের পাত্রে মিশিয়ে তামাক পাতায় অল্প অল্প করে ঢালতে হবে ও ভালভাবে মেখে নিতে হবে। এবার গ্লিসারিণ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়তে হবে। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গ্লিসারিণ সমস্ত জর্দ্দায় সমানভাবে পড়ে। এবার হাত পরিষ্কার করে নিয়ে ওরক মেশালেই জর্দ্দা তৈরী হয়ে গেল। আজকাল অনেক পাতা জর্দ্দায় সামান্য স্যাকারিণ মিশিয়ে থাকেন। যাতে একটু মিষ্টিভাব আসে। যখন রং মেশান হয় ঐ সময় স্যাকারিণ দেওয়া উচিত। যে ফরমুলা দেওয়া হ'ল ওতে আমরা চায়ের সাথে যে স্যাকারিণ tablet খাই ঐ রকম দেড় খানা tablet দিলেই যথেষ্ট। এটা অবশ্য না দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। বাজারে বিক্রী করার সময় যখন ছোট ছোট কৌটায় প্যাক করা হবে তখন কৌটার ওপরে সামান্য পরিমাণে কেশর জাফরাণ মিশিয়ে দিলেই চলবে।

কমদামি পাতি জর্দ্দা

এই জর্দ্দাকে আমরা আগের জর্দ্দার by product বলতে পারি। কারণ তামাক পাতা যখন চালুনী দিয়ে চেলে গুঁড়ো তামাক আলাদা করে দেওয়া হয় তখন ঐ গুঁড়ো বিড়ির তামাক পাতা কমদামি পাতা জর্দ্দা তৈরী করতে লাগে। আবার রংটা কালো হওয়ার জন্য কালাপাতি জর্দ্দাও বলা হয়। যদি বিড়ির গুঁড়ো তামাক পাতা সবটা না পওয়া যায় তবে এর সঙ্গে দোক্তা পাতাও মিশিয়ে কাজ চালাতে পারা যায়।

ফরমুলা

গুড়ো বিড়ির তামাক পাতা
বা
দোক্তা পাতা } —২৫০×২=৫০০ গ্রাম

চুণ	—	১×২=২ গ্রাম
খয়ের (জনক পুরী)	—	৬০×২=১২০ গ্রাম
অটো কেওড়া	—	১০×২=২০ গ্রাম
নখের চুয়া	—	২০×২=৪০ ফোঁটা
জেরেনিয়ম রোজ	—	১০×২=২০ গ্রাম
পিপারমেণ্ট অয়েল	—	½ সি.সি.

তৈরী করার নিয়ম :—

গুঁড়ো পাতাকে আগুনে ভালভাবে ভেজে নিতে হবে। অন্য একটি পাত্রে ২০০ মিঃলিঃ জল নিয়ে আঁচে চাপিয়ে দিতে হবে। জল ফুটে গেলে খয়ের দিতে হবে ও না গলা পর্যান্ত অল্প নাড়া দরকার। এবার চুণ ঐ খয়ের গোলা জলে ঢেলে দিয়ে কড়াই আঁচ থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। ঠাণ্ডা হবার আগেই ভাজা তামাক পাতা ঐ মিশ্রণে একসঙ্গে ঢেলে দিয়ে খুন্তির সাহায্যে নাড়তে হবে। পাতা, খয়ের ও চুণ ঐ জলে মিশে যাওয়ার পরেও যদি সামান্য জল বেশী থাকে তবে ফের আগুনে চাপিয়ে একেবারে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর তামাক পাতা ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে আগের ম'ত গন্ধদ্রব্য মিশ্রণ ও পিপারমেণ্ট অয়েল দিলেই জর্দা খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে।

গুলি জর্দা তৈরী করার ফরমূলা

তামাক	—	৫০০ গ্রাম
বড় এলাচ	—	৩০ গ্রাম
ছোট এলাচ	—	১০ গ্রাম
দারুচিনি	—	৩০ গ্রাম
জয়িত্রি	—	১০ গ্রাম
জেরেনিয়ম রোজ	—	১৫ ফোঁটা
নখের চুয়া	—	২০ ফোঁটা
অটো কেওড়া	—	৪ ফোঁটা
সিনামন-লিফ্-অয়েল	—	১০ ফোঁটা
কেশর	—	২ গ্রাম
ওরক (সামান্য)	—	যে পরিমাণ লাগে
এ্যাকাসিয়া গাম	—	৪ গ্রাম
খয়ের (কালো)	—	২০ গ্রাম

তৈয়ারী করার পদ্ধতি :—

প্রথমে তামাক পাতাগুলো রৌদ্রে শুকিয়ে ডাঁটাগুলোকে বার করে দিতে হবে। এবার পাতা অল্প আঁচে ভেজে ভালভাবে গুঁড়ো করে একটি পাত্রে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। অন্য একটি পাত্রে বড় এলাচ, ছোট এলাচ, দারুচিনি ও জয়িত্রি সামান্য ভেজে মিহিভাবে গুঁড়ো করে ঢেকে রাখা দরকার।

এখন কড়ায়ে ৩০০ সি.সি.—জলে খয়ের ২০ গ্রাম, চুণ সামান্য ও ভাজা মসলা গুলি একত্রে মিশিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। কিছুক্ষণ বাদে অর্থাৎ জল কমে গেলে ভাজা তামাক পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হবে। এইভাবে যখন পেস্টের ম'ত হয়ে যাবে তখন কড়াই আঁচ থেকে নামিয়ে নিতে হবে। যখন ঐ মণ্ড বা পেস্ট সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পরিমাণ ম'ত অটো মাস্ক মিশিয়ে দিতে হবে। এবার বাজারে যে সাইজে দানা চলবে সেই রকম সাইজ হাতে বা চালুনীতে করে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকিয়ে যাবার পর "এ্যকাসিয়া গাম" জলে গুলে ঐ দানাগুলোতে মাখিয়ে নিতে হবে। গাম শুকিয়ে যাবার পর গ্লিসারিণ মাখিয়ে গন্ধ দ্রব্যের কম্পাউণ্ড গুলিজর্দ্দাতে দেওয়া উচিত। সর্বশেষ ওরক ও কেশর লাগিয়ে কৌটায় প্যাক করে ফেলতে হবে। এই গুলিজর্দ্দার দু-রকম প্যাকিং বাজারে চলে (১) কাচের গোল শিশিতে, (২) প্ল্যাষ্টিকের কৌটাতে। যেটার দাম কম পড়বে সেই রকম প্যাকিং প্রথমে করা ভাল। আর কেশর বা জাফরাণ, গুলিজর্দ্দায় আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। ফলে এর বাবদ আরও একটা খরচা বেঁচে যায়। তবে ইচ্ছে করলে সামান্য স্যাকারিণ এতে মেশান চলতে পারে।

মিষ্টি সুপারী

ভারতে এমন অনেক শিল্প রয়েছে যা মাত্র এক'শো বা দু'শো টাকা দিয়েই প্রথমে শুরু করা চলে। কারণ কোন মেসিনপত্র কিনতে হচ্ছে না, লোকজনেরও বিশেষ একটা দরকার পড়ছে না। কেবল বাজার থেকে কাঁচামাল কিনে এনে তার থেকে জিনিষ তৈরী করে বাজারে বিক্রী করা। বাজার ধরে যায়, ভাল কথা। যদি দেখা যায় ঠিকম'ত চলছে না, তখন কেনা

দামের থেকে সামান্য লাভ রেখে দোকানে দোকানে ঘুরে নিজেই বেচতে পারা যায়। ফলে যে মূলধন প্রথমে ঢালা হয়েছিল তা সবটাই হাত ঘুরে আবার ফিরে আসছে। এতে পয়সার দিক থেকে বিশেষ লাভ না হলেও, অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়। নিত্য অভাবের সংসারে আমরা মানুষ হয়েছি। কাজেই সেই ম'ত হিসেব করে চলতে হবে।

এবার আসা যাক শিল্পের কথায়। মিষ্টি স্থপারী তৈরী করা গৃহ শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়েরা তৈরী করতে পারে। ফলে দিনের সমস্ত সময়টা বিক্রীর জন্যে ঘুরতে পারা যায়। প্রত্যেকটি পানের দোকানে মাসে প্রায় এক ডজন কৌটা বিক্রী হয়ে যায়। যদি এই ব্যবসায় নামার ইচ্ছে থাকে তা'হলে কয়েক দিন পানের দোকান গুলোতে একটু ঘুরলেই মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে। যদি অন্য রাজ্যের লোক নিজের জায়গায় তৈরী করে পশ্চিম বাংলায় এসে ব্যবসা করতে পারে তবে আমারা বাঙালীর ছেলে হয়ে কেন পারবো না পশ্চিম বাংলায় ব্যবসা করতে। প্রাদেশিকতা নয়। এখানে বাঁচার লড়াই, সম্পূর্ণ রুটির প্রশ্ন। আমার কথা, ব্যবসা সবাই করুক। তবে প্রতিযোগিতা হোক। আজকের যুবসমাজ তাতে অংশ গ্রহণ করুক। গ্রাম বা মফস্বল শহর অঞ্চলে যাঁদের বসবাস, তাঁদের নিশ্চয় ভিটেটুকু ছাড়াও সামান্য কিছু জায়গা জমি থাকেই। সেই সমস্ত জায়গায় দু'শো হোক আর তিনশো হোক স্থপারী গাছ লাগিয়ে দিলে কয়েক বছর বাদেই কাঁচামাল ঘরে বসেই পাওয়া যাবে। যাঁদের বাগান বা ঐ ধরণের জমি রয়েছে তাঁদের উচিত হবে আরও বেশী করে গাছ লাগান। অবশ্য যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে। বাজারে কাটা স্থপারীও পাওয়া যায়। যদি স্থবিধে থাকে তবে কাটা স্থপারী না কিনে বাড়ীতে কেটে নিলে তৈরী করার খরচও সামান্য কমে যায়।

ফরমূলা

সরু কাটা স্থপারী	২২৫ গ্রাম
লাল রং	৪ গ্রাম
স্যাকারিণ	৫ গ্রাম
অটো কেওড়া	২ সি. সি.
জেরেনিয়ম রোজ	৩ সি. সি.
অটো হেনা	১ সি. সি.

মাস্ক এ্যম্বার	১ সি. সি.
রূপার পাত	৫ পিস.
গ্লিসারিণ	১০ সি. সি.
মধু	৪০ সি. সি.

মিষ্টি স্থপারী তৈরী করতে গেলে সব থেকে ভাল সময় শীতকাল অথবা গ্রীষ্ম কাল। বর্ষা কালে শুকিয়ে নেবার অসুবিধে থাকতে পারে। অনেক সময় ভিজে থাকাতে ছাতা পড়ে যায়। কাজেই আকাশের অবস্থা বুঝে তবেই তৈরী করা দরকার।

মোটামুটি ভাবে স্থপারী তৈরী করার কাজকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ফলে একটু সময় বেশী লাগে। প্রথম দিনে ২০০ সি. সি. জলে রং ও স্যাকারিণ মিশিয়ে প্রায় দশ থেকে বার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। যদি রং গাড় করার প্রয়োজন থাকে তবে ফরমূলায় যে পরিমান রং দেওয়া আছে তার থেকে সামান্য বাড়িয়ে নিতে পারা যায়। যখন দেখা যাবে কাটা স্থপারীতে সমস্ত রং ভালভাবে ধরে গেছে তখন জল থেকে তুলে রোদে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। সোজাসুজি রোদে দিলে রং এর উজ্জলতা কমে যেতে পারে। এরপর দ্বিতীয় দিনে প্রথমে গ্লিসারিণ, তারপর মধু ও গন্ধ দ্রব্য মিশিয়ে সর্বশেষ রৌপপাত অথবা তবক লাগিয়ে কৌটায় প্যাক করা দরকার। দু'টি জিনিষ অবশ্য বাদ দেওয়া চলে। অনেকে মধুর বদলে চিনির রস মিশিয়ে থাকেন। আবার গ্লিসারিণ একেবারে না মেশালেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কারণ এর প্রধান কাজ স্থপারীর উজ্জলতা বৃদ্ধি করা। সর্বশেষ পাঠকের কাছে নিবেদন, বাজারে চালু পানের দোকানে খোঁজ নিলেই এ ধরণের ব্যবসায় যাদের অনিচ্ছা বা শ্রদ্ধা নেই আশাকরি তা আর থাকবে না। টিনের কৌটার বদলে প্ল্যাষ্টিকের কৌটা ব্যবহার করা সব থেকে ভাল।

বিস্কুট শিল্প

এমন কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলি ঠিক শহর অঞ্চলে করলে চালাতে পারা যায় না। শহর থেকে একটু দূরে বা পল্লী অঞ্চলে বেশ ভালভাবে চালাতে পারা যায়। এর প্রধান কারণ হ'ল দু'টি। কলকাতায় বা শহর অঞ্চলে অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে তাঁরা সম্পূর্ণ মেসিনে তৈরী করেন,

ফলে একদিকে যেমন দেখতে সুন্দর হয় আবার অন্যদিকে উৎপাদন খরচও অনেক কম পড়ে। তাছাড়া বাজারে অনেকদিন ধরে চালাবার ফলে একটা সুনাম হয়ে যায়। তাই নতুন কোন ছোট কোম্পানি যদি হঠাৎ এই সব জায়গায় ব্যবসা করতে আসেন তবে তাঁকে বাজারে প্রতিষ্ঠা পেতে বেশ পরিশ্রম করতে হয় ও সময় লাগে। কিন্তু শহর থেকে একটু বাইরে করলে এই সমস্ত প্রশ্ন আসে না। তাই একটু ভালভাবে বাজারে খাটলেই বিস্কুট বা ঐ ধরনের জিনিষ চালাতে পারা যায়। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ছোট ছোট চায়ের দোকানে বা রেলওয়ে স্টেশনের চায়ের স্টলে মাল ভাল চলে। কারণ এই সমস্ত জায়গায় নিত্য নতুন মানুষ যাওয়া আসা করেন। কেবল প্রয়োজন মেটাতে পারলেই কাজ হয়ে যায়। জিনিষের গুণাগুণ এই সমস্ত জায়গায় কেউ বিচার করে দেখেন না।

মোটামুটিভাবে বিস্কুটকে দুটিভাগে ভাগ করা যায়। (১) এরারুট বিস্কুট, (২) ময়দার বিস্কুট। এরারুট বিস্কুটের প্রধান কাঁচামাল এরারুট, আর দামের দিক থেকে সামান্য বেশী। সেই রকম ময়দার বিস্কুটে প্রধান কাঁচামাল ময়দা, দামের দিক থেকে একটু সস্তা। এখানে অবশ্য আলোচনা করা হচ্ছে কমদামের ময়দার বিস্কুট নিয়ে। অনেকে হয়তো দেখে থাকবেন বাজারে বিভিন্ন পশুর আকারে বিস্কুট বিক্রী হয়। খেতে মন্দলাগে না, আর বাজারে চলেও খুব ভাল। কলকাতায় একটি বড় কোম্পানি এটি তৈরী করে। ঠিক এই রকম বিস্কুট সম্পূর্ণ কুটীর শিল্পের আকারে তৈরী করা যায়।

সামান্য জায়গা লাগে। দুখানি ঘর হলেই কাজ চালাতে পারা যায়। তিন থেকে চার জন লোকের দরকার। যদি ঠিকম'ত মেসিনপত্র ব্যবহার করা যায় তবে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের আকারে করতে গেলে সামান্য মেসিনপত্র নিয়ে বাকী সব কাজ হাতেই করতে হবে। কি কি জিনিষ লাগবে তার একটা তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। (১) কাঠের ভ্যাট দুটি অথবা ষ্টেন-লেস ষ্টীলের নৌকা হলেও চলবে, (২) খুন্তি চারটি, (৩) একদিকে পিন বসান প্লেট একটি (মাপটা হবে ৩ ফুট × ২ ফুট) (৪) লোহার পাত বসান উনান একটি। যে জিনিষগুলি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল তা প্রায় প্রত্যেকেই জানেন। তবুও ৩নং জিনিষটি নিয়ে একটু আলোচনা করছি। দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকটি বিস্কুটের গায়ে ছিদ্র থাকে। একটি ছুঁচ দিয়েও ছিদ্র করা যায়। কিন্তু তাতে সময় বেশী লাগে। তাই একটি লোহার

প্লেটে যদি ছুঁচগুলিকে আগে থাকতে আটকে রাখা যায় তবে একসঙ্গে অনেক বিস্কুটে ছিদ্র করা চলে। আরও একটি জিনিষ আমি উল্লেখ করিনি, সেটি ছাঁচ। তবে আগে বলেছি, নানা রকমের জীবজন্তুর আকারে ছোট ছোট বিস্কুট করতে। এইগুলি কিন্তু দোকানে চলে। তবে চায়ের দোকানে বা রেলওয়ে ষ্টেশনের চায়ের ষ্টলে এই আকারের বিস্কুট চলবে না। আমি যে ফরমূলা দিচ্ছি তাতেই, কেবল ছাঁচ পরিবর্ত্তন করে বিভিন্ন আকারের বিস্কুট করা চলতে পারে।

ফরমূলা—১

ময়দা	৫০০ গ্রাম
মাখন	১২৫ গ্রাম
চিনি	১২৫ গ্রাম
দুধ	২৫০ গ্রাম
বাইকার্বনেট অফ সোডা	২ গ্রাম

ফরমূলা—২

ময়দা	৫০০ গ্রাম
মাখন	৬০ গ্রাম
চিনি	৬০ গ্রাম
হাঁসের ডিম	১টি
দুধ	৫০ সিঃ সিঃ
এরারুট	২৫ গ্রাম
কার্বনেট অফ্ এমোনিয়া	৩.১৫ সি. সি.

তৈরী করার নিয়ম

১নং ফরমূলায় যে সমস্ত জিনিষগুলি দেওয়া আছে সেগুলি প্রথমে ওজন করে নিতে হবে। তারপর মাখন গলিয়ে নিয়ে সমস্ত জিনিষগুলি একসঙ্গে ময়দায় মেখে নিতে হবে। ময়দা যদি ভালভাবে মাখা না হয় তবে বিস্কুট খারাপ হয়ে যাবে। এবার পুরু করে বেলে নিয়ে ছাঁচের সাহায্যে সাইজ করে নিতে হবে। এরপর ছিদ্র হয়ে গেলে উনানের আঁচে দশ—থেকে পনের মিনিট রেখে দিলেই বিস্কুট হয়ে যাবে।

২ নং ফরমূলায় তৈরী বিস্কুট ঠিক একইভাবে হয়। কেবল ডিম মেশাবার সময় হলদে অংশ বাদ দিয়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিতে হবে।

ফরমূলা–৩

এরাকট	৫০০ গ্রাম
মাখন	৬২ গ্রাম
চিনি	৬২ গ্রাম
ভিনিগার	১ সি. সি.

এই ফরমূলা দিয়ে যে বিস্কুট তৈরী হবে তাকে এরারুট বিস্কুট বলে। তবে ছোট ছোট সাইজে করলে ভাল হয়। আগের ফরমূলায় যে ভাবে প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে ঠিক ঐ ভাবেই প্রস্তুত করতে হবে। এ্যারারুটের সঙ্গে সমস্ত জিনিষ ভালভাবে মেখে নিয়ে ছাঁচের আকারে করে নিতে হবে। এবার উত্তাপে সেঁকে নিলেই বিস্কুট তৈরী হয়ে যাবে।

ফরমূলা—৪

ময়দা	২ কেজি
সোডা-বাই-কার্ব	৭ গ্রাম
এ্যাসিড—টার্টারিক	২ সি. সি.
ঘি অথবা ডালডা	৩০০ গ্রাম

এই ৪নং ফরমূলায় বিস্কুট তৈরী হবে না। আমরা বাজারে যে পাউরুটি খাই ঠিক সেই ধরনের রুটি তৈরী করা যাবে। প্রথমে ময়দার সঙ্গে সোডা—বাই— কার্ব ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এ্যাসিড-টার্টারিক পাউডার, সমস্ত ময়দার সঙ্গে মেশাতে হবে। এখন ১,০০০ সি সি. জল ময়দায় ধীরে ধীরে মিশিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মেখে নিতে হবে। এই কাজটি যদি তাড়াতাড়ি না করা হয় তবে ময়দা খারাপ হয়ে যাবে। এখন ছাঁচে ঘি, বা ডালডা দিয়ে যে সাইজ রুটি হবে সেই পরিমাণ মাখা ময়দা নিয়ে উনানের আঁচে সেঁকে নিতে হবে।

চকোলেট ও লজেন্স শিল্প

এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র বা কুটীর শিল্প আছে, যাতে মূলধন লাগে খুব সামান্য অথচ লাভের দিক থেকে বিচার করতে গেলে যে কোন লাভজনক ব্যবসার থেকে কম নয়। আর বিক্রয় বাজারে, এদের সর্বত্র অবাধ গতি। বিভিন্ন ধরনের চকোলেট ও লজেন্স তৈরী করা ঠিক ঐ রকম একটি ব্যবসা। এটি যিনি তৈরী করবেন একদিকে তিনি যেমন কিছু রোজগার করতে পারবেন, অপর দিকে কিছু লোক হাটে, বাজারে গঞ্জে, ও ট্রেনে ফেরি করে নিজেদের বাঁচার রাস্তা খুঁজে পাবেন। যাঁরা রোজ হাওড়া বা শিয়ালদা লাইনে নিত্য রেল গাড়িতে যাওয়া আসা করেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বহু যুবক বিভিন্ন ধরনের চকোলেট ও লজেন্স নিয়ে ট্রেন ফেরি করছেন। এই চকোলেট বা লজেন্স ফেরি করে প্রত্যেকটি যুবক রোজ পনের থেকে কুড়ি টাকা পর্যন্ত বেচা কেনা করেন। আর এই বাবদ তাঁদের নিত্য লাভ থাকে গড়ে চারটাকা থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত। তা হলেই ভেবে দেখুন এক দিকে ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে অপর দিকে কিছু লোক পরোক্ষভাবে ঐ শিল্পগুলি চালাতে সাহায্য করেছেন।

তাই এই দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকারের ট্রফি, চকোলেট ও লজেন্স কি ভাবে তৈরী করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। যত রকমের ট্রফি বা লজেন্স নিয়ে আলোচনা করা হবে সবগুলিতে এই কটি জিনিষ লাগবে। (১) এ্যানামেলের বড় হাঁড়ি একটি, (২) বড় খুন্তি একটি, (৩) বিভিন্ন প্রকারের ছাঁচ। (৪) বড় কাঁচের জার গোটা কুড়ি।

অরেঞ্জ লজেন্স :—চিনি ১২৫০ গ্রাম, জল সমপরিমান, কারমাইন রং ২ গ্রাম, ষ্ট্রবেরী ১০ ফোঁটা। গ্লুকোজ ৩০০ গ্রাম। এখন দেখা যাক এটা কিভাবে তৈরী করতে হবে। প্রথমে এ্যানামেলের হাঁড়িতে ১'২৫০ গ্রাম জল দিয়ে মৃদু আঁচে গরম করে নিতে হবে। জল গরম হয়ে গেলে, প্রথমে দিতে হবে চিনি। চিনি যখন সম্পূর্ণভাবে জলে গলে যাবে তখন তাতে গ্লুকোজ ঢেলে দিতে হবে। এই সময় একটু ভালভাবে খুন্তি দিয়ে নাড়তে হবে। চিনি ও গ্লুকোজ মিশ্রিত জল যেমন ফুটতে আরম্ভ করবে তখন প্রথম দিকে বড় বড় বুদবুদ উঠতে থাকবে। সেই সময় মাঝে মাঝে নাড়লেই হবে। এরপর ক্রমে ক্রমে ঐ বুদবুদ ছোট হতে হতে একেবারেই মিলিয়ে যাবে। ঠিক এই

সময় আঁচ থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ফেলতে হবে। এখন অল্প জলে কারমাইন ও ষ্ট্রবেরী গুলে হাতায় করে হাঁড়ির ভেতরে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সর্বশেষ হাতায় করে ছাঁচে ঢেলে দিয়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে শুকিয়ে নিতে হয়। ভালভাবে শুকিয়ে গেলে ধীরে ধীরে ছাঁচ থেকে তুলে নিলেই অরেঞ্জ লজেন্স তৈরী হয়ে গেল।

কোকো লজেন্স :—চিনি ২'৫০০ গ্রাম, পাউডার কোকো ২৫০ গ্রাম, গঁদ ১৪ গ্রাম, জল ৭৫০ গ্রাম, ট্রাগাকান্থ গঁদ ৪ গ্রাম, ভ্যানিলিন সুগার ৩০ গ্রাম। প্রথমে ৭৫০ গ্রাম জলকে সমান দু ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। লজেন্স তৈরীর একদিন আগে অর্ধেক জলে ট্রাগাকান্থ গঁদ ভিজিয়ে রাখতে হবে, বাকী অর্ধেক জলে যেদিন লজেন্স তৈরী হবে তার ৪—৫ ঘঃ আগে গঁদ ভেজালেই চলবে। এরপর দু-রকম গঁদের জল একসঙ্গে মিশিয়ে গরম করতে হবে। তবে এর আগে দুরকমের গঁদের জল যদি ছেঁকে নেওয়া যায় আরও ভাল হয়। জল একটু গরম হলেই পাউডার কোকো মিশিয়ে দিতে হবে। কোকো সম্পূর্ণভাবে না মেশা পর্যন্ত নাড়তে হবে। কোকো গলে যাবার পর চিনি ও ভ্যানিলিন একসঙ্গে মিশিয়ে গরম কোকো ও গঁদ মিশ্রিত জলে ঢেলে দিতে হবে। মৃদু আঁচে জ্বাল দিতে দিতে যখন জল শুকিয়ে কাদার ম'ত হয়ে যাবে তখন একটি থালায় ঢেলে সাইজ ম'ত কেটে অল্প আঁচে শুকিয়ে নিতে হবে।

পিপারমেণ্ট লজেন্স :—চিনি ৫০০ গ্রাম, একাসিয়া গঁদ ৪ গ্রাম, পিপারমেণ্ট অয়েল ৪০ ফোঁটা। ঠিক আগের মতই লজেন্স তৈরী করার একদিন আগে একাসিয়া গঁদ ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার চিনি ও গঁদ মিশ্রিত জল একসঙ্গে উনানে চাপিয়ে দিয়ে নাড়তে হবে। যখন বেশ ঘন হয়ে যাবে তখন আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা হবার মুখে পিপারমেণ্ট অয়েল মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে। এখানে একটা কথা সবার মনে রাখা দরকার যারা লজেন্স বা ট্রফি তৈরি করবেন তাঁরা যেন ঠিক বর্ষার সময়টা না করেন। কারণ ঐ সময় বাতাসে জলীয় কণা বেশী থাকায় ছাঁচে দেওয়া লজেন্স বা ট্রফি শুকতে চায় না। আবার অনেক নষ্ট হয়ে যায়। তাই এই সময় না করাই ভাল।

ক্রীম ট্রফি :—চিনি ২ কেজি, জল ৫০০ গ্রাম, ক্রীম অফ টাটার আধ চামচ, মাখন ১৫ গ্রাম, এসেন্স অফ ভ্যানিলা ২০ ফোঁটা, ওয়াক্স পেপার যে পরিমাণ দরকার হয়। প্রথমে মাপ অনুযায়ী জল দিয়ে হাঁড়ি আঁচে চাপিয়ে

দিতে হবে। জল যখন ফুটে উঠবে তখন চিনি মিশিয়ে নাড়তে হবে। চিনি গলে যাবার পর ক্রীম দিয়ে চিনি ও জলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এই মিশ্রণ যখন কাদার ম'ত হয়ে যাবে তখন মাখন ভালভাবে গলিয়ে নিয়ে হাঁড়িতে ঢেলে দিতে হবে। মাখন ঢালা হয়ে গেলে আর নাড়া চলবে না। কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর এসেন্স মিশিয়ে পেনসিলের ম'ত ষ্টিক্ করে নিয়ে ওয়াক্স পেপারে মুড়ে নিতে হবে।

চকোলেট :—কোকো পাউডার ৩ পাউণ্ড, চিনি ৭ পাউণ্ড, গুঁড়া দুধ ৪ পাউণ্ড, এসেন্স অফ্ ভ্যানিলা ১৫ ফোঁটা, জল ২ কেজি। প্রথমে আলাদা একটা পাত্রে কোকো পাউডার, চিনি ও গুঁড়া দুধ একসঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার ঐ মিশ্রণটি একটি এ্যানামেলের হাঁড়িতে ঢেলে আগুনে চাপিয়ে দিয়ে বেশ ঘন করে জাল দিতে হবে। যখন থক্‌থকে কাদার ম'ত হয়ে যাবে তখন আঁচ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেন্স—অফ্—ভ্যানিলা দিয়ে বেশ ভালভাবে নাড়তে হবে। এবার ছাঁচে ঢেলে দিলেই চকোলেট তৈরী হয়ে গেল।

বন্-বন্ :—খুবানীর শাস ও গ্লুকোজ সামান্য পরিমাণ। সিট্রিক এ্যাসিড এক গ্রেণ। এই দুটি প্রথমে ভালভাবে বেটে নিয়ে তাতে এসেন্স-অফ্-র‍্যাপসবেরী ৩ ফোঁটা মিশিয়ে নিতে হবে। এবার একটি পাথরের বড় থালায় ঢেলে নিয়ে বাজারে চলতি বন্-বন্ সাইজের ম'ত গোল করে নিতে হবে। এটি হ'ল এক ভাগ বা প্রথম পর্যায় বলা চলে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এক বোতল গোলাপ জলে এক আউন্স জিলেটিন ভিজিয়ে নিতে হবে। ভিজে যাবার পর তাতে একভরি ফটকিরি দিয়ে গরম করে নিতে হবে। ময়লাটা কেটে গেলেই নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এবার ঐ ফট্‌কিরি ও জিলেটিন জলে ৭৫০ গ্রাম চিনি দিয়ে ফের আঁচে চাপিয়ে দিতে হবে। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুড়ে না যায়। রস যখন বেশ ঘন হয়ে যাবে তখন নামিয়ে ফেলতে হবে। কিছুটা গরম থাকতে থাকতে প্রথম পর্যায়ে তৈরী বন্-বন্‌গুলি অর্ধেকটি ঐ রসে ডুবিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আবার অল্প কিছুক্ষণ বাদে আগের ম'ত বাকি অর্ধেক রসে ডুবিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। এইভাবে ঘণ্টা দুই রাখার পর বন্-বন্‌গুলি আপনা থেকেই মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়ে যাবে। শেষকালে কাগজে মুড়ে দিলেই বন্-বন্ বাজারে বিক্রীর উপযোগী হয়ে যাবে।

লিমন সিরাপ তৈরী

আগের দিকে যে সব শিল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি ঠিক কুটীর শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। বরঞ্চ বলা যায় ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তরভুক্ত। এই শিল্প-গুলি একটু শহরের মধ্যে হলে ভাল হয়। কিন্তু এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প আছে যা গ্রামের মধ্যে করলে ভাল হয়। বিশেষ করে যার কাঁচামাল প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক। ঠিক এই রকম একটি শিল্প লিমন সিরাপ।

এবার আসা যাক লিমন সিরাপ কি? অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, প্রায় প্রত্যেকটি বড় বড় দোকানে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে বোতলে নানা রকমের সিরাপ বিক্রী হচ্ছে। চার টাকার নিচে কোন সিরাপ নেই। অথচ যদি এটাকে ঠিক ম'ত করা যায় তবে ৬৫০ মিঃ লিঃ বা এক বোতলের দাম পড়ে "দু" টাকার নিচে। এবার তাহলে ভেবে দেখুন রোজ ২৫ বোতল করে যদি সিরাপ তৈরী করা যায় তবে লাভের পরিমাণটা কি রকম দাঁড়াবে।

সাধারণভাবে লিমন সিরাপ তৈরী করতে গেলে একটি ছোট ঘর হলেই কাজ চলে যাবে। সাইজটাও বলে দিচ্ছি যদি ৯×১১ ফুট মাপের হয় তাতেও ক্ষতি নেই। তবে ঘরটি এমনভাবে হওয়া চাই যেখানে একটি উনান জ্বলবে এবং তার জন্য যেন ঘরের কোন ক্ষতি না হয়। এর প্রধান কাঁচামাল হলো দুটি। (১) পাতিলেবু, (২) চিনি। প্রথমটি পাওয়া খুবই সহজ। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবসা করতে চান তাঁরা কিছুটা জায়গায় বার মাস ফলন হয় এমন জাতের পাতি লেবুর গাছ ১৫০টি যদি লাগান তবে কাঁচা মালের অভাব কোন দিন হবে না। যেটুকু অভাব হবে স্থানীয় এলাকা থেকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

সব থেকে বড় কথা এর জন্য ব্লক্ ক্যাপিটেল দরকার হয় না। একটি স্টেনলেস্ স্টিলের কড়াই ও একটি খুন্তি, এই দুটি কিনতে সাতশো আটশো টাকা লাগবে। যদি এই টাকাটাও কারও পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তবে মাটির কড়াই হোলেও চলবে। মনে রাখতে হবে কোন মতেই লোহার কড়াই ব্যবহার করা চলবে না। মাটির কড়াই হলে কাঠের খুন্তি ব্যবহার করতে হবে।

বর্তমান বাজারে যে সব সিরাপ বিক্রী হয় তা অধিকাংশ নকল অর্থাৎ সিনথেটিক লিমন এসেন্স চিনির রসের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী হয়। এখানে যে

পদ্ধতি উল্লেখ করা হচ্ছে তা একদিকে খেতে যেমন ভাল হবে তেমনি শরীরের দিক দিয়েও কোন ক্ষতি করবে না। আর নিজে যদি ঠিকমত করা যায় তবে কোন বাইরের লোক রাখার দরকার পড়ে না। ২৫ বোতল মাল তৈরী করতে মোট ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগে।

কিভাবে এটি তৈরী করতে হবে তাও জানিয়ে দিচ্ছি। পাতি লেবুর রস ১ কেজি, পাতি লেবুর খোসা ২০ গ্রাম, চিনি ১ কেজি, জল ৪০০ মিঃ লিঃ প্রথমে লেবুর রস মৃদু আঁচে চাপিয়ে দিতে হবে। একটু ফুটে উঠলে তাতে পাতিলেবুর খোসাগুলি খুব ছোট ছোট করে কুচিয়ে বেশ খানিকটা সেদ্ধ করে নিতে হবে। এর পর সব চিনি ও জল দিতে হবে। এই সময় একটু জোরে নাড়তে হবে। চিনি পুরো গলে যাবার পর নামিয়ে রেখে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। এইভাবে প্রায় বার ঘণ্টা থাকবে। তারপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেকে নিলেই লিমন সিরাপ খাবার উপযুক্ত হবে। অনেকে রংটা একটু ভাল করার জন্য সামান্য পরিমাণ হলুদ রং মিশিয়ে দেন। অবশ্য না দিলেও কোন ক্ষতি নেই। তবে দিলে দেখতে আরও একটু ভাল হবে।

আরও একটা কথা জানা দরকার। লেবুর খোসাগুলো যখন লেবুররসের সঙ্গে ফোটান হবে তখন যেন বেশি নাড়া না হয় বা অনেকক্ষণ ধরে ফোটানও না হয়। তা হলে সিরাপ তেঁত হয়ে যাবে। যে হিসাব দেওয়া হ'ল যদি পরিমাণ বাড়াতে যাওয়া হয় তবে দু গুণ, তিন গুণ, বা চার গুণ, এই হারে বাড়ালেই চলবে।

ভিনিগার

সামান্য টাকা মূলধন নিয়ে গ্রামে অথবা শহরে এই শিল্প আরম্ভ করা যেতে পারে। ছোট আকারে করে আর লাভ বেশী থাকায়, এটিকে লাভজনক ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের পর্যায়ে ধরা যেতে পারে। যে কোন রকম ব্যবসা করতে গেলে জিনিষ পত্র কেনার জন্য সামান্য কিছু টাকা লাগেই। কিন্তু ভিনিগার তৈরী করতে গেলে সেই সামান্য খরচ টুকুও লাগে না। কেবল কাঁচা মাল কেনার জন্য যা টাকার দরকার হয়। ৫০ থেকে ৬০ কেজি জল ধরে এই রকম একটি বড় মাটির জালা ও মুখে ঢাকা দেবার জন্য ঐ মাপের একটি মাটির সরা হলেই

কাজ চলে যাবে। যদি বেশী করে করতে হয় তবে জালার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেই হবে।

এখন দেখা যাক কি কি জিনিষ লাগে এটি তৈরী করতে? (১) ভেলি গুড় (নরম), (২) এ্যাসিটিক এ্যাসিড, (৩) মদের গাঁজলা, (৪) ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার।

দেখা যাচ্ছে সমস্ত জিনিষ গুলির সাথে আমাদের পরিচয় আছে। তবে একটি কথা বলার আছে। খরচ আরও একটু কমান যায়, যদি ডিস্‌টিল্ড ওয়াটারের বদলে কলের জল বা পরিষ্কার পুকুরের জল ব্যবহার করা যায়। যেখানে এই দু-রকমের জলের মধ্যে একটিও পাওয়া যাবে না সেখানে বর্ষাকালে চৌবাচ্চায় বা কোন গর্তে বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায় তবে সব থেকে ভাল হয়। কিন্তু জলের পরিমাণটা একটু হিসেব করে রাখা দরকার, কারণ সারা বছর ঐ জল দিয়ে কাজ চালাতে হবে। যে সমস্ত কোম্পানি বিলিতি মদ তৈরী করে সেখান থেকে মদের গাঁজলা যোগাড় করা যেতে পারে।

আমরা যারা সাধারণ ভাবে দু বেলা ডাল, ভাত ও তরকারী খাই সে রকম ঘরে ভিনিগারের চল খুব একটা নেই। কারণ জিনিষটি ভারতবর্ষের খাদ্যের তালিকায় পড়ে না। তাই ভিনিগার বিদেশী খাদ্য দ্রব্যের সাথে চলে বেশী। শহর অঞ্চলে যে সব বাড়ীতে চপ, কাটলেট, কোপ্তা প্রভৃতি নিত্য হয় ও হোটেলে বা রেস্তরাঁতে এর চল খুব বেশী। সাদা কাচের বোতলে ৬৮০ মিঃলিঃ মাপে বাজারে বিক্রী হয়।

ফরমুলা

ঝোলা গুড় (আখের)	৫	লিটার
এ্যাসিটিক এ্যাসিড	১০	লিটার
মদের গাঁজলা	১	লিটার
জল	১০০	লিটার

মাটির জালায় গুড়, এ্যাসিটিক এ্যাসিড ও মদের গাঁজলা ভালভাবে মেপে ঢেলে দিতে হবে। এবার একটি কাঠের অথবা স্টেনলেস্ স্টিলের খুন্তির সাহায্যে বেশ করে ঘেঁটে দিতে হবে। সমস্ত জিনিষগুলি মিশে যাবার পর পরিমান ম'ত জল দিয়া আবার ঘাঁটতে হবে। শেষকালে জালার মুখে সরা চাপা নিয়ে কাদামাটি অথবা ময়দার সাহায্যে মুখটি বন্ধ করার পর চার সপ্তাহ বা একমাস বাদে মাল ছেঁকে নিয়ে বাজারে বিক্রী করা চলতে পারে।

স্বদেশের কুটীর শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক

কোন একটি দেশের শিল্পের অগ্রগতি মানেই সেই দেশের আর্থিক উন্নতি। তাই ভারতের কুটীর শিল্পের উন্নয়নক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ভূমিকা কি হবে? এবার তাহলে দেখা যাক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের লক্ষ্য কি? সাধারণভাবে ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমাদের বিগত পাঁচশালা পরিকল্পনার দিকে যদি একটু তাকান যায় তবে দেখতে পাব পরিকল্পনার বিন্যাস ঘটেছে মিশ্র অর্থনীতিতে। তাই একদিকে যেমনি গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প, অপর দিকে তেমনি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পও এগিয়ে গেছে তার সাথে। এই পরিকল্পনা প্রথমে শুরু হয়েছিল ইং ১৯৫১ সালে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে মিশ্র অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিচালনায় শিল্প ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। তাই ১৯৫১ সালে যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থা ছিল মাত্র পাঁচটি, ১৯৬৮ সালে মার্চের শেষে হিসেব করে দেখা যায় তা দাঁড়িয়েছে মোট তিরিশটিতে।

এখন দেখা যাচ্ছে গত সতের বছরে মোট ৭৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থা উৎপাদনের কাজে এগিয়ে এসেছে। এটা কিন্তু খুব আশার কথা নয়। যেখানে কোটি কোটি শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত বেকার সেখানে মাত্র ৭৮টি সরকারী উৎপাদন সংস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। ফলে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন দুটোই ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে। এ তো গেল সরকারী নমুনার একটি দিক। অপর দিকে রয়েছে, ব্যক্তিগত মালিকানায় ও পরিচালনায় বে-সরকারী উদ্যোগ। এখানেও সেই একই ব্যর্থতার ঢেউ এসে লেগেছে, কারণ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সর্বশেষ মূলধনের অভাব। তাই বে-সরকারী ইউনিটগুলি তো বাড়তেই পারেনি উপরন্তু বিগত কয়েকটি বছর ধরে চরম পরিশ্রম করতে হয়েছে নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য। ফলে ঐসব জায়গায় নতুন কোন কাজের সুযোগ তো ঘটেই নি, উপরন্তু পরিশ্রমের তুলনায় উপযুক্ত মজুরি না পাওয়ায় শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক অনেক নিচে নেমে গেছে। সর্বশেষ ফল দাঁড়িয়েছে, একটি দুটি করে প্রায় অর্ধেক শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। এই সব ব্যর্থতার একটি মাত্র কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, মিশ্র অর্থনীতির ফলে সরকারী উদ্যোগে বা বে-সরকারী উদ্যোগে শিল্প নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে এগিয়ে যেতে পারে নি।

আজ তাই ভারতে বেকার সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

দেখা যায় ভারতে প্রায় বেকারের সংখ্যা ছয় কোটির কাছাকাছি। আবার সারা এশিয়াতে বেকারের সংখ্যা ত্রিশ কোটি। ঠিক এই অবস্থা যদি বজায় থাকে তবে আগামী এক দশকের এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ২২ কোটিতে। এই সমস্যার সমাধান যে কি তা সরকার পরিষ্কার করে কিছুই বলতে পারছেন না। তবে সরকারী মহল শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম বা আধা শহরে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ না বাড়লে এ সমস্যার সমাধান হওয়া খুব শক্ত।

উন্নত ও শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে যেভাবে মূল ধনতন্ত্রপ্রধান শিল্প প্রসার ঘটেছে, অনুন্নত দেশে তা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ভিত্তি হতে পারে না। ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প ও কৃষি শিল্প কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমাদের ম'ত অনুন্নত দেশগুলির বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে হবে। এর প্রত্যক্ষ ফল আমরা দেখতে পেয়েছি এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করায় আজ জাপান পশ্চিমী দেশগুলির সাথে বৈষয়িক উন্নতিতে পাল্লা দিতে সক্ষম হয়েছে। খুব বিরাট শিল্পে মূলধন বিনিযোগ না করে গ্রামে বা আধা শহরে কৃষিকর্মের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলে সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। আর ফলও পাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি। ঠিক এই কারণে আজ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু করার আগেই বুঝতে পারছি বৃহৎ শিল্পের সাথে ক্ষুদ্র ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের ওপর নজর না দিয়ে কতখানি ভুল আমাদের হয়ে গেছে

একেবারে শেষ সময় দেশের ১৪টি ব্যাঙ্ক সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে দেশবাসীর সামনে কিছুটা আশার আলো দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আর একথাও ঠিক যে, কোন একটি স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। দেশের এই বিপর্যস্ত অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, সরকার ও দেশবাসীর সামনে একটি প্রস্তাব রাখছি। অবশ্য এটা খুব নতুন জিনিষ নয়। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই রাজ্য সরকার এগিয়েছেন। কিন্তু ঠিকমত প্রয়োগ না হওয়ার ফলে ও ব্যাপক বিস্তার লাভ না করায় তার প্রত্যক্ষ ফল আমরা পাইনি।

সরকারের বদলে ব্যাঙ্ক, পরিবহণ ও অন্যান্য ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা

বুঝে নিজে জমি কিনে তাতে ছোট বড় ও মাঝারি শেড করে দেবে। সেই সব শেডে জল, বিদ্যুৎ সহ সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থাকবে। যাঁদের ইচ্ছে আছে অথচ সুযোগ সুবিধা না থাকার ফলে কিছু করতে পারছেন না তাঁরা, এবং মাঝারি শিল্পগুলি সমবায় ভিত্তিতে কিছু বেকার যুবক ঐ রকম INDUSTRIAL ESTATE-য়ে সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এতে একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সমাধান হবে ও দেশে শিল্পের প্রসার হবে, অন্যদিকে শেডের ভাড়াবাবদ ব্যাঙ্কের একটা আলাদা আয় হবে ও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রত্যেকটি ইউনিটের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দেবার সুযোগ ঘটবে। অবশ্য ঐ রকম INDUSTRIAL ESTATE-য়ে একটি করে শাখা অফিস খুলতে হবে। আজকাল ব্যাঙ্ক যে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছে, এতে এক কাজে দুটি কাজই হবে। ঐ শাখা অফিসগুলি কৃষি কাজেও অনেক সময় দিতে পারবে। এইভাবে কাজ হলে ব্যাঙ্ক ও গ্রামের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে যাবে।

এখন দেখা যাক এই রকম INDUSTRIAL ESTATE কটি হবে ও কি রকম জায়গায় হবে। প্রথমে ২০ মাইল অন্তর এই ধরণের ESTATE করা চলতে পারে। যদি ভাল ফল পাওয়া যায় তবে ঐ ব্যবধান কমিয়ে প্রতি দশ মাইল অন্তর করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় করণ হওয়ার পর কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মেশিন-পত্র কেনার জন্য অর্থ ঋণ দেওয়াতেও ঠিকমত তা কাজে লাগেনি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কোন মতেই মেসিন কেনার টাকা সোজাসুজি কোন লোকের হাতে দেবে না। কতকগুলি নির্দিষ্ট ছোট কোম্পানি আগে থাকতে ঠিক করে রাখতে হবে। সেটা অবশ্যই ব্যাঙ্ক করবে। এবার যে ব্যক্তি বা কোন সংস্থা মেসিনপত্র কেনার জন্য ঋণ চাইবেন তখন ব্যাঙ্ক তাদের প্রয়োজন জেনে নিয়ে নির্দিষ্ট কোম্পানিকে ঐ মেসিন সরবরাহ করতে আদেশ দেবেন। এখন ঐ সমস্ত কোম্পানি মেসিন তৈরী করে নির্দিষ্ট শেডে বসিয়ে দিয়ে ও চালু করে তবে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেবেন। এখন শিল্প চালাবার জন্য যেটুকু অর্থ দরকার সেই পরিমান অর্থ যে শিল্পটি চালাচ্ছেন তাঁর হাতে ব্যাঙ্ক দেবে।

জায়গা ও মূলধনের সমস্যা মিটলেও একটি জিনিষ এখন বাকী থেকে যাচ্ছে, তা বিক্রয় করার সমস্যা। যিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি গড়ছেন তিনি নিজে বাজারে বিক্রী করতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁর দ্বারা সম্ভব না হয় তবে সে

ক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সরকারী দর থাকবে। যদি কেউ এইখানে বিক্রী করতে আসেন তবে ঐ নির্দিষ্ট দরে বিক্রী করতে হবে। অবশ্য সরকারী দরটা বাজার থেকে একটু কম থাকবে। বাজার দর বেশী থাকার ফলে যাতে উৎপাদনকারী বাজারে প্রথম বিক্রী করে পয়সা একটু বেশী পান। উৎপাদনকারীকে উৎসাহ দেবার এটাও একটা অন্যতম দিক। যে সব মাল সরকার কিনবেন তাঁকেও বিক্রী করতে হবে। তাই বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় শহরে দু-তিনটি শোরুম খুলতে হবে। ধীরে ধীরে বিদেশে বন্ধু রাষ্ট্রগুলির শহরেও এই ধরণের শোরুম খুলে চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। তাই INDUSTRIAL ESTATE-য়ের সঙ্গে সরকারের তরফ থেকে একটি করে WARE HOUSE বা গুদাম রাখতে হবে। ঠিক এই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাপান আজ কেবল আমেরিকায় বছরে বাঁশের পর্দা চালান দিয়ে তিন লক্ষ টাকা রোজগার করে। এই রকম একটি মাত্র জিনিযের নাম উল্লেখ করলাম। আরও হাজার হাজার জিনিষ রয়েছে যা বিদেশে বিক্রী করে জাপান দিন দিন দেশের উন্নতি করছে।

সকলের সুবিধার জন্য ও বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। সবদিক বিবেচনা করে ও কাঁচামালের যোগান বুঝে শিল্পগুলি গড়ে তুলতে পারা যাবে।

রসায়নিক দ্রব্য থেকে যে শিল্প স্থাপন করা যাবে সেই গুলির তালিকা।

(১) লেখার কালি
(২) ছাপার কালি
(৩) জুতোর কালি
(৪) ফিটকিরি
(৫) সাবান
(৬) আগর বাতি
(৭) তুঁতে
(৮) ভেষজ উদ্ভিত থেকে ঔষধ তৈরী
(৯) কাচ তৈরী
(১০) দেশলাই
(১১) প্যাডের কালি

(১২) গালা
(১৩) বাজী তৈরী
(১৪) রং তৈরী
(১৫) নাইট্রিক অ্যাসিড
(১৬) সোডিয়াম কার্বনেট
(১৭) লিপষ্টিক
(১৮) নেল পালিশ
(১৯) স্নো
(২০) বিভিন্ন প্রকারের গন্ধ তেল
(২১) গঁদ, শিরীষ, ধুনা ও রজন তৈরী
(২২) ফিনাইল
(২৩) লোহা কাটা তেল
(২৪) রবারের জিনিষ
(২৫) সেলুলয়েড শিল্প
(২৬) লবণ তৈরী
(২৭) আতর
(২৮) সিলিকেট
(২৯) সিরাপ, সোডা, লেমনড প্রভৃতি।

খাদ্য ও তার সহযোগী শিল্প তালিকা।

(১) বিস্কুট, কেক ও রুটি
(২) ঘি, মাখন ও পনীর
(৩) যব, ভূষি ও চালের কুঁড়ো থেকে তৈরী খাদ্য
(৪) কৌটায় বা বোতলে আচার, চাটনি, মশলা, ফল প্রভৃতি সংরক্ষণ
(৫) ডালমুট ও বরফ তৈরী করার কারখানা
(৬) জেলি, ভিনিগার, জ্যাম্ তৈরী
(৭) হাস, মুর্গী, শূকর ও মৌমাছি পালন ও সেই সঙ্গে মধু, মোম ও সার উৎপাদন
(৮) কৌটায় মিষ্ট দ্রব্য সংরক্ষণ।

বিভিন্ন ধরণের শ্রম শিল্প।

(১) সেলাই কল
(২) সাইকেলের বিভিন্ন অংশ তৈরী
(৩) লোহার পাত থেকে বালতি, বাক্স, ট্যাঙ্ক ও আলমারি তৈরী।
(৪) লোহার বল্টু, পেরেক, পিন, জাল, তার, হাতা, কড়াই, দরজার কবজা, পাখির খাঁচা, ক্লিপ, ইঁদুর ধরার খাঁচা প্রভৃতি
(৫) ইস্পাতের তৈরী চামচ, কাঁটা, ছুরি, থালা, বাটি, গেলাস ও চিকিৎসার জন্ম বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরী
(৬) কিমাম, জর্দা ও নস্য তৈরী
(৭) ছাতা, ছাতার বাঁট ও শিক তৈরী
(৮) সিমেণ্টের তৈরী বিভিন্ন ধরণের পাইপ, ভেন্টিলেটর ও বেঞ্চ তৈরী
(৯) নানা প্রকারের কার্ডবোর্ডের বাক্স করার কাজ
(১০) পীস্ কাঠ থেকে ছুরির ফ্রেম তৈরী
(১১) নানাবিধ বাঁশের কাজ
(১২) ইট, টালি, চুণ ও সুরকির কারখানা
(১৩) ছাপার কারখানা
(১৪) সাবানের কারখানা
(১৫) ছোট খাট রবারের জিনিষ তৈরী
(১৬) হোসিয়ারী ও কাটা কাপড়ের শিল্প
(১৭) দেশলাই শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি।

এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যেখানে গড়ে উঠবে সেই জায়গায় সরকারের পরিচালনায় একটি গুদাম ঘর করার কথা উল্লেখ করেছিলাম। কারণ ঐ সব কারখানায় উৎপন্ন মালগুলি যাতে সরকার কিনে নিতে পারেন। আরও ভাল হয় যদি উৎসাহ পেয়ে সাধারণ লোক এগিয়ে আসেন বে-সরকারী ভাবে ঐ রকম গুদাম ঘর করতে। ফলে একদিকে যেমন উৎসাহ পেয়ে শিল্পগুলি বিস্তার লাভ করবে অন্যদিকে বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

গ্রন্থখানির বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকার মতামত

দৈনিক বসুমতী:

আমাদের দেশে একটি কথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্মণি।" ব্যবসা দ্বারাই লক্ষ্মী লাভ হয় এবং এই ব্যবসা রূপ গ্রহণ করে শিল্পদ্রব্যের সহযোগিতায়। স্বদেশের উন্নয়ন বিষয়েও শিল্পের প্রভাব প্রভূত। ভারতে শিল্প—বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালীর স্থান আজ সর্বনিম্নে। এককালে আচার্য পি, সি, রায় এ সম্বন্ধে বাঙালীকে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। বৃহৎ শিল্প ব্যবসা ব্যতীত ছোটখাট এমন অনেক শিল্প আছে, যা স্বল্প মূলধনে অনেকেই নিজ পরিশ্রমের দ্বারা সার্থক করে তুলতে পারেন। বর্তমানে শিক্ষিত বেকার ব্যক্তিদের এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

"স্বদেশ ও শিল্প" গ্রন্থখানি এদিক থেকে একটি পরম হিতকারী বন্ধু বিশেষ। এই গ্রন্থের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তি সমূহের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু বস্তুর নির্মাণ প্রণালী এমন সুন্দরভাবে হিসাব ও ফরমূলাসহ ধরে দেওয়া হয়েছে যা থেকে যে কোন ব্যক্তিই সেই বস্তু সহজে তৈরী করে ব্যবসা করে লাভবান হতে পারবেন। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গ্রন্থের উপযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষনীয়। এতে জর্দা, তরল আলতা, চকোলেট ও লজেন্স, সিরাপ, ভ্যানিশিং ক্রীম, লিকুয়িড সোপ, দিয়াশলাই, টর্চের ব্যাটারী, সাবান, নেল পালিশ, ভিনিগার, মোমবাতি, লেখার কালি থেকে আরম্ভ করে হেন জিনিষ নেই যা তৈরীর বিশদ পদ্ধতি দেওয়া নেই।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করে সত্যই একটি ভাল কাজ করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁর "গোড়ার কথা" রচনাটিও সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ।

সাপ্তাহিক বসুমতী:

আজকের এই বেকার সমস্যার দিনে বিরাটসংখ্যক বেকার যুবকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এগিয়ে এসে নিজেরা যাতে কিছু চেষ্টা করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শিল্পের মত প্রয়োজনভিত্তিক জিনিষ

যাতে অনায়াসে বুঝতে পারা যায় এবং কোন মতেও নিরস না লাগে, তারই সহজ ও সরল ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। লিকুইড ফিনাইল, বেরিয়াম এক্স রে মিল, ভ্যানিসিং ক্রীম, ডিসটিল্ড ওয়াটার, সার্জিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ, কাটিং অয়েল, রবার ব্লোয়িং এজেন্ট, বিটা নাফথল, লিমন সিরাপ, কপার সালফেট এবং আরও অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ কেমন করে লাভজনক উপায়ে প্রস্তুত করা যায়, তার সুলিখিত বিবরণ রয়েছে এই গ্রন্থে।

অনেকেই একটা কথা ভুলে যান যে, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধির মত কেবল নাটক, উপন্যাস, গল্প ও কবিতা লিখলেই চলে। ফলিত বিজ্ঞানের নানা শাখার সাহিত্যিক প্রয়াসও অতীব প্রয়োজনীয়। বাংলা ভাষায় এমন গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাই সুভাষ বাবুর প্রচেষ্টাকে আমরা অকুণ্ঠিত অভিবাদন জানাচ্ছি। বহু পরিশ্রম এবং লেখাপড়া করেই এমন একটি গ্রন্থ রচনা করা যায়।

বেতার জগৎ ঃ

খুবই অভিনব ধরনের একখানি বই। অত্যন্ত অল্প খরচে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে যে সকল শিল্প প্রচেষ্টাকে উপজীব্য করে অর্থ রোজগারের ব্যবস্থা করা যায় তৎসম্পর্কে এই বইটি খুবই কার্যকরী। বইটিতে এমন সমস্ত তথ্যের সমাবেশ করা হয়েছে যা অনেক দুষ্প্রাপ্য বই না ঘাটলে জানা যায় না। এককথায় লেখক এই বইখানির মাধ্যমে সামাজিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অনেক মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ করে আমাদের স্বদেশী শিল্পোৎপাদনের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য রীতিমত এক দলিল পেশ করেছেন।

অমৃত

জনস্ফীতি, কর্মসম্প্রসারণের অসুবিধা, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব চালু কলকারখানাগুলি একাধিক কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে বেকার সমস্যা এদেশে প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে। নানান পরিকল্পনা করেও সরকার হালে পানি পাচ্ছেন না।

এই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় আংশিক ভাবে আছে তা হ'ল চাকরীর জন্যে কাঙালের মত অপেক্ষায় না থেকে সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে শিল্প সামগ্রী তৈরী ব্যবসা—বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা, বিশেষ করে যখন জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্ক থেকে সহজ সর্তে ঋণদান করা হচ্ছে। তাছাড়া সরকারী সূত্রে কিছু আর্থিক সহায়তাও উদার ভাবে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আলোচ্য বইটিতে শ্রীচট্টোপাধ্যায় পঞ্চাশ রকমের নানান ধরণের শিল্প-সামগ্রী তৈরীর রীতি—প্রকরণ কাঁচামাল পাবার বিস্তৃত তথ্য সরকারী অর্থানুকূল্য কোথায় পাওয়া যাবে, কাকে কিভাবে লিখতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন।

এইসব কারণেই বাজার চলতি আরো পাঁচটা বইয়ের চেয়ে "স্বদেশ ও শিল্প" হয়ে উঠেছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

দেশ ঃ

পশ্চিমবঙ্গের বেকার—সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করা দরকার। আর এ ব্যাপারে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা ক্ষুদ্র শিল্প যে অনেক কম টাকায় বেশী লোকের কাজ দেওয়া যায়, সে কথা সকলেই বলছেন। সরকারও বাদ যাচ্ছেন না। কিন্তু কেমন করে ছোটখাট শিল্প গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে বেকার যুবকেরা কোনও খোঁজ পাচ্ছেন না। মন্ত্রীদের ধরলে তাঁরা সেক্রেটারীদের দেখিয়ে দেন, সেক্রেটারিরা আবার অন্য দফতরে পাঠান। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের "স্বদেশ ও শিল্প" গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কত রকমের শিল্প স্থাপন করা যায়, কোথায় তাদের বাজার, কত টাকা লগ্নী করতে হবে, সবই মোটামুটি বলা হয়েছে। লিকুইড ফিনাইল, নাইট্রোবেনজিন, বিভিন্ন জাতের সাবান, কাঁচ, স্থ—পলিপ, রং দিয়াশলাই, বিভিন্ন ধরনের পাউডার ও ভ্যানিশিং ক্রীম, চকোলেট, সার্জিক্যাল গজও ব্যাণ্ডেজ, ব্লীচিং পাউডার, বিস্কুট প্রভৃতি ৪৭টি পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, এমন কয়েকটি রাসায়ণিক দ্রব্য ও এদেশে কীভাবে উৎপাদন করা যায়, বর্তমান গ্রন্থে তাও জানা যাবে। পূর্ব ভারতে নারিকেল ছোবড়ার শিল্প, ত্রিপুরায় বাঁশ থেকে কুটির শিল্প, মেঘালয়ে বন—সম্পদের ভিত্তিতে কী ধরণের

শিল্প গড়ে উঠেছে তার আলোচনা ও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বৃহৎশিল্পের জন্য কনসালট্যান্ট ব্যবস্থা চালু আছে, ক্ষুদ্রশিল্পের সম্প্রসারণের ব্যাপারে কন্‌সালট্যান্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে সুযোগ আছে, বইটি পড়ে সে কথাই মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এবং রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দফতর যদি বইটিতে প্রস্তাবিত শিল্প স্থাপনে অর্থ সাহায্য করিতে উদ্যোগী হন, তা হলেও এ রাজ্যের ছোট বড় শহরে ও গঞ্জে হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে।

আনন্দ বাজার পত্রিকা ঃ

বেকার সমস্যা সমাধানে নানা মুনির নানা মত। এই গ্রন্থেও তারই কিছুটা ইঙ্গিত আছে। তাছাড়া, অত্যন্ত সহজ ভাষায় শিল্পের মত নীরস বিষয় অনায়াসে বোঝান হয়েছে। বাঙালী যুব সমাজে এই বইয়ের প্রচার হওয়া দরকার। স্বাবলম্বী হওয়ার মত বহু তথ্য, বহু নির্দেশ গ্রন্থাকার দিয়েছেন।

যুগান্তর পত্রিকা ঃ

প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় অথচ সহজসাধ্য শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের অনেকগুলো প্রক্রিয়া যা সহজেই করা যায়, অথচ তাতে বেশ দু' পয়সা অনায়াসে আয় হতে পারে, আলোচ্য পুস্তকে তারই বিষয়ে বলা হয়েছে। বইখানি পড়লে মনে হয়, যিনি বইখানি লিখেছেন, তাঁর হাতে কলমে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশে আজ বেকার সমস্যা প্রবল। রাতারাতি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে তা দূর হবার নয়। আর যে কোন মূলধন নিয়ে ব্যবসায় নামলেই যে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় তাও নয়।

এ বইখানি অল্প মূলধনে দিয়াশলাই, চকোলেট, লজেন্স, লিমন সিরাপ, আলতা, কুমকুম, ফিনাইল, কাটিং অয়েল, ডিসটিল্ড ওয়াটার, রংশিল্প, সু-পালিশ, ব্লিচিং পাউডার, মোমবাতি টর্চের ব্যাটারী, শ্যাম্পু ও ভিনিগার প্রভৃতি হরেক রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, এছাড়া নারকেল ছোবড়ার শিল্প, কাঁচ ও তার শিল্প প্রভৃতি নানা প্রকার কুটীর শিল্পের তথ্য রয়েছে। বইখানি সত্যি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্বাস বইখানি উপকারে লাগবে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

Amrita Bazar Patrika

Guide for small-scale industries.

Subhas Chandra Chatterjee, has brought out "Swadesh o Shilpa" a book written in simple, easy to read Bengali for aspiring entrepreneurs especially educated un employed His purpose is to make clear to such people the basic requirements of starting a small scale or cottage industry, with an emphasis on bank credit. The industries he has dealt with in the elegantly-done book are all chemical. But the schemes he has appended for explaining how the banks are to be approached for finance would be helpful in respect of other industries as well The variety of manufacturing items discussed in the book is astonishing. They included among others, liquid Phenyle, face cream, surgical gauge and bandage, matchsticks, kum kum, sealing wax, nail polish, washing soap, folding baby mosquito net, torch battery, tooth paste, candlesticks, ink, bleaching powder, etc. The book also informs how the S. I. S. I. is to be approached for finance.

গণবাংলা (বাংলাদেশ)

"স্বদেশ ও শিল্প" একটি গ্রন্থ। লিখেছেন পশ্চিম বাংলার সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থটির নাম শুনে খুব উঁচুদরের প্রবন্ধ সংকলন বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বই-এর পাতায় চোখ বুলাতে গিয়ে নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম। বইটি শিল্প সংক্রান্ত নয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত। লিপষ্টিক, স্নো, জুতার কালি, সাবান এবং এ ধরণের আরও গোটা পঞ্চাশেক ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের আকৃতি, গঠন প্রকৃতি, সম্ভাব্য খরচসহ ফর্মুলা পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখিত গ্রন্থটি পেয়েছিলাম আমার জনৈক বেকার বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি ফলিত রসায়নে এম, এস. সি। চাকরী পাচ্ছেন না অনেকদিন থেকে। তাই শেষ পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় পায়ে দাঁড়ানোর পথ খুঁজছেন। বেকারত্বের নিবিড় অন্ধকার বন্ধুর কল্পনার রঙে রচিত ভবিষ্যতের উজ্জল ছবিটাকে গ্রাস করেছে। কিন্তু "স্বদেশ ও শিল্প" জাতীয় গ্রন্থের মাঝে বন্ধুটি ক্ষীণ আশার আলো দেখছেন। আমি উৎসাহ—উদ্দীপনা দিয়ে যাচ্ছি।

বেকারত্ব গোটা দেশটাকে গ্রাস করেছে। প্রতিটি মধ্যবিত্ত ঘরেই দু' একজন শিক্ষিত বেকার রয়েছে। "নিজেকে পরগাছা মনে হয়, অফিস পাড়ায় ধর্ণা দিয়ে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় দিনের পর দিন কাটিয়ে শুধুমাত্র নিজের বিবেকের কাছে দংশিত হচ্ছি।" বেকার বন্ধুটির স্বগতোক্তি। কিন্তু তবুও বন্ধুটি আত্মবিশ্বাস হারায় নি।

স্বাধীনতার জন্য দেশের ছেলেরা হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে। সামনে ছিল উজ্জলতায় ভরপুর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটি নিটোল পরিচ্ছন্ন জীবনের ছবি। স্বাধীনতার পর তিক্তময় অভিজ্ঞতার ময়লায় স্বপ্নময় ছবিটা ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। যুবকদের অনেককেই হতাশা গ্রাস করেছে। কেউ কেউ বিক্ষুব্ধ হয়ে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে। যুব সমাজকে এ অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করছেন না।

দেশে শুধুমাত্র শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ। বেকারদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের নামও তালিকাভুক্ত হয়েছে। কর্মবিনিয়োগ

সংস্থা ছাড়াও তালিকার বাইরে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক বেকার।

বেকার সমস্যার প্রতি সরকার কতটুকু মনযোগী সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে সরকারের প্রতি বেকার যুবকদের মনভাব খুব সুবিধের নয়। তবে শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বেকার যুবকরা যদি নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন, আমার মনে হয় তা সৎ-প্রচেষ্টার পরিচায়ক হবে। "স্বদেশ ও শিল্প" জাতীয় গ্রন্থাদির সংখ্যা দেশে অপ্রচুর হলেও খুব অল্প নয়। কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টায় ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা খুব একটা অসাধ্য ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র দরকার কিছুটা আত্ম-বিশ্বাস ও উদ্যোগের। সরকারী পর্যায়ে এ ধরণের উদ্যোগের উৎসাহ ও সহযোগিতার কথাও চিন্তা করা দরকার।